ব্যথিতা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির

এই পুস্তকের মাশুল সাধারণ-ভাবে প্রদত্ত হয়েছে।

ব্যথিতা।

(উপন্যাস)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সাহা-প্রণীত।

কলিকাতা।

৮৯ নং টালীগঞ্জ রোড হইতে

শ্রীমতী প্রীতি-অঞ্জলি সাহা

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩০ নং হরীতকী বাগান লেন,

"পশুপতি প্রেসে"

শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲

উপহার

শ্রী..

.................................'ব্যথিতা সাদরে'

অর্পণ করিলাম

শ্রী.....................................

"উৎসর্গ"

প্রেমময় ভগবন্!

তুমিই আমার শুষ্ক মরুহৃদয়ে তোমার প্রেম ও মঙ্গল হস্তের স্পর্শে সরস ও কোমল ক'রে ফুল ফুটিয়েছ। এক একবার মনে হয়, রসসৃষ্টি কি ফুল? ফুল বই কি; দয়া মায়া, সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, স্নেহ, ক্ষমা এগুলিকে আমি ত ফুলই বলি। হে প্রিয়! যে হৃদয়ে এই নানান্ রকমের ফুল ফুটাও, সে হৃদয় কত অমৃতময়! যে সে হৃদয় পায়, সে অমর হয়ে যায়। তুমি আমায় তার একটী দিয়েছ, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ; সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আমার হৃদয়-তরুর "ব্যথিতা" ফুলটী তোমার শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। অন্যে হয় ত বল্বে যে, এতো ভাল করে ফোটেনি, এতে না আছে গন্ধ না আছে সৌন্দর্য্য। কিন্তু আমি বলি, ভগবৎ-রাজ্যে ওরকম অসুন্দরও সুন্দর হয়, দোষও গুণে পরিণত হয়, ওটা হচ্চে তাঁর প্রেম-রাজ্যের অন্ধ দিক। তা হ'লেই বা, আমি জানি, মাটির বুকের ছোট্ট একটী তৃণের খুব একটী ছোট্ট ফুলকেও সূর্য্যের আলো এবং বাতাস যেমন ভাল না বেসে থাকৃতে পারে না, সেরূপ তুমিও ক্ষুদ্রকে এবং অপূর্ণকেও চাও।

তোমার শান্তিপ্রদ শ্রীচরণ-কমলাশ্রিত—

নিবেদন।

সপত্নী ও স্বামীর সুখে পাছে ব্যাঘাত জন্মে, সেই আশঙ্কায় পতিব্রতা নারী "ইন্দুলেখা" যদিও ব্যথা ও অভিমান বুকে নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেছ্‌ল, তথাপি সে বুঝেছিল যে ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ! কিন্তু তার ত্যাগ কত মহান্‌! কত গরীয়ান্‌! আপনি কি যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় করে সেই ব্যথিতা নারীর জীবন-কাহিনী পড়ে তার ব্যথাতুর স্বর্গীয় আত্মার জন্য এক ফোঁটা সমবেদনার অশ্রু ফেল্‌তে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন। আপনি যে প্রাণবান্‌? নিখিল মানব-জাতির মনের সঙ্গে আপনারও যে মনের অখণ্ড যোগ আছে, তাই আপনি ব্যথার ব্যথী, দুঃখের দুঃখী, আনন্দের আনন্দভাগী। শুধু তাই নয়, এই পুস্তক-সংস্করণের লভ্যাংশ অনাথ-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হওয়ায় ইহা ক্রয় করে একদিকে যেমন আপনি একটি বেদনাভরা ক্ষুব্ধ নির্ম্মল আত্মার জন্য সমবেদনা প্রকাশ করবেন, তেমনি অন্যদিকে আবার অনাথের উপকারে পুণ্য অর্জ্জন করতে পারবেন। ইতি

৮৩ নং টালীগঞ্জ রোড
কলিকাতা।
দোল-পূর্ণিমা ১৩২৯

বিনীত—
শ্রীশ্রীরেন্দ্রনাথ সাহা।

ব্যথিতা।

—:•#•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ দোল পূর্ণিমা। বসন্তের শান্ত সমীরণ শীত-প্রপীড়িতা প্রকৃতির অঙ্গ হইতে জীর্ণ মলিন ছিন্ন বসন খুলিয়া যেন কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে! তাই আজ নীল যবনিকা ভেদ করিয়া বিলয়ের শেষে বিকাশের আনন্দ-রশ্মি চারিদিকে ঠিক্‌রিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তরল জ্যোৎস্না বসন্তের নবাঙ্কুরিত পত্রপুষ্পের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ, কোথায়ও সাড়া শব্দ নাই! এমন সময় সুপ্ত প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরীদের অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে একটী রমণী আবেগময় অস্পষ্ট ক্ষীণ করুণস্বরে গাহিতেছিল—

"যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,
তারা ত চাহেনা আমারে।
তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু-মাঝারে॥"

সহসা হতাশার উদ্বেগভরা গীতধ্বনি অজ্ঞাত নীরব-গুহায় মিশাইল, সেই সঙ্গে গায়িকার গোটাকতক গলিত মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু তাহার গভীর আবেগক্লিষ্ট কোমল গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল। সে আঁচলে চোখ মুছিয়া,দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাপা গলায় বলিয়া উঠিল,—না. কাঁদ্‌তে পারবে না, সবি দীননাথের ইচ্ছা।" এ রমণী কে? রমণীর বয়স প্রায় বিংশতি. বৎসর হইবে। যেন কোন বেদনার মধ্য দিয়া সেই রমণীর পরিপুষ্ট যৌবনরাশি মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মত ফুটিয়া বাহির হইবার প্রয়াস পাইতেছিল, তাই তাহাকে বিংশতি বৎসরেরও ন্যূন ব্যতীত অধিক বলিয়া বোধ হইতেছিল না। রমণী কিছুক্ষণ পরে সোপান বাহিয়া নামিল এবং পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া মুখে চোকে দিয়া বাঁধা ঘাটের চাতালে একটা স্বচ্ছন্দতার আসন পাতিয়া বসিল। বুভুক্ষু হৃদয়—তাই "আ কি আরাম" বলিয়া একটী শান্তির নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু হায়, আরাম যে তার

পোড়া কপালে নাই! কেন, সে ত অজ্ঞানেও কাহার সহিত কোন অন্যায় বা অসদ্ব্যবহার করে নাই। তবে কেন তার এত যন্ত্রণা! সে ত নীরবে সব সহিয়া আসিতেছে—কেন তবে "মা—দিদিমা" তাহাকে দেখিতে পারেন না? সে ত কখনও তাঁহাদের আদেশ অবহেলা করে নাই! তবে কেন, কিসের জন্য এত অবহেলা, এত লাঞ্ছনা? তবে কি তাহার উপস্থিতিতে তাঁহাদের কোন সুখের হানি হইতেছে? তা না হইলে এত ষড়যন্ত্রই বা আবশ্যক কি। যাহাকে একটীমাত্র মুখের কথা বলিলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই ক্ষুদ্র মশক শাসনের জন্য কামান পাতা কেন? সে সব ছাড়িতে পারে, কিন্তু……

রমণী আর ভাবিতে পারিল না, জলে চক্ষু ভরিয়া আসিল। মুখখানা নিদাঘ অপরাহ্নের মেঘের মত মলিন হইয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি নিঃস্ব চক্ষু মুছিয়া পুষ্করিণীর স্ফটিক স্বচ্ছ জলরাশির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা গো! আর সহ্য হয় না, আমার জ্বালা একেবারে শান্ত কর্ মা!"

সরোবরের তিন পার্শ্বে নানাজাতীয় বৃক্ষ ও উচ্চ প্রাচীর। উভয়ই বীর প্রহরীর মত সরোবরের শান্তি রক্ষা করিতেছে এবং অন্য পার্শ্বে যেখানে ঘন বৃক্ষলতাপত্রের

রন্ধ্রপথে কদাচিৎ জ্যোৎস্না পতিত হইয়া রৌপ্য খণ্ডের মত দেখাইতেছিল—সেইদিকে খিড়কী দরজা। অপর দিকে সরোবর-সোপান-সংলগ্ন উচ্চ অট্টালিকা। সহসা যামঘোষ শৃগাল দ্বিপ্রহরের ঘোষণাজ্ঞাপন জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল। রমণী চমকিত হইল। আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তখনও চপল চাঁদ ভাঙা ভাঙা 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের হাত ধরিয়া তর তর বেগে' চলিয়াছে। কুসুমের ও আম্রমুকুলের প্রেম-মদিরায় বিভোর বসন্তের মৃদু সমীরণ, কত রঙ্গ-রসে তাহাদের গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িতে ছিল। আবার রমণী কি যেন ভাবনার বিপর্য্যয়ে অধীর ব্যথাভরা স্বরে বলিল, "আমি ত এখুনি এ সংসার-মোহ দূরে দিয়া সকল জ্বালার হাত এড়াতে পারি, কিন্তু কে তাঁকে যত্ন ক'র্‌বে? না না কিছুতেই না, আমি অহর্নিশি সংসার-দাহনে জ্বলে পুড়ে মর্‌বো, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁকে ছাড়্‌তে পার্‌বো না। তিনি যে আমার জীবনের জীবন, আমার......"বলিতে বলিতে কোন এক অজ্ঞাত বেদনা তাহার কণ্ঠদ্বারে পাষাণ চাপাইয়া দিল। হায়! সে অসীম বেদনা আর ফুটিয়া বাহির হইল না! গিরিকন্দর-নিঃসৃত নির্ঝরের মত সেই বেদনা

জলধারারূপে চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে লাগিল। বুঝি পৃথিবীতে তাই এত দুঃখ! কেন না প্রকাশের ভাষা নাই। এমন সময় সহানুভূতি ও বিস্ময়পূর্ণ স্বরে "কেন কি হয়েছে ইন্দুলেখা" বলিয়া কে যেন পশ্চাৎ হইতে রমণীর দুই বাহু স্পর্শ করিল। ইন্দু চকিতে আগন্তুকের দিকে চাহিয়াই লজ্জায় মুখ নত করিল। ব্যস্তভাবে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি—তুমি কতক্ষণ? কোথা ছিলে?" আগন্তুক যুবক; ইন্দুর সর্ব্বস্ব—স্বামী। যুবক কহিল;—"কি ক'র্‌বো ইন্দু, সরোজ কিছুতেই আস্‌তে দিচ্ছিল না, এই দেখ না, তারা আমার জামা কাপড় রঙীন ক'রে দিয়েছে। তা যাক্, তুমি এত রাত্তিরে এখানে এমনি ভাবে?" ইন্দু স্বামীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইল না। উৎকণ্ঠার সিন্ধুতে ভাসিতে লাগিল। সরলভাবে প্রাণের সব কথা বলিলে পাছে স্বামী বেদনা পান, তাঁর শেফালিকার মত সুন্দর স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়ে কোন মলিন লেখার ছাপ পড়ে, সেই চিন্তা, সেই ভয় আর সেই উৎকণ্ঠা। ইন্দুর মুখখানি তাহারই আঘাতে শুষ্ক হইয়া গেল। একটা অব্যক্ত বেদনার কাল মেঘ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল। অনেক কষ্টে অনেক

চেষ্টায়বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। অধরোষ্ঠ নড়িল,কিন্তু কথা বাহির হইল না। কে যেন তাহার হৃদয়ের কথাগুলি হৃদয়ের ভিতর টানিয়া ধরিয়া রাখিল। ইন্দুর ছল ছল চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পত্নীদুঃখে ম্রিয়মাণ শরৎ চঞ্চল ইন্দুর সান্ত্বনার জন্য ইন্দুকে আদরে বুকে লইল। তখন ইন্দু ঝড়ে দোলান লতার মত কাঁপিতে-ছিল। স্বামীর এই স্নেহস্পর্শে ইন্দুর জমাট অশ্রু গলিয়া ঝরিয়া তাহার চরণে পড়িতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শরৎ তাহার এলোমেলো কেশগুলি মুখ হইতে সরাইয়া দিয়া সোহাগ-মাখা স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দু—প্রাণের ইন্দু! বলো, লুকিয়ো না, কি হ'য়েছে?" ইন্দুর মর্ম্মব্যথা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, সে বালিকার মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শরতের চক্ষুও সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া আসিল। বহুক্ষণ পরে ইন্দুর হৃদয়াবেগ প্রশমিত হইলে শরৎ বলিল, "ইন্দু! কেন? কি হয়েছে ইন্দু! ব'লবে না?" "না কি হয় ন?" বলিয়াই—ইন্দুর প্রচ্ছন্ন ব্যথা আবার ঠিক শূলবেদনার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইল। শরৎ যে তাহা বুঝিল না, এমন নহে। পূজারিণী যে দেবতার পূজা করে, সে দেবতা পূজারিণীর হৃদয় জানে বৈ কি? ইহা কে

না বলিবে? শরৎ সাংসারিক কোন ব্যাপারেই থাকিত না। সে তাহার প্রেমের হাটে ইন্দুকে মূল্যবান পণ্যের মত নাড়াচাড়া করিয়াই আনন্দে কাল কাটাইত। অপর বোঝা ভারি ভাবিয়া মাথায় পাতিত না। কিন্তু আজ সে যে অবস্থার ক্ষেত্রে আসিয়া পা বাড়াইয়াছে, সে অবস্থায় সেই ব্যাপারের বোঝা মাথায় না লইলে আর চলে না; কেন না ইন্দু তাহার বিবাহিত ধর্ম্মপত্নী, তাহার প্রেমরাজ্যের সুখৈশ্বর্য্যময়ী রাজরাজেশ্বরী—প্রণয়িনী। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত অংশটুকুই ইন্দুকে ডালি দিয়াছে, তাহার আর কিছুই নাই। ইন্দু ম্লান হইলে শরতের যে চারিদিক্ অন্ধকার।. শরৎ অতি দীনভাবে ইন্দুর নিকট ভিক্ষার বিষয় জানাইল। ভিক্ষা এইটুকু যে, "কি হয়েছে বল?" ইন্দু স্বামীসোহাগিনী, স্বামীর সোহাগ-আগ্রহে আর মৌন থাকিতে পারিল না। "কি দোষ ক'রেছি আমি যে, মা দিদিমা আমায় দুচোকে দেখ্‌তে পারেন না, না—না আমি ভুল ব'লেছি, ভুলে গেছি, ক্ষমা করো আমায়" বলিয়া সে শরতের বাম বাহু দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিল। শরৎ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "কৈ এত দিন ত কিছু বলো নাই ইন্দু! আমি সমস্ত বুঝ্‌তে

পেয়েছি, এমন কি আরও দু'দিন তোমাকে এমনি অবস্থায় এমনি নিরালায় থাক্‌তে দেখেছি, আমায় দেখে তুমি হৃদয়ভাব গোপন ক'রেছ। এক কালসাপিনীর জন্যই ত এত। আজ, যদি মা থাক্‌তেন''—বলিতে বলিতে শরতের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

পাছে স্বামীর হৃদয়ে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় ইন্দু কখনও নিজের দুঃখের কথা তাহাকে বলে নাই। ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হৃদয়ের নিভৃত দেশে অন্তরের বেদনা চাপা দিয়া নির্জ্জনে কতদিন কত অশ্রু ঢালিয়াছে, তবু সে আগুন নিভে নাই। চাতকের মর্ম্মস্পর্শী প্রণয়াহ্বানে জলগর্ভা কাদম্বিনী যেমন স্থির থাকিতে না পারিয়া জল বর্ষণ করে, সেইরূপ আজ শরতের সময়োপযোগী সস্নেহ আদর সম্ভাষণে ইন্দুর হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। সহসা কে যেন অতি সাবধানে তাহাদের অলক্ষ্যে বাঁধা ঘাটের আড়াল হইতে উঠিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। তখন পশ্চিম গগনে চন্দ্রদেব অস্ত যাইতেছিলেন। প্রভাতের স্নিগ্ধোজ্জ্বল তারাটী ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল। সুখস্পর্শ প্রভাত-সমীরণ ফুল্ল কুসুমের সৌরভ মাখিয়া মৃদু হিল্লোলে বহিতেছিল, পূর্ব্ব-গগনে ঊষা সুন্দরীর রক্তিম জ্যোতিঃ ক্রমশঃ দিগন্তের

কোলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কাক কোকিল দয়েল বিশ্ব-প্রকৃতির জাগরণ ঘোষণা করিতেছিল। দুইটী বেদনাক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ আত্মা কখন যে সেই ঘাটে সুপ্তির শান্তিময় কোলে ক্লান্তি-ভারে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহা কেহ জানে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুপুর গ্রামের অন্যতম ক্ষুদ্র জমিদার শ্রীযুক্ত মুরলীধর চৌধুরী যে ক্রোধে সহসা অধৈর্য্য হইতেন এবং ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিতেন, এই প্রসঙ্গটি গ্রামের নিরবলম্ব ভবঘুরে লোকগুলির সময় কাটাইবার একটা জল্পনার বিষয় ছিল।

মুরলীধর বাবুর বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন বৎসর হইবে। হইলেও তিনি কখন বয়সের কথা প্রকাশ করিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি গম্ভীর-ভাবে উত্তর করিতেন যে, বয়সের কথা বলা তাঁহার গুরুর নিষেধ। তিল-তণ্ডুল মিশ্রিত নৈবেদ্যের মত তাঁর শ্বেতকৃষ্ণ কেশময় মস্তকমধ্যে দোদুল্যমান লম্বা সরু "টিকিটি" সচ্চরিত্রতার সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ আবার টেরীর মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। কাশফুলের মত শুভ্র মোচ্‌ড়ানো গোঁপ এবং তোব্‌ড়ানো গাল দুইটী যেন বার্দ্ধক্যের পরোয়ানা জারি করিতেছে। চক্ষু দুইটীও যেন সেই পরোয়ানা জারীর ভয়ে—ধীরে ধীরে কোটরে ঢুকিতেছে। গলায় কাঠের মালা।

সে বার যখন ফরিদপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাবে মুরলীধর বাবুর স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায়, জ্যেষ্ঠ শরৎকুমার তখন কলিকাতার মেসে থাকিয়া আই-এ পড়ে। সে আজ তিন বৎসরের কথা। অশৌচ-অন্তেই মুরলীধর বংশবৃদ্ধি ও সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কোন পরিচিতা সমাজচ্যুতা দরিদ্রা প্রতিবাসিনীর পূর্ণ-যুবতী কন্যা বিবাহ করেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই কন্যার মাতা গৃহকর্ত্রীরূপে সংসারে প্রবেশ করেন। নিজের বিবাহের দেড় বৎসর পরে পুত্র শরৎকুমারের বিবাহ দেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত প্রভাতে যে লোকটী শরৎ ও ইন্দুর পাশ কাটাইয়া সরোবরের ঘাট হইতে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে জল লইতে পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছিল। তিনিই শ্রীমান্ মুরলীধরের শ্রীমতী শ্বশ্রূঠাকুরাণী গৃহকর্ত্রী। শরতের বিমাতার গর্ভধারিণী দিদিমা। পথিমধ্যে বাধা পাইয়া দিদিমা একেবারে অন্দরে মুরলীধরের শয়ন-গৃহের দরজার সম্মুখে আসিয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া কবাটে মৃদু আঘাত করিতে করিতে চাপা গলায় ডাকিতে লাগিল, “মোনা— ও মোনা, শিগ্‌গির উঠ্‌ না। দেখ্‌বি ত' আয়”।

সশব্দে কবাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। অমনি একটি স্খলিত বসনা আলুলায়িত কুন্তলা ঘোর শ্যামাঙ্গী পূর্ণ যুবতী ঘর হইতে চোক রগড়াইতে রগড়াইতে বাহির হইল। তখনও যুবতীর ঘুমের অলসতা কাটে নাই। যুবতী আধ ফোটা ঘুমন্ত চোখে সম্মুখেই স্নেহশীলা কল্যাণী জননীর স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিল এবং অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে কহিল, "কি হ'য়েছে মা!" মাতা (দিদিমা) অপর কিছু না বলিয়াই যুবতীর হাতখানি ধরিয়া বিস্মিতভাবে মৃদুস্বরে "কি হ'য়েছ,আয় না দেখ্‌বি" বলিয়া কন্যাকে টানিয়া অন্দরের বাহিরে সেই ঘাটের একটু অন্তরালে লইয়া গেল, আর শরৎ ও ইন্দুর চাতাল-শয়ন স্পষ্টভাবে দেখাইল। গালে হাত দিয়া অঙ্গাভিনয়ে ব্যঙ্গদৃষ্টিতে "একাল আর সেকালের বিষয়" তীক্ষ্ণ তীব্র তুলনায় সমালোচনা করিতে লাগিল। যুবতী স্বপত্নী-পুত্র ও পুত্রবধূর এতাদৃশ আচরণে জ্বলিয়া উঠিল এবং সক্রোধে "আচ্ছা" বলিয়া হন্ হন্ করিয়া একেবারে উপরে স্বামীর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়াই উচ্চস্বরে কহিল—"ওগো শুন্‌ছো? কেবলি দিন-রাত্তির প'ড়ে ঘুমুবে? একবার বাইরে গিয়ে তোমার গুণধর ছেলে-বৌএর কাণ্ডখানা দেখ না।" মুরলীধর তখন ভোরের ঘুমে স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তথায় হেমঝারি হইতে

প্রবাহিত সুধা পান করিতে করিতে শেষ পক্ষের একান্ত পক্ষপাতিনী মদালসা পত্নীর অমরযৌবন-সিন্ধুতে ভাসিতে ছিলেন, কে জানিত যে, সে সিন্ধু হইতে এমন সুন্দর সময় কে তাহার হাত ধরিয়া টানিবে! তাই তিনি বাধা পাইয়াও পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আহা কি মধুর স্বপ্ন! আবার বজ্রধ্বনি হইল—"ওঠ না, ময়ার ঘুম ঘুমোচ্ছ যে?"

মুরলীধরের সোনার ঘুম—সুখ-স্বপ্ন আসবাব সব ভাঙিয়া চূরমার হইয়া গেল। ভাঙা ঘুমে রাঙা চোক মেলিলেন, দেখিলেন চোকের সম্মুখেই গবাক্ষপ্রবিষ্ট বালারুণের গলিত কনক-কিরণরাশি মনোরমার ক্রুদ্ধ কৃষ্ণগণ্ডখানিকে আরও আরক্তিম করিয়াছে। কৈ মুরলীধর ত আপন মনের মত মনোরমার সে মূর্ত্তি আর কখন দেখেন নাই! আজ তাঁর চোকে এ মূর্ত্তি নূতন! তাই তিনি বিলক্ষণ হতভম্ব হইলেন। প্রথম দর্শনে তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পুরোহিতগণ-কথিত মার্কণ্ডেয় ঋষিবর্ণিত দানবদল-দলনী চামুণ্ডা যেন তাঁহার কোন সেবাপরাধের শাসনের জন্য সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। সত্য, মুরলীধর "নমস্তস্যৈ" বলিয়া স্তব-পাঠোদ্যত হইলে ভ্রুকুটি কুটিল-

নয়না মনোরমা বিকটস্বরে "ভীমরথি হ'য়েছ" বলিয়া তাঁহার ভ্রম নিরাশ করিয়াছিল। মুরলীধরের ভয় ভাঙিল, জিহ্বা সরিল, সোহাগিনীর অবস্থান্তরে আরও সোহাগস্বরে কহিলেন, "কি ব্যাপার, মনু!" "তোমার মা—থা আর মুণ্ডু। এ যে ক্রমে বেশ্যার বাড়ী হ'য়ে উঠ্‌লো। চোক কাণ কি নেই? ছি! ছি! যার যা ইচ্ছা, সে তাই ক'র্‌বে?" মুরলীধর বিস্মিত চোখে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল; "কি ব্যাপার? খুলে বল ত'? আমি ত' কিছু..."মনোরমা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "পুখুরের ঘাটে গিয়ে দেখে এসগে, কি ব্যাপার!" বলিয়া জানালার নিকট গিয়া সার্সিগুলি নাড়িতে নাড়িতে আবার বলিতে লাগিল, "ওমা! এমন বেহায়া ছেলে-বৌ আমি ত চৌদ্দ-পুরুষেও দেখিনি! ছিঃ, রাম! রাম! ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা হয়।" মুরলীধর ক্রোধ-গম্ভীর মুখে বলিল, "আচ্ছা! দাঁড়াও, আমি দেখাচ্ছি! বড় বাড় বেড়ে উঠেছে।" মুরলীধর খাট হইতে নামিয়া চটিজুতাজোড়া পায়ে দিয়া-চটাস্ পটাস্ শব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুরলী একটু দূরে যাইলেই মনোরমার মাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "জুতোর শব্দে জেগে প'ড়্‌বে

যে—শীগ্‌গির দৌড়ে গিয়ে ব'লে আয়।" মনোরমা ও তাহার মাতা বিদ্যুদ্বৎ দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইল। তাহার পরের ঘটনা আর কি ঘটিল, জানা গেল না! কেবল দূর হইতে একটা বিকট শব্দ শোনা গেল, "নির্লজ্জ ছাগল, শোয়ার পিরীতি ক'রতে আর জায়গা পেলে না, পুখুর ঘাটে?" বহুক্ষণ পরে দেখা গেল, শরত নতমুখে ছল ছল চোখে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে। তখন বেলা এক প্রহর! দিবাকর প্রাতঃস্নান-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যে মনোযোগ দিয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল—স্বপত্নী-পুত্র ও পুত্রবধূকে প্রকাশ্য স্থানে আলিঙ্গিত-শয়নে মুরলীধরকে দেখাইবে। কিন্তু ইন্দু মুরলীধরের আগমনের পূর্ব্বেই গৃহে গিয়া যথানিয়মে গৃহস্থলীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ক্ষিপ্রহস্তা ইন্দু অতি অল্প সময়ে সমুদায় গৃহস্থলীর কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিল এবং বধূজনোচিত নিভৃতস্থানে বসিয়া নিজ নিশীথ-শিথিল কবরী আলুলায়িত করিয়া সুস্নিগ্ধ সুবাসিত তৈলে মার্জ্জিত করিতে লাগিল। অতীত ঘটনার স্মৃতি যুবতীর অন্তরকে একটী সুমিষ্ট সঙ্কোচে আন্দোলিত করিতেছিল। অধরে অর্দ্ধস্ফুরিত সলজ্জ হাসি—মৃদু মৃদু বিকশিত হইতেছিল। যেন ঠিক ভাঙা ভাঙা মেঘের আড়ালে অষ্টমীর খণ্ড চন্দ্রের খেলা! ইন্দু তৈল মার্জ্জনা সমাপনান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। আল্না হইতে গাত্রমার্জ্জনীটী স্কন্ধে ও কক্ষে কলসী লইয়া স্নানার্থে মৃদুমন্থর পদে রাজহংসীর গতিতে পূর্ব্ব-বর্ণিত পুষ্করিণীর ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ইন্দু রান্নাঘরে ঢুকিতেই

দেখিল, তাহারই প্রস্তুত করা রন্ধন-দ্রব্য লইয়া মনোরমা রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল এবং মনে ভাবিল, না জানি আজ তার ভাগ্যে কি আছে! মনোরমা ইন্দুকে দেখিয়াই বলিল, "মা—ও মা, শীগ্গির এসে ভাঁড় থেকে একটু তেল ঢেলে দিয়ে যাও ত'—এই কড়াতে, আমার দু'হাত শ'কড়ি।" ইন্দু তৎক্ষণাৎ ভাঁড় লইয়া তেল ঢালিতে আসিতেছিল দেখিয়া মনোরমা গম্ভীর মুখে বলিল, "তুমি আমায় ছুঁয়ো না।" ইন্দু বুঝিতে পারিল না যে, এই তৈল দেওয়ার সঙ্গে তাহাকে স্পর্শ করার সম্বন্ধ কি এবং তাহার অশুচিতাই বা কি? সে অপরাধীর মত নত মুখে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। "কি মা সোনা, কি চাস্?" বলিয়া মনোরমার মা গৃহে প্রবেশ করিল। "ঘরে ঢুক্‌তে তোমার লজ্জা করে না মা! শুধু শুয়ে থাক্‌লে দিন চলে না! সাপের পা দেখেছো বুঝি! তাই তৈরি কাজের উপর মুন্‌সিয়ানা ক'র্‌তে এসেছো," বলিয়া মনোরমা অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে কপট হাসি হাসিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল। মাতাও বিদ্রুপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "শোওয়ার কাছে কি আর খাওয়া দাওয়া! যাও মা, এখানে কেন? কাজ করার বেলায়

কারু নামগন্ধ নেই, কেবল পিণ্ডি গেলার বেলায় হাজির। আচ্ছা, তুই কেন রাঁধ্‌তে গেলি ব'ল্‌তো ? একেই তোর শরীর খারাপ, না হয় রান্না নাই-ই হ'তো।" মনোরমার মাতা মনোরমার হাত ধরিয়া হেঁসেল হইতে সরাইয়া দিল, পরে একটু মিহি সুরে কান্নার ছাপ দিয়া পুনরায় কহিল, "আহা ! শরীর ঘেমে কি হ'য়েছে ! আমরি, ওঠ্ ! ওঠ্ কেন গা, এত কিসের গা ! হ'য়েছে কি আমাদের ! খেতে ক' জন ? আমারা ত' তিনটি মানুষ ! আমি, তুই, আর বাবাজী বৈত নয় ! আমাদের এত খাট্‌বার দরকার ?" ইন্দু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে অতি ধীর নম্রভাবে উত্তর করিল, "কেন দিদিমা ! এ কয়দিন ত' আমিই রান্না ক'রেছি, আজও রাঁধ্‌বো ব'লে সব জোগাড় ক'রে নাইতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি— মা রাঁধ্‌তে ব'সে গেছেন, আমার ত কোন দোষ নেই দিদিমা !"

"কে তোমার দোষ দিচ্ছে বাছা ! তুমি যে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর—বাছা, তুমি সরে যাও" বলিতে বলিতে মনোরমা ক্রোধে গর্ গর্ করিতে করিতে ধপাস করিয়া কড়াসহ তরকারী নামাইয়া রাখিল।

ইন্দু কহিল, "মা আপনার শরীর ত' ততো ভাল নয়, আর যা কিছু বাকী আছে, আমিই ক'র্‌ছি।"

"না—না, তোমায় কিছু ক'র্‌তে হবে না, আমি সকলকেই চিনি, এতখানি বেলা হ'লো, রান্নার সঙ্গে কারু দেখা সাক্ষাৎ নেই," ইহা বলিয়াও মনোরমার ভন্‌ভনানি মিটিল না। ইন্দু আনত বদনে আঁচলের খুঁট পাকাইতে পাকাইতে ধীরভাবে বলিল, "হাঁ দিদিমা! আমি যখন রান্নার জোগাড় ক'র্‌ছিলাম, তখন আপনিও ত' দেখেছিলেন?"

"কি জানি বাপু! আমি তোমাদের কোন কথায় নেই," দিদিমা এই কথা বলিতেই ঘরের ভিতর হইতে উচ্চ গম্ভীর স্বরে মনোরমা বলিয়া উঠিল, "কি মা, তুমি এখনো যাওনি? একেই তোমার নাম বেশী। শীগ্‌গির যাও এখান থেকে।"

"যাই মা—তাই ত গো! আমার মালা জপা হয় নি," বলিয়া মনোরমার মাতা উঠিল। যাইতে যাইতে মিহি সুরে বলিয়া গেল, "মোনা—চুপ কর্।" ইন্দুও কিছুক্ষণ পরে নিজ শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। ইন্দু তাহার শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, শয্যায় শায়িত শরৎ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ইন্দু কিছুক্ষণ

দরজার নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে শরতের পার্শ্বে গিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিতে লাগিল, "কোথা গিয়েছিলে? কই আমায় ত' ডাকনি? আমি ত' জানিনি, কখন এসেছ? অনেক বেলা হ'য়ে গেছে যে, নাইবে চল।"

শরৎ তাহার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "তুমি এসেছো? বেশ, আমি তোমারই অপেক্ষায় এতক্ষণ র'য়েছি।"

ইন্দু মুখখানি মলিন করিয়া বলিল, "কি ভাবছো বল দেখি? কপালে যা আছে তাই হবে, তার জন্য এত ভাবনা কিসের? যাও নেয়ে এসো, বেলা হ'য়ে গেছে।"

এই বলিয়া ইন্দু ড্রেসিং টেবিল হইতে গন্ধ তৈলের শিশি ও আল্না হইতে তোয়ালে আনিয়া খাটের সম্মুখের টিপায়ার উপর রাখিল।

"দেখ"—শরৎ একটু দম্ লইয়া বলিল, "আমার গুটি-কতক কথা আছে তোমাকে বল্‌বার"। ইন্দুর মুখ ভয়ে—বিষাদে আরও নীল হইয়া উঠিল; সে মুখ নত করিয়া মেঝেয় বাম পায়ের বৃদ্ধ আঙুল নাড়িতে লাগিল। "এর চেয়ে আর কি আছে লজ্জার—যাক সে কথা! আমি আজই কল্‌কাতায় যাচ্ছি চাকরির অন্বেষণে, তুমি এখানে

কিছুদিন থাকো।” ইন্দু বেদনাভরা মুখে বলিল, “না আমি থাক্‌তে পার্‌বো না, আমায় নিয়ে চল।”

“এখন ত তোমায় নিয়ে যেতে পারি না, আমার হাতে একটা পয়সা নেই।”

“আমার মায়ের দেওয়া যে গহনা আছে, তাই দিচ্ছি, তাই বিক্রী করে খরচ চালিয়ো।”

“না ইন্দু সে কখন আমার জীবন্ থাক্‌তে হবে না।”

“তবে তোমার যাওয়া হবে না।”

“আমাকে এখনই প্রস্তুত হ’তে হবে, জান না, কি যন্ত্রণার মধ্যে আছ?”

“সবি জানি! কিন্তু কি কর্‌বে—উপায় নেই।' এই দুঃখকে বরণ ক’রে নেওয়াই পুরুষত্ব।”

“আমি আর কিছু শুন্‌তে চাই নে ইন্দু. আর সহ্য ক’র্‌তে পারবো না।”

“স্থির হও, অত উতলা হ’লে আমি কোথা যাবো—যে সয়—সেই রয়”।

শরৎ উত্তেজিত হইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, “এত ঠাট্টা! এত অপমান! না এখানে কিছুতেই থাকা হবে না ইন্দু! ছেড়ে দাও আমায়”, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু তাহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি-

স্বরে বলিল, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।" শরৎ কঠিন স্বরে বলিল. "না তোমায় এখানে কিছুদিন থাক্‌তেই হবে।" ইন্দুলেখা জানু পাতিয়া অশ্রুধারায় তাহার পদযুগল ধৌত করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, সবেমাত্র গোধূলির ধূসরবর্ণ আকাশের পশ্চিম গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছাদের উপর মনোরমার মাতা মনোরমার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিতেছিল, "এখন বাবাজীর আস্‌বার সময় হয়েছে, তুই এখানে একটু অভিমান ক'রে বসে থাকিস্; আর যখন তোর খোঁজ কর্‌তে কর্‌তে এখানে আস্‌বে, তখন বলিস্ যে, তোমার বৌমা সংসারের কোন কাজ করে না, একটা রাঁধবার লোকের দরকার।" এমন সময়ে ঝি কেষ্টোর মা দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "মা—কর্ত্তা-মা! দাদাবাবু একটা ব্যাগ্ হাতে ক'রে ঘর হ'তে বেরিয়ে গেল, আর অমনি বৌদি ঘরে দরজা বন্ধ কর্‌লে, আমি কত ডাক্‌লুম, কিছুতেই দরজা খুল্লে না।" মনোরমা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ দিকে গেল?"

"সদর দরজা দিয়েই বেরিয়ে গেল।"

"তুই কিছু জিজ্ঞেস কর্‌লি নে যে, কোথায় যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, করেছিলাম।"

"কি বল্লে ?"

"বল্লে আমার যেখানে ইচ্ছে সেইখানে।"

"শুধু এই ?"

"হাঁ।"

মনোরমার মা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "হাঁ, তোমারও যেমন কথা! বৌ ছেড়ে আবার কোথাও যাবে!" কেষ্টোর মা বলিল, "না গো কর্ত্তা-মা! সত্যি কোথা চলে গেল।" মনোরমা তাড়াতাড়ি বলিল, "তুই তাকে কেন ডাক্‌লি নে ?"

"হাঁ গো, আমি অনেকবার ডেকেছি। আহা! অমন ছেলে হবে না"। মনোরমার মা ব্যঙ্গ স্বরে বলিল, "আহা! বেশ ছেলে! অমন বেহায়া ছেলে আমি চোদ্দ পুরুষেও দেখিনি।" কেষ্টোর মা বলিল, "অমন কথা মুখে এনো না।" মনোরমা একটু যেন রুক্ষ স্বরে বলিয়া ফেলিল, "মা, ছেলের ত কোন দোষ নেই।"

'হাঁ! তুই ঠিক্ বলেছিস্ ঐ বৌটারই যত দোষ; আমার বল্‌তে ভুল হয়েছিল," বলিয়া কেষ্টোর মাকে বলিল, "সন্ধ্যা হ'য়ে এলো, তুই ঘরে আলো দেওয়ার জোগাড় কর্‌গে, আমি যাচ্ছি।" কেষ্টোর মা চলিয়া গেলে মনোরমা বলিল, "মা, সকালের কাজটী ভাল

হয়নি, বড় লজ্জা পেয়েছে সে, সেই ব্যথায় বোধ হয় কোথায় চলে গেছে।" মনোরমার মা বলিল, "তুই—এই মায়ায় সব হারালি; যার যেমন কাজ, তার তেমনি শাস্তি হওয়া চাই, না হ'লে প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় উঠ্‌বে যে! তুই চুপ ক'রে এখানে পায়চারি করতে থাক্, আমি নিচে যাই, আর যা বলে দিলাম, তাই বল্‌বি আর বলিস্—ওপাড়ার দত্তদের বৌএর মত একখানা মাথার ঝাঁপ্‌টা গড়িয়ে দিতে হবে—" বলিয়া মনোরমার মাতা চলিয়া গেল। এদিকে মুরলীধর দিব্য জামাই বাবুর মত পোষাকে কেড়াইয়া আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং নিজের শয়নকক্ষে মনোরমাকে দেখিতে না পাইয়া তুলসীমঞ্চের নিকট শাশুড়ীকে মালা হাতে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সে কোথায়?" মনোরমার মা জামাতাকে দেখিয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া বলিল, "আমি ত কিছু জানি না বাবা!" মুরলীধর হতাশ হইয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুরলীধরকে দেখিয়াও যেন না দেখার ভাণ করিয়া মনোরমা নিজমনে পায়-চারি করিতে লাগিল। মুরলীধর ব্যথিত হইয়া তাহার নিকট গিয়া প্রার্থনার স্বরে বলিল, "মনু, তুমি এখানে

আছ ? আর আমি যে তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হ'য়ে পড়েছি।" মনোরমা তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ বেড়াইতে লাগিল। মুরলীধর তাহার পথ আগ্‌লাইয়া দাড়াইল, মনোরমা নিরুত্তরে পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিল, মুরলীধরও আবার তাহার সম্মুখে আসিয়া পথ আগ্‌লাইলে মনোরমা পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল এবং মুরলীধর নিজের লম্বমান কোঁচান কোঁচায় পা জড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন মনোরমা খিল্—খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বেশ হয়েছে!" মুরলীধরও নিজের লজ্জা ঢাকিবার জন্য ব্যথা সাম্‌লাইয়া হাসি মুখে বলিল, "তবে নাকি তুমি কথা কইবে না ? আমি পড়েছিলুম ব'লে ত কথা কইলে, কার জিত ?"

মনোরমা আর কোন কথা বলিল না দেখিয়া মুরলীধর করুণ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, "মনু! কেন আমার সঙ্গে কথা কইচ না ? আমি ত কোন অপরাধ করিনি।" মনোরমা গম্ভীর মুখে উত্তর করিল, "সব অপরাধই আমাদের, দিন রাত্রি পরিশ্রম কর্‌বো, তোমার বো কিছু কর্‌বে না। এমন হ'লে লোক রাখ্‌তে হবে" মুরলীধর ক্রোধে লাল হইয়া বলিল, "কি এত বড় কথা! আমার স্ত্রী আর শাশুড়ী পরিশ্রম কর্‌বে, আর তারা—

যা হোক, তুমি ব্যস্ত হয়ো না মনোরমা, সত্বরই এর একটা ব্যবস্থা করছি," বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছিল, মনোরমা সহসা বলিল, "শোন, আর একটী কথা আছে।" মুরলীধর কৃতার্থ বোধে দন্ত বিকশিত করিয়া হাসি মুখে বলিল, "কি প্রিয়ে ?"

"আমার মাথার একটী ভাল ঝাঁপ্‌টা চাই।"

"কবে চাই ?"

"এই সপ্তাহে।"

"আচ্ছা।"

মনোরমার মুখ শিকারের আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; সে স্নেহগাঢ় স্বরে বলিল, "ঘরে চল, জামা কাপড় ছেড়ে চা খাবে"।

"হাঁ, আমার বন্ধুবর্গও বৈঠকখানায় বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছে।" উভয়ে ছাদ হইতে নামিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহে আসিয়া মুরলীধর জামা কাপড় ছাড়িয়া শয্যার উপর বসিল। মনোরমা চা তৈয়ারীর জন্য চলিয়া গেল। মুরলীধর হাতে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচ খুলিয়া বালিশের নিচে রাখিতেই দেখিল যে, একখানা চিঠি। আলোর নিকট গিয়া দেখিল এই কয়টা কথা লেখা আছে—

পিতার নিকট এমন ব্যবহার পাওয়া ছেলের পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক ও মর্ম্মন্তুদ। তা বেশ হয়েছে। আমারও কেহ নাই, আমিও কারো নই। ইতি

সেবক—

শরৎ

মুরলীধর চিঠিখানা লইয়া নিচে নামিয়া আসিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শরৎ কোথায় ?"

"ঝি বল্লে, কোথায় চলে গেছে।"

"দেখ্‌ছো ছেলের লেখার ভঙ্গী," বলিয়া মুরলীধর পত্রখানা পড়িয়া শুনাইল এবং তারপর বলিল, "বাবুর নির্লজ্জতার জন্য শাসন করেছি বলে, বাবুর তাতে রাগ হয়েছে। আচ্ছা দেখা যাবে।" মনোরমা বলিল, "ছি! ছি! এমন ছেলে-বৌ আমি কোথাও দেখি নাই, একটুও লজ্জা নাই।"

মুরলীধর চিঠিখানি টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেল। গিয়া দেখিল, ফেলারাম চক্রবর্ত্তী, গগন দাস, চিনিবাস পাইন প্রভৃতি বন্ধুগণ সভা গুলজার করিয়া বসিয়া আছে। মুরলীধরকে দেখিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া

উঠিল, "এসো ভায়া, এসো, অন্দরে ঢুক্‌লে আমার গন্ধটি পাই নে যে।" কেহ বলিল, "ভিতরে কি আফিস্ করেছো?" কেহ বলিল, "গিন্নি কি বিরহের সাধ মিটোচ্ছিলেন?"

কেহ হাসিয়া বলিল, "এখন কি বলে বিদায় দিলেন?

জনৈক ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "দেরী করো না প্রাণবঁধু! তিলেকে যুগ পেরলয় হেরি!" অমনি একটা হাসি-হট্টরার রোল উঠিল! আজ চাঁদের হাট! মজ্‌লিস ভোর-পুর! মুরলীধর এ সকল সয়াল জবাবে টিকিবে না ভাবিয়া গম্ভীরমুখে গদীর উপর নিজের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিল। ফেলারাম চক্রবর্ত্তী বলিল, "কৈ হে ভায়া! তোমার চা কোথায়? নিজে খেয়ে এসেচ নাকি?"

"চা তৈরী হ'চ্ছে ভায়া!" বলিয়া উচ্চস্বরে মুরলীধর চাকর উচ্ছবকে ডাকিল। "ডাকুছু বাবু কাঁই," বলিয়া উচ্ছব উপস্থিত হইল, অনেক দিনের উচ্ছব, বাবুর পুরাতন চাকর। সে মুরলীধরের পিতার আমল হইতে এই বাটিতে থাকিয়া তাহার কাঁচা চুল পাকা করিয়াছে। মুরলীধরের আদেশে সে একটা বড় থালায় চায়ের পেয়ালা আনিয়া বাবুকে নির্দ্দিষ্ট পেয়ালা দিয়া অন্যান্য সকলকে বিতরণ

করিতে লাগিল। চা পানান্তে গান বাজনা চলিতে লাগিল রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইল। নিকটের শৃগালের উচ্চ বিকট চীৎকারে সকলে ঘড়ির দিকে চাহিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যে যাহার গৃহে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দোতলায় শরতের ঘরের কোণের টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া ইন্দু একখানা বইয়ের পাতায় চোক উল্‌টাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে পার্শ্বের জানালা দিয়া উদাস নয়নে মুক্ত আকাশের মুক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিতেছিল। সহসা বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া ইন্দু চেয়ারটা জানালার নিকট একটু টানিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে অস্পষ্ট হতাশার স্বরে বলিয়া উঠিল, "তাইত আজ আট-দিন হলো, তবুও ত তাঁর চিঠি এলো না, তবে কি তিনি এ অধিনীকে ভুলে গেলেন? না না, তা কখনো হ'তে পারে না! তবে কি তাঁর কোন অসুখ হলো? নিশ্চয়ই কোন অসুখ হ'য়ে থাক্‌বে! তা না হলে তিনি..............."

আর বলিতে পারিল না, চোকের কোণে অশ্রু দেখা দিল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে রমণী পার্শ্বে চাহিতেই দেখিল যে, কেষ্টোর মা ঝাঁটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া। তখন অপরাহ্নের শেষ। চোকে চোকে মিলন হইবামাত্রই কেষ্টোর মা স্নেহমাখাকণ্ঠে বলিল, "কি ভাব্‌ছো বৌদি,

দিনরাত্তির একই ভাবনা ভাব্‌লে যে অসুখ হ'য়ে পড়বে।"
কাতরতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইন্দু উত্তর করিল, "কেষ্টোর মা, আমার মরণই এখন একমাত্র শান্তি, আর কার মুখ দেখে—"বলিতে বলিতে ইন্দুর চোক জলে ভরিয়া আসিল। কেষ্টোর মা আঁচল দিয়া চোক মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "তোমার কিসের দুঃখু দিদি! অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে? ছি! বেঁচে থাকো। দাদাবাবুর পত্র যখনি আসবে, তখনি আমি লুকিয়ে নিয়ে আস্‌বো, তুমি ভেবো না বোন্‌টী আমার, তাঁরা পুরুষ মানুষ, হয়ত কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, সেই জন্য পত্র লিখ্‌তে পারেননি।" ম্লানমুখী ইন্দু তাহার হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে বলিল, "কেষ্টোর মা, তুমিই আমায় মা বাপ! এই শত্রুপুরীর মধ্যে তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার সাথী!" কেষ্টোর মা ইন্দুর অবিন্যস্ত কেশগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আমি আসি দিদি, দেরী হলে বক্‌বে জানই ত। তোমার কাছে এলে মাগী দুটো আমায় কত বকে আর এ কাজের ও কাজের অছিলায় ডেকে নিয়ে যায়।" ইন্দু বলিল, "না দিদি, তুমি যাও, এখানে বসে কাজনি, যাকে গতর খাটিয়ে খেতে হবে বোন্—তার মনিবের অপ্রিয় হ'লে চ'ল্‌বে কেন?"

ইন্দুর শেষ কথাটা কেষ্টোর মার ভাল লাগিল না।

একটু তিক্ত স্বরে বলিল,—"পোড়া পেট ত, ভগবান একরকম চালিয়ে দেবেনই।" এই বলিয়া সে গজর গজর করিতে করিতে সমস্ত ঘরখানি ঝাঁট দিয়া চলিয়া গেল। ইন্দু চিন্তাপীড়িত চঞ্চল মনকে কাজের মধ্যে ভুলাইবার জন্য শয্যা হইতে উঠিয়া চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ ভনর ভনর করিয়া সূতা কাটিল; পরে আর ভাল লাগিল না, সেলায়ের কলে একটা অর্দ্ধ-প্রস্তুত সেমিজ সেলায়ে মনোনিবেশ করিল। বারান্দা দিয়া মনোরমার মাতা যাইতেছিল, কলের ঘড় ঘড় শব্দে সে জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া ছুটিল—মনোরমার সন্ধানে। কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রচালিতের ন্যায় মনোরমা ইন্দুর ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, "কি দর্জি মেয়ে বাবা! কাজ করবার সময় আলমারির বিবির মাথা ধরে, আর এ সব করবার সময় স্ফূর্ত্তি দেখনা!! এখানে ও সব বিবিয়ানা চল্‌বে না বাছা, নিজে একটা বাড়ী তৈয়েরী ক'রে যা ইচ্ছে, তাই করো এখন।" ইন্দু মনোরমার কথাগুলি স্পষ্ট শুনিয়া নীরবে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গৃহকাজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। নৈলে উপায় কি? রাত্রের রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া ইন্দু সকলের আহারান্তে নিজে অভুক্তাবস্থায়

গৃহে দরজা বন্ধ করিল এবং সমস্ত রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় দুশ্চিন্তায় বিছানায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। সারারাতের পর প্রভাতে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, তথাপি বোধ হইতে লাগিল—তাহার প্রতি নিশ্বাসের অন্তরালে যেন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার জাগরণ তাহাকে জাগ্রত রাখিয়াছে। সংসারের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেষ্টোর মা ইন্দুর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ইন্দু তখনও শায়িত। "বৌ দিদি" বলিয়া কেষ্টোর মা একবার দুইবার তিনবার আহ্বান করিল; ইন্দুর কোন উত্তর পাইল না। তখন সে গায়ে হাত দিয়াই বলিল, "এ কি! গা গরম যে! বৌদি, কখন জ্বর হলো? উঃ, কি গরম!"

ইন্দুর তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, সম্মুখে কেষ্টোর মাকে দেখিয়া কম্পিতস্বরে বলিল, "কেষ্টোর মা, একটা কম্বল আমার গায়ে চাপা দিয়ে—এক্ গ্লাস্ জল দিয়ে যাও, বড় তেষ্টা পেয়েছে।" কেষ্টোর মা ইন্দুর গায়ে কম্বল দিয়া জল আনিতে গেল। জল আনিতে দেখিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "এত সকালে জল কে খাবে লা?"

"বৌ দিদির জ্বর হ'য়েছে, তিনি খাবেন।"

"হ্যাঁ, জ্বর না আরও কিছু? ও সব মনের জ্বর।"

"না মা, সত্যই, একবার দেখে এসো না।"

বাহিরে আসিয়া মনোরমার মাতা উত্তর করিল, "কেন? আমাদের কি সে ডেকেছে যে আমরা যাব? আমি সব বুঝি, ও সব জ্বরের ভাণ। কাজ ক'র্‌তে হবে কিনা, তাই।"

কেষ্টোর মা কোন কথা বলিল না, জল লইয়া চলিয়া গেল। ইন্দু জল পান করিয়া বলিল, "কেষ্টোর মা, দিদি, মাকে একবার আস্‌তে বল। কেষ্টোর মা "আচ্ছা, দিদি" বলিয়া চলিয়া গেল। মনোরমা ও তাহার মাতা কেষ্টোর মায়ের মুখে ইন্দু ডাকিতেছে শুনিয়া তাচ্ছল্য ভাবে মুখখানা ভারি করিয়া বলিল; "আচ্ছা! যাওয়া যাবে এখন, অত ব্যস্ত কিসের!" বলিয়া কেষ্টোর মাকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া পুষ্করিণীর দিকে চলিয়া গেল। এদিকে ইন্দু শয্যায় পড়িয়া শাশুড়ীঠাকুরাণী মনোরমা ও মনোরমার মাতার প্রতীক্ষা করিতেছিল। আর এক একবার বালিশে আড় হইয়া বিষাদব্যঞ্জক স্বরে নিজের যন্ত্রণাকে সঙ্গিনী করিয়া তাহারই সহিত প্রাণের গুপ্ত কথা কহিতেছিল। সে কথা কাহারও শ্রুতিগোচর হইতেছিল না, কেহই জানিল না, জানিল কেবল ইন্দু স্বয়ং আর অন্তর্য্যামী ভগবান্। ক্রমে প্রভাত রৌদ্রকরোজ্জ্বল হইল। শ্রুতিসুখকর মধুর

বিহগকাকলী সেই আলোর সঙ্গে মিশাইয়া গেল। জন-কোলাহল বাড়িল, ক্রমে মধ্যাহ্ন হইল, তখন পর্য্যন্ত কেহই ইন্দুর নিকট আসিল না। জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তাহার মাথা বেদনা, কাঁপুনি এবং পিপাসা বাড়িল। জলের জন্য একে একে সকলকে ডাকিল, কিন্তু কেহই আসিল না। নিজের এমন সামর্থ্য নাই যে উঠিয়া জল খায়। দুঃখে, তাহার চোখে জল আসিল। হায়! সংসারে ব্যথিতার ব্যথা কে বোঝে?

মধ্যাহ্ন অতীত হইলে পর মনোরমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বৌ! তোমার নাকি জ্বর হয়েছে?"

ইন্দু অশ্রুভরা চক্ষে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "মা! আমি কি এত দোষ করেছি যে, একবার চোখের দেখা পর্য্যন্ত দাও না!"

"আমাদের ত তুমি খবর দাওনি। এখন শুনতে পেয়ে ছুটে এলাম।"

"কেন মা, ঝিকে দিয়ে ত খবর দিয়েছি, সে বলেনি?"

মনোরমা সে কথার উত্তর না দিয়া কিছু নরম সুরে বলিল, "কিছু বার্লি টার্লি খাবে নাকি?"

"না মা, ক্ষিদে নাই, বড় পিপাসা, একটু জ

মনোরমা একগ্লাস জল দিয়া চলিয়া গেল। তাহার

মাতা বারাণ্ডা পর্য্যন্ত আসিয়াও একবার কক্ষে প্রবেশ করিল না। কেষ্টোর মা ইন্দুর ঘরে আসিতেছিল, দেখিল— ইন্দুর ঘরের বাহিরে মাতা-পুত্রী একটু নিম্ন স্বরে কথোপ-কথন করিতেছে, তাহা সে শুনিতে পাইল। মনোরমা বলিতেছিল, "যাই হোক মা, বড়ই অন্যায় কাজ করা হয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে পত্তর দিয়েছে, তা কি কর্ত্তাকে দিয়ে পড়ান উচিত?"

"আচ্ছা! সে কথা আজ আবার কেন? তোমাকেই বা আর কত বলবো? যদি সে গোপনে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লেখে, তা কি দেখা উচিত নয়?"

"হ্যাঁ! গোপনে লিখে আমাদের আর কি কর্‌বে?"

"বাছা! শত্রুকে বিশ্বাস কর্‌তে নেই।"

"এমন কিসের শত্রু মা ওরা?"

তুমি এখন কিছু বুঝ্‌ছো না, পরে বুঝ্‌বে। দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বোঝে না। তা বেশ, আমার কি? তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।"

"না মা, তুমি রাগ করো না, বৌমার জ্বর দেখে কষ্ট হয়েছিল কিনা, তাই বল্‌ছিলাম—চিঠিটে লুকান অন্যায় হয়েছে।"

"সতাসতীনের ঘরে কি অত দয়া কর্‌লে চলে? জ্বর

হয়েছে! হবে না? আমার মেয়ের সঙ্গে হিংসে করে, ওর কি কম আস্পদ্ধা!”

“তা করুক্ গে মা, তুমি একবার দেখে এসো, তোমায় ডেকেছিল।”

“কেন, আমায় আবার কেন ডাকা গো, আমি যে তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। বলে, ভাত পায় না, তাই জামাই-ঘর কর্‌তে এসেছেন!’ একি কথা মা, কি লজ্জা! কি লজ্জা! হে ভগবান্, তুমিই এর বিচার করো।”

মনোরমা স্বর্গাদপিগরীয়সী মাতার ইন্দু-কথিত অপমান-বাক্যে দুঃখিত হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে “আচ্ছা”—বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরিশেষে প্রতিশোধের উত্তেজনায় বলিল, “ছাখো মা, তুমি যত পত্তর পাবে, সব নিয়ে আস্‌বে, আমি সব ওঁকে দিয়ে পড়াবো দেখি—।” কেষ্টোর মার ইচ্ছা হইতেছিল যে একবার প্রতিবাদ করে, কিন্তু দয়াবতী বেচারা দুঃসহ যন্ত্রণায় কি ভাবিয়া সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিল। তবে তাহার ঘৃণার তপ্ত নিশ্বাসে মুরলীধরের বাস্তুভিটা তন্মুহূর্তে ঝলসিয়া যাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতির নবজীবনের গান গাহিতে গাহিতে প্রভাত উষা সঙ্গিনীকে বিদায় দিয়া নিরালে ইন্দুর আনন্দবিহীন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। তখন ইন্দুর জ্বর বিরাম হইয়াছে। কেষ্টোর মা যথাসময়ে রোগিনীর মুখ ধৌত করিবার দন্তমার্জ্জন, একঘটি জল, তোয়ালে দিয়া ও একটা রেকাবে কিছু ডালিমদানা রাখিয়া "বৌরাণী ওঠ! উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খাও, কাজ সেরে খাবার আন্‌ছি" বলিয়া চলিয়া গেল। ইন্দু তাহার জ্বরক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পাঁচ সাত নানা বিষয় চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় কেষ্টোর মা গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার বক্ষ-বস্ত্রের মধ্য হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া ইন্দুর হাতে দিল। ইন্দু পত্রখানি লইয়া দেখিবা মাত্র শয্যায় উঠিয়া বসিল এবং তাহার রোগমলিন মুখ সহসা আশার পূর্ণ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কেষ্টোর মার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, সে হাস্যমুখে বলিল "কেমন পেয়েছ ত, এখন বক্‌শিস্!" ইন্দু হাস্যমুখে খাম খুলিয়া আপন মনে পড়িতে আরম্ভ

করিল। আর তাহার বুকটা উল্লাসের স্নিগ্ধরসে মাখামাখি হইতে লাগিল। আগ্রহান্বিত হইয়া কেষ্টোর মা বলিল, "আমরা কি শুন্‌তে পাবো না?"

"কেন শুন্‌তে পাবে না, এই শোন—" বলিয়া ইন্দু হাস্যমুখে পড়িতে লাগিল—

ইন্দু! পূর্ব্বে তোমাকে একখানা পত্র দিয়েছি বোধ হয় পেয়ে থাক্‌বে। একেই ত তোমার সঙ্গ-বিহনে জীবন কিরূপে কাট্‌ছে" এবং "কোমল হাতের" কথা দুইটী বাদ দিয়া পড়িল, পত্র না পেয়ে কি ভাবে দিন গুলো যাচ্ছে, তা অন্তর্য্যামীই জানেন। চাক্‌রি এখনও হয় নি, সম্ভবতঃ সত্বরই হবে। তোমাদের মঙ্গল চাই। ইতি

এই বলিয়া ইন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে কেষ্টোর মার প্রতি চাহিয়া বলিল, "একি ব্যাপার ভাই! চিঠি দিলেন, অথচ পেলুম না, কি আশ্চয্যি! কেষ্টোর মা, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

ব্যাপার কি তা কেষ্টোর মা সেদিন সবই জানিয়াছিল, তবু কিছুক্ষণ মুখ নত করিয়া পরে চারিদিক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া চুপে চুপে যাহা সে দিন আড়ালে শুনিয়াছিল, তাহা সমস্ত বলিল। ঘৃণায়, দুঃখে, বিরক্তিতে ইন্দুর রোগক্লিষ্ট মুখে এক অস্বাভাবিক ভাব ফুটিয়া উঠিল।

সে দৌর্ব্বল্যে আত্মসংযম করিতে পারিল না, স্ফীত রাগরঞ্জিত গণ্ডে স্ফুরিত কণ্ঠে বলিল, "কি কুসঙ্গ!" কেষ্টোর মা ভীত হইয়া বলিল "ছ্যাখো বৌদি! এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়, তাহলে আমার......।" ইন্দু বাধা দিয়া বলিল, "তোমার কোন ভয় নেই কেষ্টোর মা, জীবন থাক্‌তে কক্‌খনো তোমার নাম প্রকাশ কর্‌বো না।" সহসা মনোরমা উচ্চস্বরে কেষ্টোর মাকে ডাকিল, সে তাড়াতাড়ি "দেখো দিদি" বলিয়া চলিয়া গেল। "কেন মা" বলিয়া কেষ্টোর মা মনোরমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা ক্রোধগর্জ্জিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ছ্যাখো ঝি, কেবল রোগী আগ্‌লে বসে থাক্‌লে এখানে চল্‌বে না।"

"কি কর্‌তে হবে মা, বলুন না।"

"বাবুর নাইবার তেল দিয়ে এসো আর বিবিকে জিজ্ঞেস করে এসো, তিনি কি খাবেন?"

"খাওয়ার কথা আর রোগীকে কি জিজ্ঞেস কর্‌বো মা! কর্ত্তাবাবু যা বলেন তাই খাবে।"

"কর্ত্তাবাবু ও সব কথায় নেই" বলিয়া মনোরমা সেখান হইতে কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। তখনও রোগীর পথ্যের সঙ্গে বা মনোরমার

সঙ্গে আদৌ দেখা সাক্ষাৎ নাই। ক্রমে ইন্দুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল,তৃষ্ণাও পাইতেছিল! কিন্তু কি করিবে,সে যে অসহায়! তাহার আহা বলিতে কেষ্টর মা ব্যতীরেকে সংসারে ত কেউ নাই। হায় বিধি! কেষ্টোর মাও যে পরাধীনা! যখন মন্দ অদৃষ্ট, তখন আর কাহার নিকট প্রার্থনা কি? ইন্দু আর ভাবিতে পারিতেছিল না। ক্রমে দুর্ব্বলতায় তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল! "জীবনের মেয়াদ আর কত দিন" ভাবিতে ভাবিতে তাহার তন্দ্রা আসিল। সম্মুখে সব যেন সে অন্ধকারময় দেখিল, বেদনায় বুকটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল, এমন সময় কেষ্টোর মা আসিয়া ডাকিল, "বৌদি—ও বৌদি ওঠ, একটু সাগু খাও—আহা কতখানি বেলা হয়ে গেছে!" ইন্দু চোখ মেলিয়া একবার দেখিয়া আবার চোখ বুজিল। ঝি আবার স্নেহ-বেদনাভরা স্বরে ডাকিল। এইরূপ দুই তিন বার ডাকিলে পর ইন্দু উঠিয়া পথ্য গ্রহণ করিল। কেষ্টোর মা তাহাকে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়া মনোরমার বাক্যবাণের ভয়ে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বসিয়া সে বালিশের তলা হইতে স্বামীর দেওয়া সেই পত্রখানি পড়িয়া আবার বালিশের নীচে রাখিল। পরে উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একখানা চিঠির কাগজ ও একখানা পোষ্ট আফিসের খাম বাহির করিয়া এই কয়টি কথা লিখিল।

শ্রীশ্রী৺দুর্গা।
শরণম্।

জীবন-দেবতা!

পত্র পেয়েছি। আমার ভয়ানক জ্বর, তুমি সত্বর আস্‌বে। তোমার অদর্শন আমায় মর্ম্মে মর্ম্মে দাহন করিতেছে! আর লিখিবার কিছু নাই।

দাসী।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া খামের মধ্যে পুরিয়া বালিশের নিচে রাখিয়া দিল।

অপরাহ্ণে কেষ্টোর মা আসিলে পর তাহাকে পত্রখানি গোপনে পোষ্ট আফিসে দিতে বলিল। সন্ধ্যার সময় তাহার পুনরায় জ্বর আসিল। এইরূপে এক সপ্তাহ অতীত হইলে পর শরৎ আসিল, সে পিতাকে দেখিয়াই প্রণাম করিতে যাইতে মুরলীধর নির্ব্বাক্ ও গম্ভীর মুখে শরতের দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেলেন। শরৎ বরাবর নিজের গৃহে উপস্থিত হইল। বর্ষাবারি-সিঞ্চনে নিদাঘ-শুষ্ক লতার মত ইন্দুর রোগক্লিষ্ট মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। শরৎ তাহাকে স্নেহ স্বরে ডাকিয়া দুই বাহু বেষ্টনে আলিঙ্গন করিতেই তাহার সে চন্দ্রমুখের হাস্য-জোৎস্না বিষাদ-মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল। বুক বহিয়া নীরবে অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইন্দুর জ্বর বিরাম হইয়াছে, পথ্যও পাইয়াছে। তবে শরীর দুর্ব্বল। তাহার উপর একদিকে সাংসারিক লাঞ্ছনা—পীড়ন, অপর দিকে স্বামীর মানসিক যন্ত্রণা, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া ইন্দু অস্থিতিপঞ্চকের ভাবী ছায়া দেখিতে পাইল। সুখের পথে এত কণ্টক, এ কি বিধাতার সৃষ্টিকৌশল! যিনি বিধাতা, তিনিই ত ভগবান্! ভগবান্ ত দয়াময়;—তবে কেন সংসারে এত দুঃখ-কষ্টের বিধান করিয়াছেন! ইন্দু ভাবিতে ভাবিতে—ভাবনার অকূল সমুদ্র দেখিতে পাইল। দেখিল, সে সমুদ্রের তীব্র স্রোত, উত্তাল তরঙ্গ, জল বিষম লবণাক্ত। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া নতমুখে আঁচলের চাবি-গুলা নাড়িতে নাড়িতে ইন্দু দুঃখজড়িতকণ্ঠে বলিল, "তা আমি কখনো পারবো না, তার চেয়ে বরং তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"কেন মেয়ে বাপের বাড়ী কি থাকে না—আর সবে মাত্র সাতদিন পরে কাল ভাত খেয়েছ, এতে কি তোমার অচেনা জায়গায় যাওয়া উচিত আর…।" বলিয়া' শরৎ নীরব হইল।

শরৎ কিছুক্ষণ পরে আবার কহিল, "কি বলবো বল, তুমি অবুঝ; আমার এখনও এমন ক্ষমতা হয়নি যে, কল্‌কাতায় থেকে তিনটী লোকের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি।"

ইন্দু বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল, "তোমায় ছেড়ে প্রাণ যে কোথাও যেতে চায় না!"

শরৎ স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, "দেখ, তোমায় কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী পাঠাতে পার্‌লে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নূতন সংসার গড়তে পারি। তুমি এখানে এই জ্বালাময় সংসারে..." আর বলিতে পারিল না।

"নারীই প্রধান অবলম্বন সংসার গড়তে। দুঃখযন্ত্রণা সইবার জন্যই ত নারীজন্ম! আমি সুখ চাই নে—তোমার সঙ্গে আমি বনবাসে থাক্‌লেও রাজরাণী।" ইন্দুর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। ইন্দু শরতের অলক্ষ্যে হাত দিয়া চোখ দুইটী মুছিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিল—"কি ভাব্‌ছো? ভেবে—ভেবে যে শরীর কাল হয়ে গেল। ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে, তুমি ভেবোনা" বলিয়া সে শরতের কপোলন্যস্ত হাত ধরিল। শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কেষ্টোর মা গৃহে প্রবেশ করিল। সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার হাস্যময় মুখ ভয়ে বিস্ময়ে কালো হইয়া গেল।

সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "দাদা-

বাবু!" শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "কেষ্টোর মা, তোমার স্নেহ-ঋণ আমি কখনো শোধ দিতে পারব না, তোমাকে আর একটী উপকার করতে হবে, তুমি ছোটমাকে ও বাবাকে বলো যে কনেবৌ কিছুদিনের মত বাপের বাড়ী যেতে চায়।"

"কেন দাদাবাবু!"

"দেখছ ত শরীরের অবস্থা বড় খারাপ, বিশেষতঃ আমরা যখন অপরাধী, তখন আমাদের এখানে থাকাও উচিত নয়।"

"ছি দাদাবাবু, ও কি কথা! ঘর সংসার ছেড়ে কোথা যাবে চাঁদেরা আমার!" ইন্দু বলিল, "আমরা ত তৃতীয় ব্যক্তি।" শরৎ অভিমান-সুরে বলিল, "তুমি কি জান না ঝি, আজ কদিন এ অসুখে পড়ে আছে, কেউ—এমন কি বাবা পর্য্যন্ত খোঁজ করলেন না; তবে কোন্ সুখে কার মুখ চেয়ে এখানে থাকা!"

"কি করবে ভাই! ভগবান্ দেখবেন।"

শরৎ আবেগের মুখে বলিয়া যাইতে লাগিল, "তার উপর আড়ালে দিদিমার কুমন্ত্রণা, ছোটমায়ের ঠেস মেরে প্রাণ-বেঁধা কথা, বাবার নির্ব্বাক গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ! তবে আর এখানে কেন! আজ যদি মা থাকতেন!"

শরতের চোখে জল আসিল, ইন্দু ও ঝির চক্ষু জলে

ভরিয়া উঠিল। কেষ্টোর মা আঁচল দিয়া, শরতের চোখ মুছাইয়া সমবেদনার স্বরে বলিতে লাগিল, "ছি, দাদাবাবু! কাঁদ্‌তে আছে, তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার ভয় কিসের? এসো বাইরে, সরোজ বাবু অনেকক্ষণ তোমার জন্যে বসে আছেন।" বাহিরে উভয়েই চলিল। পড়িবার ঘরে শরতের প্রবেশ মাত্র সরোজ উৎফুল্ল হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা থামিয়া গেল। সরোজ শরতের বাল্যযৌবনের বন্ধু ও সহাধ্যায়ী। একই গ্রামে তাহাদের বাড়ী। উভয়ের মধ্যে এমন ঘনিষ্টতা ছিল যে কেহ কাহাকে একদিনও না দেখিয়া থাকিতে পারিত না।

"কি ভাই ভাল আছ ত? কবে এলে?" বলিয়া শরৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

"আর ভাই দম্ আট্‌কে গেছি বেনারসে থেকে। সে কথা যাক্ তোমায় এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?" শরৎ অন্যান্য সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার, স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার কথা ও নিজে কলিকাতা থাকিয়া চাকুরি, উপার্জ্জিত অর্থে পৃথক সংসার গড়িবার কথাও বলিল। সরোজ অনেক বুঝাইতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু সে তাহা শুনিল না। সে নিরাশার মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। আশার কোন আশ্রয় নাই। ইন্দুকে কলিকাতায় লইয়া

যাওয়া যদিও অসম্ভব, কিন্তু স্থানান্তর করা উচিত। এই ভাবিয়া কেষ্টোর মায়ের সাহায্যে, পিতা ও বিমাতাকে সম্মত করিয়া ইন্দুকে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল।
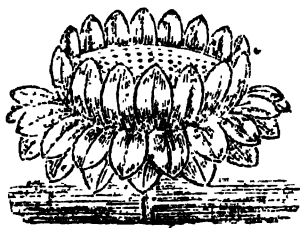
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ফেরিওয়ালা "চুড়ি চাই, চাই চুড়ি" বলিয়া পল্লী সরগরম করিয়া সদর রাস্তার উপর দিয়া চলিয়া গেল। ফেরিওয়ালার দিগন্তঝঙ্কৃত বাজখেঁয়ে স্বর মনোরমার মাতার কাণে পঁহুছিলে সে মনোরমাকে বলিল, "মনু, চুড়ি পর্না।" মনোরমা দালানে বসিয়া কেশ-বিন্যাস করিতেছিল, মাতা নিকটে উপবেশন করিল। মনোরমা বলিল, "না মা!"

"সেকি কথা, চুড়ি প'র্বি না কেন? তোর হাতে বেলয়ারি চুড়ি বেশ মানায়, কেমন গোল গোল হাত!"

"তা মানাক্ গে, মার এক কথা বাছা, এখনও আমি কচি খুকি আছি নাকি?"

"ওমা, কচি খুকি নয় ত কি? তোর বয়স কত? তুই ত মনু, কাল্‌কার! শিবুঠাকুর-পোর বিয়ে যে দিন হ'ল, সেই রাত্রে তুই হ'লি! ওমা, সে ত সে দিন! মনুর কথা শোন, পঁচিশ বছর আবার বয়েস! এখনও বুড়ি থুব্‌ড়ী শরতের মাগ ইঁদি পোড়ারমুখী যদি টেবো গালে পাউডার মেখে— তাতে আবার ম্যাজেন্দারের রং দিয়ে বেবুশ্যের মত সাজ্‌তে

পারে, তা হ'লে তুই দু'হাতে আটগাছা ক'রে ষোল গাছা চুড়ি প'র্‌তে পারিস্ না! অবাক্ ক'র্‌লে মা!" বলিয়া মনোরমার মাতা একটু বিমর্ষ হইল। মনোরমাও একটু রুক্ষ স্বরে বলিল,—"তুই আর বেগায়া বোয়ের কথা তুলিস্ না মা! ছুঁড়ি যেন সাপের দু'পা দেখেছে। বিদেয় হ'য়েছে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছে। এখন আর একটা বিদেয় হ'লেই রক্ষা পাই। কেউ যেন সতার ঘরে মেয়ের বিয়ে না দেয়—এই আমি যেমন দিনরাত্রির জ্বল্‌ছি, তাকেও ত এই রকম জ্বল্‌তে পুড়্‌তে হবে।"

মনোরমার মাতা কন্যার এই কথায় কিছু মর্ম্মাহত ও একটু অপ্রস্তুত হইল। তথাপি কৃতকর্ম্মের দোষ পরিহারের জন্য বলিল,—"আমি কি তোকে অসুখী ক'র্‌বার জন্য মুরলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেম মা! ভাব্‌লুম এক, হ'য়ে গেল আর। তোমার কপাল! তা ত খণ্ডন ক'র্‌তে মা বাপে পারে না। আর জামাই বা কি মন্দ! ধনে-মানে-কুলে-শীলে-পয়সা-কড়িতে সব দিকেই বড় নাম। আমরা গরীব, আমাদের ভাগ্যে যে এমন ঘট্‌বে—তা কখন ভাব্‌তে পারি নি! তবে যা ঐ এক দোষ—সতার ঘর। তা বিধেতা সব দিক্ সমান করেন নি। যাক্ এখন ত একরূপ নিশ্চিন্ত হ'য়েছ, কেবল একটা কাঁটা, তা সে কাঁটা তুল্‌তে কতক্ষণ?" বলিয়া মনো-

রমার মাতা মনোরমার কাণে কাণে কি বলিল, তাহা পাঠক-পাঠিকার জানিবার কৌতূহল হইলেও দুর্ভাগ্য গ্রন্থকার বর্ত্ত-মানকালে তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণে অসমর্থ। তজ্জন্য ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

পরে মাতা-পুত্রী উৎসাহে গাত্রোত্থান করিয়া পুরাতন ভৃত্য উচ্ছৃঙ্খাকে সঙ্গে লইয়া সদর বাগানের পানে চলিয়া গেল—অতি দ্রুতপদ-বিক্ষেপে। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একটী ঝাউ-গাছের তলায় মাতা-পুত্রী হাত মুখ নাড়িয়া কি শলা পরামর্শ করিতেছে। উচ্ছৃঙ্খা একটী কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে আনিয়া মনোরমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিয়া, আপন মনে চলিয়া গেল। আগন্তুক ব্যক্তিকে নিকটে আসিতে দেখিয়া লজ্জাশীলা মনোরমা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা হইল। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সকলের কি একটা গুপ্ত পরামর্শ চলিল। প্রৌঢ় দ্রুতপদে বাহির-পথে চলিয়া যাইলেন। মাতা-পুত্রী উভয়ে পুনরায় দর-দালানে আসিয়া বেচারা শরৎ মক্ষিকা বিনাশে কি একটা দুরভিসন্ধির মাকড়সার জাল বুনিতে আরম্ভ করিল। মাতা বলিল, "না ক'র্ব কেন, তাতে আর পাপ পুণ্যি কি! যারা আমার মেয়েকে সুখী হ'তে দেয় না—তাদের আমি পাঁশপেড়ে কাটি, মাটিতে না রক্ত পড়ে।"

মনোরমা সে কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "সত্যি মা, শুধু ভাল মানুষ সেজে থাক্‌লে হয় না। কিন্তু—"

বাধা দিয়া মনোরমার মাতা কহিল, "তা'হলেই রসাতলে যেতে হয়। দয়া-ধর্ম্ম ক'র্‌ব কার উপর, যারা আপনার মন বুঝে কাজ করে।"

মনোরমা বলিল,—"লোকে ব'ল্‌বে, মাগী সৎ ছেলেটা তাড়ালে! তা বলুক্ গে, কেমন মা?"

"লোকের কথা আমি ধরি না বাছা! তাদের ত আর সৎ বৌ-ছেলে নিয়ে ঘর ক'র্‌তে হয় না?"

এমন সময় একটা গালা মোহর আঁটা—বড় খামে পোরা মোটা চিঠি নিয়ে উচ্ছবা মনোরমার হস্তে দিল। উচ্ছবা চলিয়া গেল। মনোরমা সেই বড় খামটা ছিঁড়িয়া মুখ কাটা ছোট খামে পোরা ৫।৭ খানা পত্র বাহির করিল। মনোরমার মাতা সাগ্রহে কহিল, "কেমন ঠিক হ'য়েছে ত?"

মনোরমা হাসিয়া কহিল, "ঠিক।"

"তবে আর দেরী ক'রিস্ কেন, এখন শরৎ ঘরে নাই। এই ত সুযোগ। চিঠিগুলো এমন জায়গায় রাখ্‌বি যেন নজরেও পড়ে আর লুকানো রাখাও মনে হয়। চিঠি-গুলো প'ড়ে দেখ্‌ না, হাড়হাবাতে ছোঁড়ার চিঠি প'ড়ে মুণ্ডু ঘুর্‌বে ত?"

মনোরমা মনোযোগের সহিত পত্রগুলি কয়ে আকার কা, লয়ে ঈকার লী ইত্যাদি রূপে পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইল এবং হাস্যমুখে মাকে আশার সান্ত্বনা দিয়া চঞ্চল চরণে শরতের কক্ষে প্রবেশ করিল। অবিলম্বে পত্রগুলি শরতের টেবিলস্থিত একটী বাংলা উপন্যাসের মধ্যে রাখিয়া যেন তড়িত-শক্তির বলে মাতার নিকট পুনঃ হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতা বুঝিল—আমার মনু মহান্ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া তাহার চরম সৌভাগ্য লইয়া ফিরিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইন্দুলেখা শ্বশুর বাটীতে তাহার সর্ব্বস্ব রাখিয়া নিজে শীর্ণ রুগ্নশরীর লইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। এই এক সপ্তাহের মধ্যে কত কি পরিবর্ত্তন হইল, কত কুসুম ফুটিল, কত ঝরিয়া পড়িল! ইন্দুকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া শরতের নূতন সংসার গড়িবার বলবতী আশা, বিরহ-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল! সতী-বিরহে ভোলানাথ যেমন জগতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিভৃততম প্রদেশে বসিয়া তাঁহারই "সতী" নাম জপ করিতেন; শরতের অবস্থাও তাহাই হইল। ইন্দু-শূন্য কক্ষ শ্মশানের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রিয়ার সঙ্গহীনতায় শরতের চিত্ত তুষানলের মত গুমরিয়া গুমরিয়া পুড়িতে লাগিল। হায় ভগবান্, এ তাহার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত! শরতের কক্ষে প্রবেশ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না, তবু যেন কেমন আকর্ষণে সে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে শরতের আসা অবধি সে ইন্দুকে সন্ধ্যার পর এই কক্ষে প্রতিদিনই দেখিত, উভয়ে কত কথাই কহিত, কত হাসির লহরেই পরস্পর খেলিত,

আবার কল্পনায় স্বর্গের অমৃত আনিয়া পরস্পর উভয়েই অভি-
ষিক্ত হইত। শরৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়াই পালঙ্ক-শয্যায়
ইন্দুমতীকে যেন শায়িত দেখিতেছিল. পরক্ষণেই নিজের ভ্রম
বুঝিয়া লইল। হায়! কেন এমন হইল! শরতের সমস্ত
হৃদয় যে খালি পড়িয়া আছে! মনে মনে শরৎ বলিতে
লাগিল,—হায় হায় যাহার জন্য খালি, সে কোথায় গেল!
প্রাণপাখী কোথায় উড়ে গেল? শরতের হৃদয় চীৎকার
করিয়া উঠিল! ওগো, তোমরা বল না, আমার প্রাণপাখী
কোথায় গেল? হায়! এ হৃদয় কি দিয়ে পূর্ণ করিব?
সমস্ত বিশ্বকে বসাইলাম, কই কিছুতেই ত পূর্ণ হইল
না! কত বেদ-বেদান্ত-দর্শন-উপনিষদ, কত কাব্য-উপন্যাস
পড়িলাম, তবুও ত হৃদয় পূর্ণ হইল না। উঃ! হু হু
পুড়িয়া যে ছাই হইয়া গেল!

"হিয়া দগ্‌দগি পরাণ পোড়ানি
কি দিলে হইবে ভাল॥"

কি দিয়া এ আগুন নিবাইব! চক্ষুতে জল নাই,
শুকাইয়া গিয়াছে! এ বুকখানা পোড়ে ত একেবারে পুড়িয়া
ছাই হয় না কেন! এমন করিয়া তুষানলের মত রহিয়া রহিয়া
পুড়ে কেন? হা দয়াময়! বড় জ্বালা! বড় জ্বালা! রক্ষা
কর! রক্ষা কর! উঃ! ভাবিতে ভাবিতে শরতের চক্ষু জলে

ভরিয়া আসিল। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি! কোথাও সাড়া শব্দ নাই। দ্বিতলস্থ অট্টালিকায় শয়ন-গৃহের শয্যার উপর বসিয়া বামবাহু উপাধানে রাখিয়া করদ্বয়ে গণ্ডস্থল রক্ষা করিয়া শরৎ বসিয়াছিল; আবেগক্লিষ্ট ম্লান গণ্ডস্থল বহিয়া ঝরণার মত ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল। উচ্ছ্বসিত স্রোতাবেগ হৃদয়-নদীর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল; আর সংবরণ করিতে পারিল না। বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে আবেগ প্রশমিত হইলে উন্মুক্ত জানালার নিকটে আসিয়া বসিল। অস্ফুট ক্ষীণ চন্দ্রালোক গৃহমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। মৃদু নৈশ সমীরণ ঘোর নিশীথে গোলাপ, বেল, চম্পক, চামেলী, যূথী, মল্লিকা, মালতী, হাস্নাহেনাপ্রভৃতি পুষ্পপ্রাণ চুরি করিয়া পলাইতেছিল। শরৎ দেখিতেছিল, প্রকৃতি অন্ধকারময়ী। সেই অন্ধকারের মধ্যে একটী উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। আকাশে অনন্ত নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিতেছিল। কেন না আজ তাহাদের বড় আনন্দ! কারণ, পূর্ণিমার শশধর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। ক্ষীণ জ্যোৎস্না-ধারা ও হিমকণা নিকটস্থ উদ্যানে কুসুমরাশির উপর পড়িতেছিল। তাহাতে যেন হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া কুসুম বিকসিত হইতেছিল। শরৎ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে মনে বলিল, "হায়! কেন আমি পাঠালুম!"

আবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যেন সে স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্র নাই! নক্ষত্রের সে মৃদু শিহরণ কম্পন নাই, বাসন্তী সমীরণে সে প্রাণ-স্নিগ্ধকর হিল্লোল নাই, রমণী বদনে সে সৌন্দর্য্য নাই! সে হাসি নাই! সে সান্ত্বনাবাণী নাই, সে সহানুভূতি নাই! সে কিছুই নাই! যেন পৃথিবীর প্রাণ নাই! সব নিবিয়া গিয়াছে, আছে মাত্র ভস্মাবশেষ স্মৃতিচিহ্ন! না—না সবই আছে। সে সৌন্দর্য্য আছে, সে মধুর গীতি আছে. সে চন্দ্র আছে, সে প্রেম আছে, সে অঙ্গ-গ্লানিনাশী সমীরণ আছে, সে সব আছে। অথচ তাহাতে সে আকর্ষণী—সে মোহকারিতা নাই, যেন এক যন্ত্রচালকের অভাবে বিরাট বিশ্বযন্ত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া আছে। কেবল নৈরাশ্যের হাহাকার দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত শরৎ শিহরিয়া উঠিল, উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে বলিয়া উঠিল "এ কি?" আবার উঠিয়া বিষণ্ণ প্রাণে টেবিল সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিল, অন্যমনস্কে টেবিল-স্থিত গ্রন্থরাজির মধ্যে একখানা পুস্তক লইয়া তাহার পৃষ্ঠা উলটাইতে লাগিল, ভাল লাগিল না, অপর এক খানা পুস্তক—বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী লইল। শরৎ বাংলা উপন্যাস বড় কম পড়িত, পড়িত ইন্দু। বঙ্কিমের গ্রন্থগুলি ইন্দুর জীবনের সঙ্গিনী। শরৎ তাহা জানিত—তাই শরৎ

সেই গ্রন্থাবলীখানির পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। গ্রন্থাবলীর প্রত্যেক পুস্তকের নামের উপরে ইন্দুর স্বহস্ত লিখিত নাম লেখা ছিল। শরৎ তাহা নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেখার তৃষ্ণা মিটিতেছিল না।

আবার পৃষ্ঠা উল্‌টাইতে লাগিল, কয়েক পৃষ্ঠা উল্‌-টাইতেই একটা লেখা খামের গোছা দেখিতে পাইল। শরৎ দেখিল, কয়েকখানি খামে একই হস্তাক্ষর—শিরোনামায় ইন্দুর নাম। শরৎ সাগ্রহে একখানি খাম হইতে এক এক-খানি পত্র বাহির করিতে লাগিল। একখানা পত্রে এইরূপ লেখা ছিল। শরৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

শরণং

নিবেদিতা লেন।

প্রিয়তমে ইন্দু! ভালবাসার পত্রখানা বুকে তুলে নিলুম। তুমি যে বাল্যবন্ধু ব'লে আমাকে এখনও মনে রেখেছ, তাতে তোমাকে ধন্যবাদ। আমি এখনও তোমার পূজা করছি। মানুষ মানুষকে পর করতে কি পারে? ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে তুমি পরের ঘর আলো করতে গিয়েছ। আবার একদিন যে নিজের ঘরে এসে নিজের ঘর আলো করবে,তারি প্রতীক্ষায় রৈলুম।.........

অনুগত—নিরাপদ

শরৎ আর সে পত্রখানি হাতে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার সর্ব্ব অবয়ব থর থর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল! মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। শিরায় শিরায় সংহার-বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল! শরতের মনে হইতে লাগিল, নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য নিতান্ত নির্ম্মম তেজে কক্ষের আবরণী বিদীর্ণ করিয়া প্রলয়ের অকরুণ বহ্নি তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিতেছে! ভূতযোনিসকল কালান্তক বিষপাশ হস্তে অট্ট-হাস্যে তাহার শ্মশানকক্ষ মুখরিত করিতেছে! চতুর্দ্দিকে সাহারার তপ্ত বালু উড়িতেছে! শরৎ চেয়ার হইতে উঠিল—তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিতেছিল! আবার সান্ত্বনা আসিতেছিল, "ইন্দু বিশ্বাসঘাতিনী" ইহা কখনই হইতে পারে না। আবার আর একখানা পত্র পড়িবার উদ্‌যোগ করিল—পড়া হইল না। কর শিথিল হইল,পত্র কক্ষতলে পতিত হইল। তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে রুদ্রবীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল! শরৎ আবার ধৈর্য্য-সংযমের দৃঢ় বন্ধনে হৃদয় বাঁধিল। নূতন সুরের নব-সঙ্গীত আবার তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—শরৎ শুনিল, বিশ্ব যেন শরতের মঙ্গলের জন্য নান্দী পাঠ করিতেছে। কে যেন বিশ্বজনীন সমীরণ-স্রোতে অন্তরের নিগূঢ়তম করুণ সুরটী ভাসাইয়া দিয়া গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অকারণ চাঞ্চল্যময় জীবনকে ঘোর গভীরতায় পূর্ণ করিয়া গাহিতেছিল :—

"জাগরে জাগরে মায়া-নিদ্রাগত মন।
কত আর ঘুমায়ে রবে হ'য়ে অচেতন॥
অসার সংসার-সুখে, হায় কামিনী-কৌতুকে,
দীপ্ত বাসনা-বাতিকে দেখিছ স্বপন।
যদি না ঘুমালে নয়, মোহনিদ্রা উচিত নয়,
পাবে ধন মনোময় শ্রীহরির চরণ॥
দীপ্তযোগে অন্তর জাগে, পরামর্শ অনুরাগে,
জাগ মন যোগেযাগে, জাগে জগতজীবন॥"

শরৎ নির্ব্বাক্ স্পন্দনহীন স্থিরদৃষ্টিতে একান্তমনে গান শুনিতেছিল। মেঘমুক্ত নিশীথ আকাশের মত তাহার মোহাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশ অশ্রুতপূর্ব্ব দিব্য সঙ্গীতে মোহ-মেঘ দূরীভূত হইয়া বিবেক-জ্যোতিতে প্রভাসিত হইল। তাহার হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বৈরাগ্যের গৈরিক বসন-পরা করুণ সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। হায়! সে এতদিন কি করিয়াছে, তণ্ডুল ছাড়িয়া তুষকণা গ্রহণ করিয়াছে। সুবাসিত স্ফটিকশুভ্র বিস্তৃত প্রেমপারাবার ছাড়িয়া পূতিগন্ধময় পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ কূপে ডুব দিয়াছে। হায়! ওগো, জীবনের সাক্ষি! ভবপারের কাণ্ডারি! ক্ষমা কর, তাহাকে ক্ষমা কর! সে তোমায় ভুলিয়া...... শরৎ আর ভাবিতে পারিল না, চক্ষু দিয়া অবিরল

জলধারা পড়িতে লাগিল। ধমনীতে ধমনীতে—শিরায় শিরায় তীব্রবেগে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল। মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রে অবসাদের তন্দ্রা আসিয়া ঘেরিল। সে দুই হাত মস্তকে দিয়া জানালার গরাদে মস্তক ন্যস্ত করিল, অশ্রুসিক্ত নয়ন-যুগল ক্রমশঃ মুদিয়া আসিল। মাতৃরূপিণী নিদ্রা আসিয়া শ্রান্ত দুরন্ত শিশুকে ক্রোড়ে করিলেন, সমুদয় চিন্তার ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন, অবসাদের কলঙ্করেখা মুছিয়া দিলেন। চঞ্চল শিশু দেবীরূপিণী মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অমাবস্যার রাত্রি। ঠং ঠং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। শ্রাবণের ধারা সন্ধ্যা হইতেই ঝিম্ ঝিম করিয়া বেহাগ-রাগে, কখন বা ঝম্‌ঝম্ করিয়া ভৈরব-রাগিণীতে গান গাহিতে গাহিতে পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ বিপন্ন পথিকের বিপদে ব্যথিত হইয়া নীরব পল্লীর খড়োচালের ছায়ায় অন্ধকারাবৃত সংকীর্ণ পথ দেখাইয়া দিতেছিল। মুরলীধর বাবুর সদর দালানের সম্মুখের ড্রেনে সানন্দে ভেকসকল কবি-বর্ণিত মক্ মক্ স্বনে সীমান্তর ধ্বনিত করিতেছিল। প্রকৃতির নীরব সাধনায় আরও ব্যাঘাত দিবার জন্য পশ্চিম বায়ু শন্ শন্ করিয়া বহিতেছিল। করালো নিশিথিনী! চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার! নিকটের বা সম্মুখের কোন জিনিষটীও দেখা যাইতেছিল না। কেবল মুরলীধরের দ্বিতল অট্টালিকার একটী গবাক্ষের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া ক্ষীণ আলোক-রেখা দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ "চড়াৎ" করিয়া মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। প্রবল বাত্যায় মুরলীধরের সখের খিড়কী উদ্যানের সাধের মাধবীমণ্ডিত চাঁপা গাছটী "মড় মড়" শব্দে ভূমিসাৎ হইল। তখনও রোগক্রান্ত মুরলীধর নিদ্রা যান নাই। ভীষণ

শব্দে ভীত হইয়া মুরলাধর চীৎকার করিয়া উঠিলেন,— বলিলেন, "মনু, ওঠ - ওঠ!"

মনু ওরফে মনোরমা তখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত। সহসা মুরলীধরের কঠোর চীৎকারে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভ্যালা বাপু ঢং! আর পারি না। মাকে ডাক্‌লে হয় না! সারা রাতটা একটুকুও যে ঘুমোতে দিলে না। রোগ কি আর কারোও হয় না? তোমার রোগে যে পাড়াশুদ্ধ রোগী হ'য়ে দাঁড়াবে দেখ্‌ছি!" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। ভীত মুরলীধর উর্দ্ধমুখ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায় ভগবান্, একি বিড়ম্বনা তোমার, না আমার লব্ধকর্ম্মের ফল!" আতঙ্কে তাঁহার দুর্ব্বল হৃদ্‌পিণ্ড পূর্ব্ব হইতেই বাত্যাপীড়িত কদলীপত্রের মত কাঁপিতেছিল, তাহার 'পর তিনি পত্নীর ঘৃণিত ব্যবহারে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, যেন অবিলম্বে মৃত্যুকে বরণ করিতে। তিনি তন্মুহূর্ত্তে সংজ্ঞা হারাইলেন—তাঁহার কণ্ঠ হইতে "গোঁ গোঁ" শব্দ বাহির হইতে লাগিল। তখনও মনোরমা নিদ্রিত। কয়েকমাস হইল মনোরমার মাতার শরীরের বাম অংশ পক্ষঘাতগ্রস্ত হইয়াছিল। সে কোন রকমে খোঁড়াইয়া চলিতে পারে, তাহাও বহুকষ্টে। বৃক্ষপতনের শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল,

কিন্তু শব্দের সূক্ষ্ম কারণ অনুধাবন করিতে পারে নাই। সে অনুমান করিয়াছিল, বুঝি দ্বিতল অট্টালিকার চিলে কুটুরীটা মড় মড় করিয়া দ্বিতলের সোপানে পড়িয়া গেল। বিশেষ ভাবনা—সে ছাদে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্র কেমন করিয়া শুষ্ক করিবে; আরও মনুর কোনও বিপদ হইলে হইতে পারে ভাবিয়া ন্যাংচাইতে ন্যাংচাইতে দক্ষিণের কক্ষ হইতে রেলিংঘেরা বারান্দার মধ্য দিয়া কন্যা-জামাতার শয়ন-কক্ষের সম্মুখে আসিয়া কড়া নাড়া দিতে লাগিল খুব জোরে। মধ্যে মধ্যে কক্ষ হইতে "গোঁ গোঁ" শব্দও শুনিতে পাইল, সে আরও ভীত হইল, তাহার গর্ভবতী বালিকা কন্যাকে জামাতা বাবাজীবন রোগের যন্ত্রণায় কোনরূপ রূঢ় ব্যবহারে ব্যথিত করিলেও করিতে পারে, সে আরও জোরে কড়া নাড়া দিতে লাগিল। সে শব্দে মনোরমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, উৎকর্ণ হইয়া একবার বালিশ হইতে মাথা তুলিল, তবু সে তখনও শুনিতে পায় নাই যে, বাহির হইতে কড়ানাড়ার শব্দ হইতেছে। বারম্বার আঘাতে মনোরমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মুরলীধরের কণ্ঠ-নিঃসৃত "গোঁ গোঁ" ধ্বনি কর্ণস্পর্শ করিল। কক্ষে বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছিল। মনোরমা ভীতা হইয়া দেখিল, মুরলীধর পালঙ্ক হইতে ভূমিতে পতিত—অর্দ্ধনগ্নাবস্থায়। আবার বাহির

কপাটের কড়া নড়িতে লাগিল। মনোরমা ভীত অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"কে গা—মা না কেষ্টোর মা?"

মনোরমার মা উত্তর দিল, "আচ্ছা ঘুম বাবা!"

মাতৃকণ্ঠস্বরে ভীতা মনোরমা ভরসা পাইয়া ব্যস্তভাবে কক্ষার্গল মুক্ত করিয়া দিল। মনোরমার মাতা হ্যাংচাইতে হ্যাংচাইতে গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—"একি জামাই যে মাটিতে পড়ে—কিলো তুই দেখিস্‌নি!"

মনোরমা বিরক্তির সুরে কহিল, "দেখ্‌ব আবার কি? ও সব ঢং, সারা রাতটা যদি ঘুমোতে দিয়েছে! এখন ভোরের বেলায় নাক ডাকিয়ে ঘুম দেওয়া হচ্চে।" প্রাচীনা মনোরমার মা জামায়ের অবস্থা দেখিয়া কন্যার প্রতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "ওলো কচিখুকি, তা নয়, দেখ্‌ছিস্‌ না, মুখে যে গোঁজোলাল ভাঙ্‌ছে! পায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌ দেখি!"

মনোরমা যন্ত্রচালিতের ন্যায় মাতার কথায় মুরলীধরের গাত্র স্পর্শ করিল। অমনি তাহার ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ উদয় হইল। সে দেখিল—মুরলীধর আড়ষ্ট! তাঁহার দেহ শক্ত! যেন জীবিতের লক্ষণ নহে। অকস্মাৎ স্বামীদেহের পরিবর্ত্তনে অধীর হইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা—এ যে কেমন কেমন ঠেক্‌ছে! ওমা কি হল গো!" মনোরমার মাতাও অমনি থর থর করিয়া কাঁপিয়া ভূতলে

পতিত হইল। তখন মনোরমার সঙ্কট-সাগর। সে সাগর পার হইবার উপায় কি? সে আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে নিম্নের কক্ষে নিদ্রিতা কেষ্টোর মাও জাগিল ও মনোরমার কক্ষাভিমুখে চলিল। পুরাতন ভৃত্য উচ্ছবা নির্ব্বোধ উড়িয়া, তাহার "মনিমানের" প্রতি বিরক্ত হইয়া উচ্চস্বরে "কাঁই আপনঙ্কর হলা"—বলিয়া দ্বিতলের সোপা-বলী নিজ একতান মনে মন্থর চরণে অতিক্রম করিতে লাগিল। মনোরমা কেষ্টোর মাকে দেখিয়া আরও ক্রন্দন স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ্ কেষ্টোর মা—কি হ'ল দেখ্। আমার মাথা ঘুর্ছে! ওগো আমার কি হল গো"—বলিয়া মনোরমা পতিতা মাতার পার্শ্বে শয়ন করিল। বুদ্ধিমতী স্নেহদয়াবতী প্রভুপরায়ণা কেষ্টোর মা মুরলীধরের ও মনোরমার মাতার অবস্থা দেখিয়া বুঝিল, সত্যই মনোরমার আজ দুর্দ্দিন! অমনি করুণায় করুণাময়ী কেষ্টোর মার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে "উচ্ছবা, শীগ্গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন্গে" বলিয়া অগ্রে সংজ্ঞাহীন মুরলীধরকে বক্ষে তুলিয়া পালঙ্কের শয্যায় শোয়াইল। চোখে মুখে জল ছিটাইল। মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। পক্ষাঘাতরোগগ্রস্তা মনোরমার মাতার মুখে চোখে জল দিয়া সংজ্ঞা আসিলে উঠাইয়া বসাইল। কেষ্টোর মার তখন শত হস্তিনীর শক্তি। মনোরমাকে বুঝাইল, "মা,

যদি সোয়ামীকে বাঁচাইতে চাও,তাহলে অধীর হ'লে চলবে না, স্বামীর সেবা কর।" মনোরমা কেষ্টোর মার সান্ত্বনায় শান্ত হইল না। উঠিয়া গৃহের বাহিরে গিয়া করুণ স্বরে তাহার পরিণাম-গীতি বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতে সুরু করিল। মনোরমার মাতা অস্ফুট স্বরে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে কেষ্টোর মাকে বলিল,"কেষ্টোর মা,বাবা আমার বাঁচবে ত?" কেষ্টোর মা দুই হাত মাত্র উপর দিকে তুলিয়া নিজের মন্তব্য কিছুই প্রকাশ করিল না। তখনও উচ্ছবা হতভম্বা হইয়া গৃহের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল, "এউ কউতির কালে কি হলা? সব মহাপ্রভুঙ্ক ইচ্ছা, কিমত সে"—অমনি কেষ্টোর মা গর্জ্জিয়া বলিল, "উচ্ছবা, তুই এখনও যাস্ নি?" তখন উচ্ছবার প্রাণের সকল ভাব কর্পূরের মত উবিয়া গেল। সে অনুতপ্ত প্রাণে তাহার শক্তির বহির্ভূত পদসঞ্চারে প্রাণপণে ডাক্তার বাবুর গৃহোদ্দেশে চলিতে লাগিল। মুরলীধর সেই সময় বলিয়া উঠিলেন—"মধুসূদন, মুক্ত কর।" রুদ্ধকক্ষে প্রতিধ্বনি হইল, "মধুসূদন, মুক্ত কর।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সময় মধ্যাহ্ন। একটী তরুতলে শরৎ ও সরোজ দুই বন্ধুর কথোপকথন হইতেছিল।

"তুমি যা বল্লে, সবি সত্য, কিন্তু —"

"আবার কিন্তু কি ? ছ্যাখো, আমার কথা শোনো, তাঁকে নিয়ে এসো, পরে যা হয়, একটা ব্যবস্থা করো।"

"না সরোজ ! সে আমি পারবো না ! উঃ ! যে জ্বালায়—" শরৎ একটু দম লইয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। সরোজ আর কোন কথা বলিল না, কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকিল। পরে শরৎ বলিল, "সরোজ, তোমরা যেখানে পূজোর ছুটীতে বেড়াতে গিয়েছিলে, বোধ হয় সে জায়গাটী তোমার ভাল লেগেছিল ?"

সরোজ ভাবিল, যদি সে স্থানের প্রশংসা করি, তাহা হইলে শরৎ নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে চাহিবে, এই ভাবিয়া সে

বলিল, "আরে ভাই, সে অতি কদর্য্য জায়গা, মোটে মন টিকে না. কেন তোমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না কি ?"

"হ্যাঁ। ভাই !"

"কেন হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন। সে দিন না তুমি বলেছিলে যে, চাক্‌রি করে নতুন সংসার গ'ড়বে।"

জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ উদাস-নয়নে উপরের দিকে চাহিল।

"এ সময়ে তিনি তোমার কাছে থাক্‌লে তুমি শান্তি পাবে, তাই বলি তাঁকে নিয়ে এসো।"

"উপায় নাই। সে অনেক কথা, বিশেষতঃ আমি কপর্দ্দকশূন্য। আমার পিতা ধনবান সত্য, কিন্তু তাঁহার ধনে আমার কোন অধিকার নাই। তাঁহার সমুদয় অর্থের সহিত স্বয়ং তিনি আমার বিমাতার ছলনাজালে বদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছেন, হায়ঃ! তিনি এখন বন্দী।"

সরোজ বিরক্ত ভাবে বলিল, "শরৎ, তুমি পুরুষ হয়ে সামান্য ক্ষণিক-বিরহে সমস্ত আশা-ভরসা জলাঞ্জলি দিতে বসেছো! এই কি উচিত ?"

শরৎ পূর্ব্বাবেগ সংবরণ করিয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "সে সব কথা ছেড়ে দাও, কেউ কারো নয়।"

"তবে তাঁর উপায় কি হবে?"

"নিরুপায়ের উপায় যিনি—তিনিই আছেন! আর এই ত সংসার, যেখানে স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা—যেখানে ক্ষণস্থায়ী সুখের আশায় মানুষ চিরস্থায়ী সুখ ফেলে মরীচিকার পিছনে ছুটে শেষে নিরাশ হয়ে দিনান্তে দীননাথকেও একবার ডাকে না! কি মোহ! মানুষ কাঞ্চন ফেলে কাচ গ্রহণ কচ্ছে।" আবেগের স্রোতে বলিতে বলিতে শরৎ আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আবার বলিল, "হা দয়াময়! এ পাপীকে দয়া করে উদ্ধার কর।" সরোজ নীরবে শুনিতেছিল ও মনে মনে বলিতেছিল, "হে! দয়াময় এ কি কর্‌লে?" শরতের হৃদয়-বীণার যে সব তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ছিন্নতন্ত্রীতে কেবলমাত্র ভাঙ্গা নিরাশ-রাগিণী অশ্রোতব্য সুরে অদৃশ্য তারে ধীরে ধীরে বাজিতেছিল। গভীর বিরহ ও সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান তাহাকে যেন এ কোলাহলমুখর সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে অব্যক্ত প্রকৃতির নীরব নির্জ্জন পথে লইয়া যাইতেছিল। শরৎ আবার নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল, "ভাই, কে কার, সবি মিথ্যা! আমি কে, তুমি কে, সে কে? কর্ম্মসূত্রে আমরা সব গ্রথিত হয়েছি, আবার কালস্রোতে তৃণের মত অনন্তবিস্তার অকূল সিন্ধুর অনন্ত বক্ষে ভেসে যাবো! কোথায়

কূল পাবো কি না পাবো, তা কে জানে! এই ত সংসার—অন্তে যার ধ্বংস, নিরাশার হা হুতাশ! মধ্যে যার অন্ধকার, ঘোর আবিলতা! মূলে যার মোহ-মদিরা, যা জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর! তারি ভাবনা, তাই, উঃ! তা কি ভীষণ! সরোজ আমায় তুমি আর অনুরোধ করো না...।" সরোজ একটু রুক্ষ-স্বরে বলিল,"এ তোমার শুষ্ক তর্ক,আমি ও সকল বুঝিনা,আমি নিশ্চয় বল্‌বো, এ উদাসীনতা অমার্জ্জনীয়! এ বৈরাগ্য নয়—কাপুরুষতা! কর্ত্তব্য নয়—দুর্ব্বলতা! আর তোমার উপর একটা মস্ত দায়িত্ব রয়েছে জানো, পতি ভিন্ন সতীর আর কে আছে? ধর্ম্মবন্ধনের কি এই নীতি? শরৎ,ইহা তোমাব ন্যায় যুবকের যোগ্য কথা হচ্চে না, একটা তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তির মত কথা বল্‌ছ, যা লোক-সমাজে বল্লে তোমাকে উপহাস কর্‌বে—পাগল বলে বিদ্রূপ কর্‌বে। যে তোমার ছায়ার মত সঙ্গিনী, যে তোমার ভালমন্দের অবিসংবাদিনী অনুগামিনী, যে তোমার সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষিণী, তাহাকে কোন্ কর্ত্তব্যানুরোধে শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা বর্জ্জনের ন্যায় পরিত্যাগ কর্‌বে? যে তোমার একান্ত অনুগতা, শিষ্যা ও ভক্ত, তাহার প্রতি বিরক্ত হওয়া ত দূরের কথা, বরং তার প্রীতিসাধন না কর্‌লে তুমিই ভগবানের নিকট অপরাধী হবে," বলিয়া সরোজ প্রখর দৃষ্টিতে শরতের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণেককাল

সেই স্থানে নীরবতা বিরাজ করিল। কিছুক্ষণ পরে শরৎ শান্ত ভাবে বলিল্ :—

"সত্যই সরোজ, স্ত্রী এমনই ধন বটে! কিন্তু—"

সরোজ বলিল, "কিন্তু আবার কি?"

শরৎ আরও শান্তভাবে বলিল, "যদি স্ত্রীসঙ্গের বিরহ না হইত।"

সরোজ বলিল, "শরৎ, স্ত্রীসঙ্গে বিরহ কোথায়?"

শরৎ বলিল, "অন্তিমে, মৃত্যুর পরপারে।"

সরোজ বলিল,"সেখানেও স্ত্রী পুরুষের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ! সতীস্ত্রীর বিরহ নাই।"

শরৎ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সরোজকে কোমল কণ্ঠে বলিল, "বিরহ নাই! কেমন করে বল্লে?"

সরোজ দৃঢ় স্বরে বলিল, "শাস্ত্র যদি সত্য হয়, তাহলে ঋষি বাক্যও সত্য! আর ঋষিবাক্য যদি সত্য হয়, তাহলে একথাও অতি সত্য যে, সতী রমণীর বিরহ বা সঙ্গচ্যুতি নাই। তিনি ইহকালে যেমন স্বামীর কল্যাণময়ী পতিধ্যানময়ী মহাদেবী, পরকালেও সেই অশরীরী দেবী পতি শুভময়ী ও সুখদায়িনী হ'য়ে পতিপদ সেবা করেন। সতীর পতি অনুরাগ সৃষ্টির মূলশক্তি। সেই শক্তিই মুক্তি।"

শরৎ সরোজের সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাতরো-

বেগে কহিল, "ভাই সরোজ! ও সকল কথা ছেড়ে দাও, শাস্ত্রের বিধি সকলই। তাহাকে যেমন ভাবে ঘুরাইয়া নিবে, সে সেই ভাবেই জীবনের সান্ত্বনার আশ্রয় দিবে। তুমি বিশেষ ভাবে বুঝে দেখো, এ জগতে আছে কি? যিনি বিশ্বের পতি, একমাত্র তিনিই আছেন! স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিজন-তুমি-আমি কে ভাই? তাঁর চরণে আত্ম সমর্পণ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ শান্তি কেউ কি পেয়েছে? যে তাঁর চরণে আপনাকে ঢেলে ছায়, আশ্রয় লয়, তাকে তিনি কোলে তুলে ল'ন! আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! তুমি আমি কে ভাই! আর বিধিলিপি কেউ মুছ্‌তে পারে না, তা না হলে এ কি হচ্ছে!" শরতের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে উন্মাদের মত অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যুদ্গতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সরোজও আর্দ্রচক্ষে পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তখন সন্ধ্যা ভীতা অভিসারিকার মত ধীরে ধীরে অচ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণে ক্রমশঃ পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিতেছিল। তখনও আকাশে সমস্ত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠে নাই; সান্ধ্য সমীর পৃথিবীর শ্রান্তি অপনোদন করিতেছিল—সমগ্র বিশ্ব কর্ম্মের গুরুভার নামাইয়া স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। গৃহে গৃহে পুরনারীগণ সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়া

শঙ্খধ্বনি করিতেছিল, দেবালয়ে আরত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছিল, ভক্তিমান্ নরনারী ঈশ্বরোদ্দেশে প্রণাম করিতেছিল; ঝিঁ—ঝিঁ পোকা এক মাত্র সুর সাধিতে সুরু করিতেছিল, দুই একটী জোনাকী নৈশ আনন্দ-মিলনে ঝিকি মিকি করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতেছিল, নিশাচর প্রাণীগণ সোৎসাহে গভীর নিশীথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তর্ক উদ্বেগে অশক্ত শরৎ সরোজের তর্কের ভয়ে অরণ্যপথের একটু দূর ব্যবধানে চলিতেছিল। বন্ধুর দুঃখে দুঃখিত সরোজও নীরবে বনের গাছের সবুজ পাতার মুক্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিল। সে প্রকৃতির স্থানে স্থানে শ্যামল দুর্ব্বাদল পাতা রহিয়াছে যেন শ্রান্তক্লান্ত পথিকের জন্য। কিন্তু ভাববিভোর পথিক দুটী কেহই সে আতিথ্য স্বীকারে প্রস্তুত হইতেছিল না।

শরৎ একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া স্থির নয়নে যেখানে দূরের একটী ভগ্ন মন্দির ঘনপত্র শাখা ভেদ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছিল, তাহাই নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিল। সেই সময় সরোজও তথায় উপস্থিত হইলে শরৎ বলিয়া উঠিল, "আহা! কি সুন্দর প্রাণারাম স্থান! সরোজ, দেখ, দেখ!"

সরোজ বিস্ময়াবিষ্ট স্বরে বলিল, "কৈ—কোথায়?"

শরৎ সাগ্রহে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলিল, "দেখ্‌ছ না দূরে একটী মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে?"

"কৈ? ও ঐ না? হাঁ!"

"কেমন নির্জ্জন স্থান বল দেখি?"

"হ্যাঁ! 'জটা ভট্‌কা' একটী সুন্দর স্থান!"

"সাধনার যোগ্য স্থান" বলিয়া শরৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল।

সরোজ বলিল, "এখানে আর থাকা উচিত নয়, শুনেছি পার্ব্বত্যস্থান বড় বিপদ-সঙ্কুল! চল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ফিরে যাই!"

"যে দীননাথের চরণে সব সঁপে দিয়েছে, তার আবার ভয় কিসের সরোজ!"

"সত্য! কিন্তু এবার বাড়ীর দিকে যাওয়া যাক্, অনেক দিন হলো আর অনেক স্থানও দেখা হল।"

"না সরোজ, আমি আর বাড়ী যাবো না; আমি বেশ আছি।"

"ছিঃ! অমন কথা বল্‌তে আছে? তোমার আশাপথ চেয়ে একটী নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বসে আছে, আর তুমি—" বলিয়া সরোজ একটু বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে শরতের দিকে চাহিল। চাকিতে কিসের যেন অজ্ঞাত বেদনা তাহার হৃদয়ের গুপ্ত দ্বারে আঘাত করিল। অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া অতীত স্মৃতিজড়িত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল শরৎ "সরোজ!"

"কি?"

"কবে যেতে চাইছো ?"

"কালই !"

"কালই ?"

"হ্যাঁ !"

"কখন ?"

"ভোরে।"

সহসা কলহংসের কলধ্বনি তাহাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরবে উভয়েরই মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শেষে সরোজ বলিল, "বোধ হয় নিকটেই কোন নির্ঝর বা হ্রদ আছে"।

"তা হলে সম্ভবতঃ লোকেরও বাস আছে, যখন হাঁসের ডাক শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। তখন চল না সরোজ, একবার দেখে আসি।" কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া উভয়ে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহারা এক ভীষণ শালবন মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, নানাবিধ অচিন গাছে নানাপ্রকার ফুল ফল হইয়া রহিয়াছে; সুগন্ধী ফুলের সৌরভে বন আমোদিত হইতেছে। কোথাও বৃহৎ শিলাখণ্ড যেন মুখ-ব্যাদন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোথায়ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রজাপতি ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। মানুষের সাড়া শব্দ নাই, শুধু ভীষণ স্তব্ধতা। সমস্ত

অরণ্যানী মথিত করিয়া প্রবল বেগে বাতাস সোঁ—সোঁ শব্দে বহিতেছে! তাহাতে আরও ভীষণ ভীতির সৃষ্টি হইতেছিল। সহসা উভয়ই উভয়ের মুখোমুখী দাঁড়াইল। উভয়েরই শরীর রোমাঞ্চিত!

ক্ষুধিক্লিষ্ট শরৎ বলিল, "সরোজ, এখন উপায় কি?"

"তাই ত কি করা যায় বল দেখি, আর অধিক বেলাও নাই যে ফিরে যাই। অনেক দূরে এসে পড়েছি।"

"ফেরা ত হবেই না, যখন হাঁসের ডাক্ কাছে বলে বোধ হচ্ছে। তখন আমরা বোধ হয় সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছবো; তবে...... ।"

"তবে কি?"

কিছুক্ষণ পরে সরোজ উত্তর করিল, "সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাওয়া চাই-ই। এ স্থান বড় ভীষণ!" এই বলিয়া সরোজ চুপ করিল। শরৎ বলিল, "সে আর বল্‌তে!" উভয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আবার চলিতে লাগিল। পার্ব্বত্য বন্ধুর ও কঙ্করময় পথে তাহাদের পা ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কিছুক্ষণ পরে তাহারা জঙ্গল অতিক্রম করিয়া মুক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আশার আলোয় হৃদয় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সরোজ সেই পর্ব্বতের সমতল ভূমির

উপরস্থিত শ্যাওলা ধরা এক শিলাখণ্ডে বসিয়া পড়িল। শরৎও বসিল। সরোজ বলিল, "আর ভয় নেই।"

"কেন?"

"আমরা মনুষ্যাবাসের নিকট এসেছি। এই দেখ্‌ছো না এখানে লোকের যাতায়াতের চিহ্ন রয়েছে।" শরৎ উৎফুল্ল-নয়নে চারিদিক চাহিয়া বলিল, "ঐ হাঁস দেখ্‌তে পাচ্ছো!" সরোজ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ?"

"ঐ যে।"

"হুঁ! বেশ জল ত!" পরক্ষণই আবার ক্ষীণস্বরে বলিল, "শরৎ, বড় তেষ্টা পেয়েছে, উঃ!" বলিয়া দুই হাতে দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ্‌ছো ভাই, আমার পায়ের আঙুলে কাঁটা বিঁধে রক্ত পড়ছে!" শরৎ উদ্বিগ্ন নেত্রে পায়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, "ইস্! এতক্ষণ কিছু বল নাই কেন?" নিজের বস্ত্রাগ্র দিয়া রক্ত মুছাইতে মুছাইতে আকুল স্বরে আবার বলিল, "ভাই আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট! তোমার ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ দিতে পারবো না। আমি মহা..." সরোজ ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিল, "বড় তেষ্টা! ভাই! শিগ্‌গীর জল নিয়ে এসো, আমি যেতে পাচ্ছি না, বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।" শরৎ ক্ষিপ্রহস্তে ট্রাভেলিং ব্যাগ হইতে একটা গ্লাস বাহির করিয়া নিম্নাভি-

মুখী প্রস্তর-খোদিত সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া জলের অন্বেষণে ছুটিল। জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজালে পৃথিবীর যাবতীয় স্নেহরস শুষিয়া ক্লান্তভাবে দিনান্তে বিশ্রাম আশায় পশ্চিম গগন প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। শরৎ জলের নিকট আসিয়া দেখিল যে, একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। উহার সুনীল নির্ম্মল সলিলের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে, শ্বেত ও রক্ত কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। কয়েকটী হংস সানন্দে জলক্রীড়া করিতেছিল। শরৎ মুগ্ধ নয়নে জলোত্তোলনোদ্যত হইলে সহসা পশ্চাতে মনুষ্য পদশব্দ শুনিতে পাইল এবং ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিবামাত্র শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কে—এ গৈরিক-বসনা সুগঠিতা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা অনবদ্যাঙ্গী কিশোরী! তাহার প্রদীপ্ত গৌরকান্তি যেন গৈরিকবাস ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা পাইতেছিল। তাহার বিলাসভোগবাঞ্ছিত আলুলায়িত রুক্ষ কেশগুচ্ছ বায়ুভরে খেলিতেছিল। তাহার সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তপস্যা-কঠোরতার আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে; কিন্তু সে বড় সুন্দর! চারি চক্ষুর মিলন হইল, কিশোরী একটু হাসিয়া দৃষ্টি আনত করিল। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। কিশোরী একটু দূরে গিয়া হংসের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। সেই

হাসিরেখা—কমল মুখের সেই স্মিত হাসিরেখা, শরতের মুগ্ধ নয়নে লালসার কাজল পরাইয়া দিল। উত্তেজনায় শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুত বহিতে লাগিল। ঘন ঘন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মস্তক ঘুরিয়া গেল। হাত হইতে জলপাত্র স্খলিত হইয়া পড়িল। সে চকিতে বসিয়া পড়িল। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। আহা কি সুন্দর মূর্ত্তি! শত চক্ষে দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না! হঠাৎ কে যেন দৃঢ় স্বরে ডাকিল, "মাধবি!" কিশোরী চমকিয়া উঠিল, ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লজ্জায়, ক্ষোভে মস্তক নত করিল। ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। শরীর কাঁপিতে লাগিল। ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে অধোবদনে বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া প্রস্তর ঘর্ষণ করিতে লাগিল। আবার কে যেন বলিল, "এই কি এতকালের সংযমের ফল? এতদিনে জান্‌লাম, দুরন্ত মন্মথের কাছে সব মিথ্যা!" বলিয়া এক বৃদ্ধ তাপস সেই প্রস্তর-সোপানাভিমুখে গমন করিল। মাধবী কিছুক্ষণ পরে বিষণ্ণবদনে চিন্তাকুল হৃদয়ে কুটিরাভি-মুখে চলিল। ছি! ছি! কেন সে সেখানে আসিয়াছিল! পিতার আগমনের পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল না কেন? কেন সহসা এমন হইল, সে এ পর্য্যন্ত একমাত্র ভগবান ভিন্ন অন্য কাহাকেও ত ভালবাসে নাই, সহসা তাহার এ কি পরিবর্ত্তন?

সে ত কখনও ভাবে নাই যে, তাহার জীবন এই ভাবে চির অপরিচিত পথভ্রষ্ট হইবে! মথুরাপুরবাসিনী মধুরা শ্রীমতী রাধার অদৃষ্টে কি ইহাই ঘটিয়াছিল?

"কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো।
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥"

কিশোরী নিজের প্রাণে ধিক্কার দিয়া মনে মনে শ্রীভগবানোদ্দেশে কহিল, "হা দয়াময়! এ কি করিলে? কখন ত আমার চিত্ত এমন উদ্বেলিত হয় নাই! এ কি মধুময় বেদনা! মরি মরি এ দাববহ্নিতেও কি পদ্ম ফুটে!" মাধবী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। একটী সংসারানভিজ্ঞা অফুটন্ত ক্ষুদ্র কুসুম-কলিকার হৃদয়ে এই সর্ব্বপ্রথমে সংসারের ভোগবিলাসের কীট প্রবেশ করিল। কি এক অজ্ঞাত মধুর বেদনা থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত করিতেছিল। সে বেদনার অর্থ সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এ দিকে শরৎ উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় এক দৃষ্টে চাহিয়া সেই মুখখানির কথাই ভাবিতেছিল। সরোজের তৃষ্ণার জল লইয়া যাইবার কথা আদৌ মনে ছিল না।

তখন সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। আরক্তিম পশ্চিমগগনে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল! উদ্‌ভ্রান্ত শরৎ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। বোধ হইল, যেন তাহার হৃদয়-

বীণার সমুদয় তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সে যেন তাহার হৃদয়ের যাবতীয় বল কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে! তখন সরোজের কথা মনে হইল, অমনি দুর্ব্বল শরৎ বিষণ্ণবদনে সরোজের উদ্দেশে শূন্য হস্তে চলিল। পথে যাইতে যাইতে আবার শরৎ ভাবিল, আজ তাহার জীবন ধন্য! আহা! কি সুন্দর! ইন্দুলেখা সুন্দরী, না এই যুবতী সুন্দরী? না—না ইহার নিকট ইন্দু কিছুই নহে।' আহা কিশোরীর কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর প্রেম-প্রবণ চাহনি, যেন প্রেমের মূর্ত্তিমতী দেবী! আর ইন্দু! কূপের মণ্ডুক, সে ভালবাসা কি,—তা কখনও জানে না। তাহার কেবল সেই একই ধারা। কিছুই নূতনত্ব নাই। এ নবীনার সবই নূতন! সে তাহার প্রাণ চাহিয়াছে, তবে কেন সে তাহার প্রাণ লইবে না? নিশ্চয়ই লইবে। এই ত সংসারের সুখ-শান্তি! এ সুখ ছাড়িয়া তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? সে আর কখনও দেশে ফিরিয়া যাইবে না, সে এই সংসারের অবিশ্রান্ত জন-কোলাহলের বাহিরে—প্রকৃতির নিরালা নির্জ্জন কুঞ্জে তাহার সহিত প্রেমের গাঢ়তম আলিঙ্গনে অভেদাত্মা হইয়া থাকিবে। সংসারের অবিরাম জন-কোলাহল ও আনাগোণা তাহাদের প্রেমের গাঢ় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে না। ভাবিতে ভাবিতে শরৎ আবার আত্মহারা হইল! হায়! আশা

যে অকূল বৈতরণী! আবার ভাবিল, দোষ কি? শুধু একবার চোখের দেখা বই ত নয়! ওহো! এ দেখিতে কে চাহিয়াছিল, হায় রে!—

"স্বজনী ভাল করে পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"

শরতের হৃদয়-নদী উদ্বেলিত হইয়া উঠিল. নয়নে অশ্রু ভরিয়া আসিল। সে নীরবে চক্ষু মুছিয়া সরোজের নিকট উপস্থিত হইল। প্রণয় এইরূপই হইয়া থাকে; দেখিয়া শুনিয়া দোষগুণ বিচার করিয়া কখনও প্রণয় হয় না। সে শুধু শুভমুহূর্ত্তের প্রয়াসী। সে শুভমুহূর্ত্তে যে প্রণয় সংঘটিত হয়, সে প্রণয় অতি মধুর!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্থান কনখল, রামকৃষ্ণমিশনে শরৎ ও সরোজ পূর্ব্বে আশ্রয় লইয়াছিল। পরিব্রাজক পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সে আশ্রমের অভিভাবক। ব্রহ্মচারী মহাশয় বৃদ্ধ সদানন্দময় মহাপুরুষ। সকলদিকেই সমদৃষ্টি! সকলের প্রতিই করুণ ব্যবহার। গত কল্য শরৎ ও সরোজ দুইজনেই পূর্ব্বকথিত কিশোরীর পিতৃ-আশ্রমে পরম তৃপ্তিতে রাত্রি যাপন করিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে তাহারা কিশোরীর পিতা বৃদ্ধ তাপসের পদধূলি ও বিদায় লইয়া পুনরায় সেই মিশন-আশ্রমে যাত্রা করিল। সরোজকে অগ্রে রাখিয়া শরৎ পশ্চাতে যাইতে লাগিল, যাইবার সময় কুটিরের আড়ালে একখানি বিষাদিত কমনীয় মুখ সরোজের অলক্ষ্যে শরৎ দেখিতে পাইল। শরৎ বোধ হয়, সেই মুখখানি দেখিবার ইচ্ছাতেই সরোজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে শরৎ পশ্চাতে মুখ ফিরিয়া সেই বাঞ্ছিত মুখখানি দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিল। অবশেষে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। আশ্রম পরিদর্শক ও রক্ষক

ব্রহ্মচারী মহাশয় পরিচিত অতিথিকে আশ্রমাগত দেখিয়া অতি সন্তোষসহকারে বলিলেন, "গত রাত্রে আপনারা ছিলেন কোথায়? আপনাদের জন্য আমার সমস্ত রাত্রি একটা বিকৃতাঙ্গ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিষম যুদ্ধ করতে হয়েছিল।" সরোজ বৃদ্ধের বাক্‌চাতুর্য্যে বৃদ্ধকে মনে মনে সভক্তিপ্রণাম করিয়া বলিল, "ভগবৎ ইচ্ছায় একটি উদার-আশ্রম পেয়েছিলুম, সেখানে অপনারই মত সরল কৃপালু এক তাপস অযাচিত স্নেহবন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন, কিছুতেই রাত্রে আস্‌তে দিলেন না।" সেবাব্রতী ব্রহ্মচারী সহাস্য মুখে তাহাদের আদর-আপ্যায়ন এবং সমাগত অতিথির আতিথ্য সৎকারোদ্‌যোগে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সরোজ একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার এক স্থানে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল :—

সরোজ! তোমার গর্ভধারিণীর ভয়ানক অসুখ। ইতি-পূর্ব্বে সে সংবাদ পত্রে তোমার দেওয়া ঠিকানায় দিয়াছি। যদি দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তা হইলে যেখানেই থাক না কন, অতি সত্বর আসিবে। ইতি

আঃ—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন

পোঃ মধুখালী, গ্রাম মধুপুর, জেলা ফরিদপুর।

সরোজের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! সে সেই লেখাটুকু শরতকে দেখাইয়া আকুল স্বরে বলিল, "ভাই, আমি আজই বাড়ী রওনা হবো, যদি তোমার আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে থাকে, তা হলে চল, উভয়ে যাই।" সংসার-বীতানুরাগী শরৎ সংসারে যাইতে আপত্তি করিল। সরোজ তাহাকে বারম্বার অনুরোধ করিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না! আহারান্তে সরোজ স্বদেশ যাত্রা করিল। অপরাহ্লে শরৎ পুনরায় সেই হ্রদের নিকট আসিয়া দেখিল যে, সেই পদ্মাক্ষি কিশোরী কাহার প্রতীক্ষায় যেন পদ্মবনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আবার চারি পদ্মচক্ষুর মিলন হইল, আবার সেই পদ্মমুখ নির্ম্মল শ্বেতপদ্মের মত ঈষৎ হাস্যমাখা! আমরি! কিশোরীর নাম মাধবী। দুই তিন দিন যথা সময়ে অপরাহ্লে মাধবী ও শরৎ উভয়ে সেই হ্রদের নিকট আসিয়া মিলিত হইল! বাক্যালাপ হইত না, আকাঙ্ক্ষিত আশার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের পিপাসা চরিতার্থ করিত। ইহাই কবি-বর্ণিত পূর্ব্বরাগ। ইহাই বুঝি আনন্দের অদৃশ্য ফুলশর! শেষে একদিন শরৎ মাধবীর নিকট আসিয়া তাহার মৃণালোপম কর ধারণ করিল এবং প্রেমপূর্ণ স্বরে বলিল, "মাধবি! মাধবি! আমার হৃদয়-রত্নবেদীর পূজার প্রতিমা প্রাণের মাধবি!" আকুলা মাধবী ব্যাকুল প্রাণে অমনি শরতের বক্ষে

মস্তক রাখিয়া ঢলিয়া পড়িল! ইহারই নাম চাঁদে চাঁদে মিলন! উভয়ের সম্মিলনে নীরবে একটা বৈদ্যুতিক শক্তি উভয়ের বক্ষে স্বর্গীয় অমিয় ঢালিয়া দিয়া কোথায় মিশাইয়া গেল! তখন কিশোরী মাধবী সেতারের ন্যায় মধুর স্বরে বলিল, "বল্‌তে পার, আজ ক' দিন আমার এমন হচ্ছে কেন? কই কখনও ত কোন পুরুষকে দেখে এমন হয় নাই—কে তুমি?"

শরৎ তাহার চুলে আঙুল ঘুরাইতে ঘুরাইতে কণ্ঠে স্নেহ আদর ঢালিয়া বলিল, "আমারও ত কখনও এমন হয়নি মাধবি! আমি অনেক নারীকে দেখেছি, কই, কখনও ত এমন হয়নি। আজ দুজনের কেন এমন হইল!" অনেকক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। মধুময়ী সন্ধ্যা সঙ্গিনী রজনীকে সাগ্রহে আহ্বান করিতেছে, এমন সময় মাধবী বলিল, "চল আশ্রমে, মায়ের বড্ড অসুখ হয়েছে দেখ্‌বে চল। আমি আগে যাই, তুমি কিছুক্ষণ পরে এসো।" শরতের সাধের মাধবী চলিয়া গেল। ব্যাকুল যুবক শরৎ মাধবীরই ধ্যান করিতে করিতে তাহারই পুনর্মিলনে মাধবীরই আশ্রমাভিমুখী হইল। শরৎ আসিয়া প্রথমে সেই বৃদ্ধ তাপস ও বৃদ্ধা তাপসীকে প্রণাম করিতেই সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমায় স্পর্শ করো না, আমার বড় ভেদবমি হয়েছে। ভাল আছ ত বাবা, কে আর একটী ছেলে?"

"মা তিনি বাড়ী গেছেন," বলিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিতেই শরৎ বলিল, "পা যে একেবারে হিম, এমন কখন হল মা ?" সন্ন্যাসিনী একটু দম লইয়া বলিলেন, "গতরাত্রে। দাঁড়িয়ে রৈলে কেন, বসো বাবা! আমার বিছানার পাশেই বসো।" মাধবী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে তাপসী বলিলেন, "মা একটু জল দাও।" মাধবী তাড়াতাড়ি জল দিল। পরে তাপসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাবা ?"

"শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরী।"

একে একে তাপসী সব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন! শরৎ বিনীতভাবে ধীর স্বরে সব বলিল। তাপসী বলিলেন, "মাধবি, বাবাকে কিছু ফল খেতে দে, আহা মুখ শুকিয়ে গেছে।" শরৎ নতমুখে উত্তর করিল, "না মা, আমার এখন ক্ষিদে নেই।" মাধবী শুনিল না, সে তাহাকে কুটির-প্রাঙ্গণে লইয়া গেল। শরৎ ভাবিল, এই তাহার মাহেন্দ্র সুযোগ। সে রোগিনীর সেবা ও শুশ্রূষার অছিলায় সে স্থানে রহিয়া গেল। সে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাই হইল। সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। রাত্রি হইলে ক্রমে তাপসীর অসুখ বাড়িতে লাগিল। তাপস, মাধবী ও শরৎ তিন জনে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিল, কিন্তু প্রভাতে তাহাদের সব আশা ফুরাইবার উপক্রম হইল। তাপসী হাত

বাড়াইয়া মাধবীর হাত লইয়া শরতের হাতের মধ্যে রাখিয়া অস্ফুট ক্ষীণ স্বরে থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা শরৎ, আমার মাধবীকে তোমায় দিয়ে গেলাম, তুমি—" একটু দম লইয়া বলিলেন, 'দেখো—আহা উঃ!" চক্ষু শিবনেত্র হইয়া নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। মাধবীর কোলে মাথা রাখিয়া তরুণ অরুণোদয়ে বৃদ্ধা গভীর বেদনাব্যঞ্জক শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি কাঁদ্‌ছ?"

পশ্চাৎ হইতে কে যেন মমতাভরা কণ্ঠে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ইন্দুর চিবুক স্পর্শ করিল। সে দেখিল, বর্ষবারিস্নাত স্থল-কমলিনীর মত সুন্দর মুখখানি অশ্রু-ধারায় ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন ঝরণার বুকে তারার ঝিকি মিকি! বর্ষার নিশা ঘন মেঘে ঢাকা। আকাশে একটী নক্ষত্রও যাইতেছে না। মেঘমেদুর অম্বরে মাঝে মাঝে বিজলী চমকিতেছিল; কামানের আওয়াজের মত গুরু গম্ভীরে নাদে মেঘধ্বনি হইতেছিল। তাহাতে যেন মেদিনী কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নিবিড় কৃষ্ণমেঘপুঞ্জ যেন সৃষ্টি কার্য্যের শেষ অঙ্কের যবনিকা পতনোদ্‌যোগে প্রস্তুত। ঝম্ ঝম্ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় অবিরল বারি বর্ষণ হইতেছিল। মাঝে মাঝে থাকিয়া থাকিয়া শন্ শন্ শব্দে বাতাসও প্রবল বেগে বহিতে-ছিল। ভীষণ কালরাত্রি! যেন সৌরজগতে একটা প্রলয় যুদ্ধের ব্যাপার চলিতেছিল। যেন শ্মশানের ভূতসঙ্গে রুদ্রের

তাণ্ডব নৃত্য হইতেছিল। ইন্দু জানালার ধারে একাকিনী বসিয়া প্রকৃতির এই উদ্দাম প্রকৃতি দেখিতেছিল। আগন্তুকা ইন্দুর প্রতিবাসিনী, নাম জয়ন্তী। উভয়ের পিতার বাড়ী পরস্পর সংলগ্ন। জয়ন্তী আবার বলিল, "কেঁদো না বোন্, কি কর্‌বে ?" ইন্দু চিবুক হইতে তাহার হাত সরাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "না না, কাঁদ্‌ছি কই জয়াদি" বলিয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিল।

"দিনরাত্তির একই ভাবনা ভাব্‌লে যে অসুখ হবে বোন্! এসো, উঠে এসো লক্ষীটি, আমরা রামায়ণের শেষ কাণ্ডটা আজ শেষ করি।"

ইন্দু চোখে হাত দিয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল, "জয়াদি!" একটু থামিয়া আবার ডাকিল, "জয়াদি! শুনেছো আমার কপাল ভেঙ্গেছে," বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ন্তীরও চক্ষু ভিজিয়া উঠিল, সে নিজের আঁচল দিয়া ইন্দুর চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "হ্যাঁ! সব শুনেছি, কি কর্‌বে দিদি, সবই ভাগ্য!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। অনেকক্ষণ পরে ইন্দু বলিল, "দিদি, আমি কি এতই মহাপাপিনী যে, তাঁর দর্শন হতেও বঞ্চিত হলাম। তিনি ব্রহ্মচারিণী বিয়ে করে এনেছেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, তিনি যাতে সুখে থাকেন তাই করুন, তাঁর সুখেই আমার সুখ, কিন্তু আজ

পনেরো দিন হলো, তিনি আমাকে নিয়ে যাবার কথা দূরে থাক্, একবার এ হতভাগিনীকে মনেও কর্‌লেন না।"

"তাই ত বড়ই দুঃখের কথা, তুমি ভেবো না বোন্, নিশ্চয়ই একদিন না একদিন মনে করবেনই। কাল প্রতীক্ষা কর।"

"আর কত কাল দিদি?"

"তা কে জানে বোন্!"

"উঃ! আমি কোন্ আশায় কার আশ্রয়ে থাক্‌বো, আমার চারিদিকে বিপদ! আমি কোথা যাই? যার আশ্রয়ে আছি, সেই দাদা—তাঁর চরিত্র ত জানো? আমি এখানে আসা অবধি তাঁর বন্ধুবান্ধব যে রকম এ বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া আসা কচ্ছে, অশ্লীল গান বাজনা কচ্ছে, আর সময় সুবিধে পেলেই আমার প্রতি যেমন ভাবে তাকায়, তাতে এখানে থাকা আমি মোটেই নিরাপদ মনে করি না।"

ইন্দুর দাদার নাম শ্রীগোবিন্দ লাল রায়। বাল্যকালে তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় সেই একমাত্র বংশের দুলাল বলিয়া মাতার প্রশ্রয়ে শ্রীগোবিন্দ গ্রামের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া বিবাহ করে। বিবাহের কিছুদিন পরে মাতা স্বর্গারোহণ করেন। সে আজ সাত বৎসরের কথা। পিতার সঞ্চিত কিছু অর্থ ছিল। সে তাহা লইয়া

নির্জ্জ বাটীতে একটী সখের যাত্রার দল করে। কয়েক জন সুচতুর ইয়ার ছোক্‌রা তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠে। তাহাদেরই প্রযত্নে সে মদ, গাঁজা ইত্যাদি খাইতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে প্রতিদিনই তাহাদের আখড়া বসিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে গোবিন্দলালের স্ত্রীর রণচণ্ডীমূর্ত্তিতে, সম্মার্জ্জনী হস্তে সেই রিহর্সেল্ ঘরে আবির্ভাব হওয়ায় এখন সপ্তাহে মাত্র রবিবারের রিহর্সেল বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইন্দু এখানে আসা অবধি এখন আবার প্রতিদিন আক্‌ড়া বসিতেছে। বলা বাহুল্য, গোবিন্দলালের স্ত্রী ইহাতে কোন আপত্তি করিত না। কারণ সে বড় ঝগ্‌ড়াটে মানুষ। ইন্দুর সহিত তাহার বনিবনা হইত না। তাহারই প্রশ্রয়ে ইয়ার ছোকরার দল আপনার ইচ্ছানুযায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে সুযোগ পাইল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া জয়ন্তী মুখ তুলিয়া বলিল, "বড়ই সমস্যার কথা! ছ্যাখ এক কাজ করা যাক্—"বলিয়া জয়ন্তী মুখে হাত দিয়া চুপ করিল। ইন্দু আবার বলিতে লাগিল, "একমাত্র বৌদি, তা তাঁর যেরূপ ব্যবহার, তাতো জানো! আমি কোথা যাই,কে আমায় রক্ষা করে,আমার মত হতভাগিনী এ সংসারে কেউ নাই। দিদি আমায় রক্ষা কর, আমায় বনবাসে দিয়ে এসো!" বলিতে বলিতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে

তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। জয়ন্তী হাতখানি বুকের মধ্যে লইয়া বলিল, "ছাখো এক কাজ করা যাক্, আমরা দুজনে আজই অতি প্রত্যুষে তাঁর কাছে যাই চল ; আমি ছদ্মবেশে যাবো, তুমি দীন দুঃখিনী বেশে যাবে, কেমন পারবে ত ?" ইন্দু মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "জয়াদি, তোমার ঋণ আমি জন্ম-জন্মান্তরেও শোধ দিতে পারবো না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেই মৃতা তপস্বিনীর অন্তিম আদেশে শরৎ ব্রহ্মচারিণী মাধবীকে বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। আজ কয়েক মাস হইল, মুরলীধর একটী এক মাসের পুত্র রাখিয়া সেই পূর্ব্ববর্ণিত হৃদ্‌রোগেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। এক শিশু বৈমাত্রেয় ভাই থাকিলেও একমাত্র শরৎই এখন মুরলীধরের সকল সম্পত্তির অধিকারী। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনোরমার মাতা এখন বিতাড়িত,বিমাতা মনোরমা নির্য্যাতিত,নিষ্পেষিত। শরতের ভোগলালসা বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে মাধবীকে পাইয়া সকল প্রকার কাজকর্ম্ম মাধবী-চরণে সমর্পণ করিয়াছে। সে সকলকে ভুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সরোজ আসিলে তাহাকে সংক্ষেপে মাত্র দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় দিয়া অন্দরেই থাকে। আহারে, বিহারে, শয়নে, জাগরণে সকল সময়েই চাই মাধবী! মাধবী নিকটে না থাকিলে তাহার আদৌ শান্তি হয় না। শরৎ এখন রূপোন্মাদ—রূপসাগরে হাবুডুবু খাইতেছে। আজও অপরাহ্ণে সে মাধবীকে বহুমূল্য সাজে সাজাইয়া পুষ্করিণীর সেই ঘাটে আপনার সম্মুখে বসাইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় পুঞ্জীভূত করিয়া মনপ্রাণে দেখিতে-

ছিল। কত প্রণয়-নৈবেদ্য, কত বিরহের বাণী, কত উপন্যাস-নাটকের নায়ক-নায়িকার গুপ্ত প্রেমের কাহিনী, আরও কত কি কথা আকারে, ইঙ্গিতে, ভাষায়, ভাবে জানাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে মাধবী সেই ভুবনচাঞ্চল্যকারিণী স্মিত হাস্যের রেখায় আকুঞ্চিতগণ্ডে ভ্রূকুটিভঙ্গে কত প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেছিল। ব্রহ্মচারিণী মাধবীরও ভোগলালসা অতি প্রবলা। তাহার ভরা ভাদ্রের যৌবন-নদীর প্রথম উচ্ছ্বাস। তাই সে কূল ভাসাইয়া তাহারই অন্তহীন কোলে বাসনা-চরিতার্থে ছুটিতেছিল। তাহার যৌবনের আগুণ জ্বলিয়াছে! সে আগুণে পতঙ্গ শরৎ আত্মাহুতি দিতে কাতর নয়, তাই সে প্রবল বেগে তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিল। রঙ্গিনীরও রঙ্গ দেখিবার! এমন সময় নূতন ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, "কে একজন সন্ন্যাসিনী আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে।" শরৎ বলিল, "আমার এখন সময় নেই, সন্ধ্যার পর আমার খাস্ কামরায় দেখা কর্‌তে বলো।" সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পর সন্ন্যাসিনী আসিয়া শরতের সহিত দেখা করিয়া বলিল, "বাবা, আমি একটা বিপদে প'ড়ে তোমার শরণাগত হয়েছি—আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কেন এত জ্বালা...... !"

"তোমার কি বক্তব্য, তাই বলো, আমার সময় নেই অত শুন্‌বার।" "বাবা, যদি তুমি একটা নিরাশ্রয়া দুঃখিনীকে

আশ্রয় দাও, তা হ'লে আমি বড়ই উপকৃত হই, সে তোমার অনেক দাসীর মধ্যে একজন হবে।"

"সে কি ? কে আছে তার ?"

"কে আছে," বলিয়া সন্ন্যাসিনী একটু ভাবিয়া উত্তর করিল, "তার সকলই আছে, আবার কেহই নাই, বড় দুঃখী —বড় ব্যথিতা সে।"

"সে কি রকম ?"

"বাবা, আমার সময় নেই, অনেক দূর যেতে হবে। যদি আদেশ পাই, তবে নিয়ে আসি। তার মুখে সব শুন্‌তে পাবে।"

শরৎ কৌতূহলী হইয়া আদেশ দিলে সন্ন্যাসিনী চলিয়া গেল।

প্রায় সিকি মাইল আসিয়া সন্ন্যাসিনী বৃক্ষলতাঘেরা একখানি জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করিল। কুটিরখানি জনৈক ভিখারিণীর। গ্রামে আসিয়া জয়ন্তী কুটিরের অধিবাসিনীকে কিছু অর্থ দিয়া ইন্দুকে এই স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়া শরতের নিকট গিয়াছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া জয়ন্তী ডাকিল, "ইন্দুলেখা ?"

"কি দিদি ?"

"চল, সময় হয়েছে। মুখ একেবারে ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখ্‌বে। কেউ যেন দেখ্‌তে না পায়। সেইখানে, তার

কাছে গিয়ে খুলো।" উভয়ে বাহির হইল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে যাইতে লাগিল। মিলনের আনন্দে ও প্রত্যাখ্যানের ভয়ে ইন্দুর বুক গুরু গুরু করিয়া কাঁপিতেছিল।

ইন্দু ডাকিল "দিদি ?"

"কি ?"

"তিনি কি বল্লেন ?"

"কিছু নয়, পরে বল্‌বো।"

উভয়ে আবার নীরবে চলিতে লাগিল ; প্রায় বাড়ীর নিকটে আসিয়া জয়ন্তী বলিল, "আমি বাড়ীতে ঢুক্‌বো না, তুমি একেবারে খাস্‌-কামরায় গিয়ে উপস্থিত হয়ো।"

"তা আমায় যেতে দেবে কেন ?"

"সন্ন্যাসিনীর নাম করো।"

"তুমি যাবে না ?"

"না।"

"কেন ?"

"তোমায় দেখে যখন চিন্‌বে, তখন আমারই সব কৌশল ব'লে হয়ত ক্রোধে আমায় অপমান কর্‌তে পারে।"

"তবে তুমি যেও না, এখন কোথা যাবে ?"

"সেই ভিখারিণী-কুটিরে।"

"তারপর ?"

"বাড়ী।"

"আবার কবে দেখা হবে?"

"ভগবান জানেন।"

ইন্দু জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া আর্দ্র চক্ষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, জয়ন্তী বক্ষভেদী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

ইন্দু মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া, বাষ্পগদগদ কণ্ঠে "আমায় ফেলে দিও না, দাসী বলে চরণে স্থান দাও, পায়ে ধরি" বলিয়া জানু পাতিয়া দুই হাতে শরতের দুই পা জড়াইয়া ধরিল।

শরৎ বিস্ময়াবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "কে তুমি? অাঁ—ইন্দু? এখানে কেন, কে তোমায় আন্‌লে? সেই সন্ন্যাসিনী কোথায়?" ইন্দু চোখের জলে পদ ধৌত করিতে লাগিল। শরৎ পুনরায় বজ্র কঠিন স্বরে বলিল, "পা ছাড় বল্‌ছি।"

ইন্দু অধিকতর মিনতি স্বরে বলিল, "তা আমি ছাড়্‌বো না।"

"ছাড়বে না?—এই ছাখো" বলিয়া শরৎ ধাক্কা দিয়া পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

মাধবী ইন্দুর হাত ধরিয়া "আসুন দিদি" বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক আপন গৃহে লইয়া গেল।

সে রাত্রি শরৎ মাধবীর গৃহে গমন করিল না। পরদিন প্রাতে শরতের সঙ্গে দেখা হইতেই মাধবী বলিল, "ত্যাখো তোমার ব্যবহারে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি!"

"কেন আমি কি করেছি মাধবি?"

"তুমি কোন্ অপরাধে ধর্ম্মপত্নী ত্যাগ কর্‌তে বসেছো?"

"কে বলে ধর্ম্মপত্নী—সে পেত্নী।"

"ছিঃ! ও কি কথা! তুমি জানো, ধর্ম্মপত্নী ত্যাগে মহা অকল্যাণ!"

শরৎ উচ্চ স্বরে বলিল, "আমি অকল্যাণই চাই, সে কেন আসে এখানে, তাকে শিগ্‌গীর চলে যেতে বলো" বলিয়া শরৎ ঝিকে ডাকিল, ঝি আসিলে তাহাকে ইন্দুকে জাগাইতে বলিল। মাধবী শরতের হাত ধরিয়া বলিল, "ত্যাখো স্থির হও, আমার অনুরোধ, তাঁকে আর কিছু বলো না।" অশ্রুমুখী অবগুণ্ঠনবতী ইন্দু তখন দরজার কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শরৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "তোমার আর কি বক্তব্য আছে বল?" ইন্দু কথা কহিল না, শরৎ আবার বলিল, "তোমার এখানে স্থান হবে না, তোমার আজ হতে ২০৲ টাকা মাসহারা দেওয়া গেল, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও।" বজ্র যেন ইন্দুর মস্তকে পতিত হইল। বজ্রাহত ইন্দু তবু

স্থির, তবু মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি কোথায় যাবো? তুমি মহৎ, তুমি সকলকেই আত্মদান করিতে পার, কিন্তু আমি যে ক্ষুদ্রা, আমি যে তা পারি না। আমার উপায় কি বল?"

"তা—আমি জানিনে——কেন বাপের বাড়ী?"

"সেখানে আমার স্থান নাই।"

"ও সব—আমি কিছু শুনতে চাই না," বলিয়া শরৎ সচকিতে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

দলিতা কমলিনীকে মাধবী সযত্নে বক্ষে লইয়া বলিল, "দিদি তুমি ভেবো না, ওঁর এখন চিত্তের স্থিরতা নেই, তুমি কিছুদিন এখানে কষ্ট ক'রে থাকো, না হয় কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী গিয়ে থাক, আবার এসো!" মাধবীর কথায় ইন্দুর চোখে জল আসিল, সে আঁচল দিয়া অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিল, "ভাই! আমার স্থান কোথায়? সংসার আমায় বর্জ্জন করেছে, আমার ভোগবাসনায় অবসান হয়েছে।"

"তুমি অমন কথা বলো না দিদি, তোমার দুঃখ কি?"

"সত্যি আমার আর দুঃখ্যু নেই, আমি যাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তার সুখে আমি দুঃখিত হলে কলঙ্কিনীই হ'তে হয়।" আর কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সহসা তা[illegible]

না বলিয়া এই বলিল, "বোন্, ভগবান্ করুন, তোমরা সুখে থাকো ; তবে আমার একটী অনুরোধ," বলিয়া সে মাধবীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কখনও তাঁর অবাধ্য হয়ো না, তিনি যাতে সুখী হন্, শান্তি পান্, প্রাণপণে করো" বলিতে বলিতে ইন্দু তাহার বক্ষের গুপ্ত কনককণ্ঠহার মাধবীর গলায় পরাইয়া দিল। আমরি মরি স্বর্গীয় নিঃস্বার্থ প্রেম কি মধুর! কি অমৃত উৎসে তার লীলা! সে বুঝিয়াছে, ভালবাসায় সুখ নাই, ভালবাসিয়া সুখ। ভোগে সুখ নাই, ত্যাগে সুখ।

মাধবী করুণ মধুরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দিদি—দিদি তুমি কর কি, তুমি না সতীন?"

"তুমি যে ভালবাসার ভালবাসা! সতীন হলেও তুমি যে ঠাকুরের শিরোমণি!"

মাধবীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে হার খুলিয়া ইন্দুকে দিতে উদ্যত হইতেছিল, সহসা ইন্দু তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ভাই আমার অনুরোধ, তুমি খুলো না, বেশ মানিয়েছে লক্ষ্মিটী! এটী আমার ভালবাসার উপহার! আমার আর কি আছে যে, তোমায় দিব, আমি বড়......" ইন্দুর স্বর গভীর দুঃখভারে রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরক্ষণেই দেখা গেল, সেই নিঝুম নিশীথে চৌধুরীদের খিড়কী দরজা খুলিয়া একটী ব্যথাকাতরা রমণী জমাট অন্ধকার চিরিয়া

বাহির হইয়া পড়িল। আর একটী সংসারানভিজ্ঞা সরলা কিশোরী তাহার সেই দৃশ্যে দর্শনচর্চ্চায় মনোযোগিনী হইল। সহসা বাগানের ঝাউ গাছের ডালে একটী কাক কঠোর "কা কা" স্বরে ডাকিয়া উঠিল! কিশোরী শিহরিয়া উঠিয়া দর্শনে অনুপ্রাণিত হইলেও আর দর্শনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"আর কেন! এইত সংসার! মলেই ত সব ফুরিয়ে যাবে," আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু নির্জ্জন পথে চলিতেছিল। কিছু দূর আসিয়া ইন্দু আবার মনে করিল, "এই অসীম বেদনাময় জন-কোলাহলে আমি একাই কি সুখ-বীণার ছিন্ন তার? অপরের বীণা কি সপ্তস্বরে নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইতেছে? আমিই কি কেবল তাহাতে বঞ্চিত? আমি আজীবন দুঃখিনী! দুঃখে আমার জন্ম! দুঃখে আমার বৃদ্ধি! আবার দুঃখে আমার ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে দুঃখ কি? তখন কে আমায় তাহাতে সান্ত্বনা দান করিবে? আমি কাহার আশা করিব? কর্ম্মময় জগতে আমার কর্ম্মের ভাগী কে হইবে? উপরে অনন্ত নীল আকাশ, তাহাতে কত নক্ষত্র একত্র হইয়া একটী বিরাট্ নাক্ষত্রিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে, বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এক একটী মানুষ লইয়া বৃহৎ মানবজাতি গঠিত হইয়াছে। তখন সুখদুঃখময় বিশ্বে আমার মত ক্ষুদ্র

দুঃখিনীরও ত প্রয়োজন! যদি সকলে সুখের প্রার্থী হয় এবং তাহাদের বাসনা সফল হয়, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ বলিয়া কোন কথা স্থান পাইবে কেন? বেশ ত আমি তাহাতে মিশিয়া যাই না কেন? তা হ'লেই বা দুঃখ কি? ইহা কি একটা মনের বিকার?" সম্মুখে বিশাল ক্ষেত্র। ক্ষেত্রে ধান্য কাটা, কোন স্থানে বা আঁটি আঁটি করিয়া বাঁধা! কোন স্থানে বা বোঝা বাঁধা, কৃষকগণ গলদঘর্ম্ম শরীরে তাহাই বহিতেছে, তাহাদের মুখ সহাস্য! কোন বিষাদ বা দুঃখের লেখা দেখা যাইতেছিল না। সুন্দর স্বাস্থ্য! ভোগ-বিলাসের কোন চিহ্ন নাই। দেখিতে দেখিতে ইন্দুর মনের শক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল! ভাবিল, এই যে ইহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে, কে বলিবে ইহাদিগকে দুঃখী? অদূর প্রান্তরে একটী বটবৃক্ষের ছায়া যেন ক্লান্ত ইন্দুকে আহ্বান করিতেছিল, তাই ইন্দু তদভিমুখিনী হইয়া সেই তরু-তলে যাইয়া উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ইন্দু যেমন উঠিতেছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে একটী মহিলা সমবেদনার সুরে বলিল, "কোথা যাবে গো বাছা?"

"যমদ্বারে"।

আগন্তুক ব্যক্তি একটু হাসিল ও বলিল, "ষাট্! তোমার এমন কচি বয়েস, কি দুঃখ বাছা?"

"দুঃখ কি ছোট বড় বিচার করে ?"

"চল আমিও যাবো, আমারও একটা দুঃখ আছে।"

"তুমি কোথা যাবে মা ?"

"যমদ্বারেরই কাছে—মুশৌরী "

"সেখানে কে আছে তোমার ?"

"সন্ন্যাসিনীর ভগবান্ ভিন্ন আর কে আছে বাছা !"

"আমায় সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত কর.না কেন ?"

"পারবে ?"

"পারবো ?"

"বড় কষ্ট।"

"এমন কি কষ্ট ? কষ্ট হইলে কষ্টের সংসার ছাড়িয়া লোকে সে কষ্টে আত্ম সমর্পণ করতে ছুটে কেন !"

"সুখের আশায়।"

"সুখ কি এখানে নাই ?"

"সুখ সর্ব্বস্থানেই আছে।"

"সর্ব্বস্থানেই আছে ব'ল্চ কেমন ক'রে ?"

"ভোগ ক'রে, বুঝে।"

"সংসারেও সুখ আছে ?"

"আছে বৈকি।"

"পাই না কেন ?"

"চেষ্টা নাই বলে।"

"সুখের চেষ্টা কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়?"

"কষ্টের হাত এড়িয়ে।"

"কষ্টের হাত এড়াবার উপায় কি?"

"সুখের সাধনা ক'র্‌তে হ'লেই কষ্টের হাত এড়াতে হবে।"

"তা ত কথায় হবে না।"

"কথায় কেন, কার্য্যেই ক'র্‌তে হবে।"

"শক্তি চাই।"

"শক্তি ব্যতিরেকে কোন্ সাধনা হ'য়ে থাকে?"

"দুর্ব্বল মন, শক্তির আশ্রয় নিতে যে পারেনা মা।"

"ভুল বল্‌চ।"

"আমার ভুল সংশোধন ক'রে দাও মা, চিরদিন দাসী হ'য়ে থাক্‌ব।"

"পার্‌বে না।"

"কেন?"

"তুমিই বল্‌চ, তোমার দুর্ব্বল মন।"

"নয় কি?"

"কেমন ক'রে বল্‌ব, তোমার দুর্ব্বল মন? দুর্ব্বল মন হলে তুমি স্ত্রীলোক হয়ে গৃহত্যাগিনী হয়েছ, কার

আশায়? কার প্ররোচনায় অনন্ত অসীম সিন্ধুর বক্ষে ঝাঁপ দিতে চলেছ? এ ত দুর্ব্বল মনের কার্য্য নয়। বেশ বুঝে দেখ।"

ইন্দু সন্ন্যাসিনীর কথায় থতমত খাইয়া গেল। ভাবিল সন্ন্যাসিনী কে? ইনি কি অন্তর্য্যামিনী? নহিলে আমার অন্তরের সমুদায় গুপ্তবার্ত্তা কেমন করিয়া উদ্ঘাটন করিলেন! কে ইঁহাকে খুঁটি নুটি করিয়া বুঝাইয়া দিল? ইন্দু আবার কহিল, "হাঁগা বাছা, তুমি থাক কোথা?"

"কেন গা, সে কথা ত তোমায় আগেই বলেছি। আমারও একটা দুঃখ আছে। দুঃখের জ্বালায় ছোটাছুটি কর্‌ছি।"

"সে দুঃখটা কি শুন্‌তে পাইনা?"

"পাবেনা কেন!"

"বল্‌বে?"

"বল্‌ব না কেন?'

"তবে বলনা।"

"তুমি তত কথা কি শুন্‌তে পার্‌বে?

"আমার এক নিশ্বাসে রামায়ণ পড়া অভ্যাস আছে।"

"তাই নাকি, তোমার অভ্যাসে ত আমার সে অভ্যাস জন্মাবে না, কাজেই ক্রমে ক্রমে শুন্‌তে হবে। আমি রা/ "ত া একবারে হুড় হুড় ক'রে বল্‌তে পারি না।"

"তাই

"আচ্ছা তুমি খুব টানা লম্বা বর্ণনায় বল। আমার শুন্‌তে ভারি কৌতূহল হচ্চে।"

"শোন, আমার পাপ-পুণ্যের কাহিনী।"

"বল মা, তোমার কথা শুনে যদি প্রাণ বাঁধ্‌তে পারি।"

"আমার বাড়ী একটা পাহাড়ে দেশ। সেখানে মাটির সম্পর্ক নেই, পাথর, নুড়ি, বালি, কাঁকরে ভরা।"

"সে দেশ আবার কোথা মা, যেখানে মাটির সম্পর্ক নাই?"

"সে অনেক দূর পথ। পাহাড়ে পাহাড়ে যেতে হয়। তার চারি দিকেই পাহাড়! অট্টালিকার মুখ দেখ্‌তে পাবে না, চারিদিকেই শ্যাম তরুশ্রেণী—মুক্ত ধীর বাতাসে গা ঢেলে দিয়ে খেলা কর্‌ছে। তাদের অভিনয় বড় চমৎকার! কেউ নায়ক হয়ে নায়িকার জন্য উদ্‌গ্রীব। কোন নায়িকা বা—নায়কের আলিঙ্গনের প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখ হয়ে নিরাশ্রয় নিরাবরণে সাত দিন সাত রাত যেন নিছোক উপস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ বা বাঞ্ছিত নিধি হাতে পেয়ে প্রেম-তত্ত্বের নিগূঢ় মীমাংসা করে নিচ্চে। মোট কথা আমার বাড়ী যে দেশে, সে দেশে বিরহ বড় একটা দুর্লভ। মিলনের পথের সকলেই পথিক। বিধাতা সেখানে বিরহে [illegible] কার্পণ্য প্রকাশ করেছেন। মিলনটা তাঁর ইচ্ছার দান-প্র কথ[illegible]ছ, ব[illegible]।

সেখানে সাপে নেউলে খেলা করে, বাঘে বলদে এক প্রান্তরে বিহার করে, অমাবস্যার অন্ধকারে পূর্ণিমার কৌমুদী মিশিয়ে রয়, নির্ঝর দিবারাত্রি শান্তির গান গায়। লতামণ্ডপ সেই তরুশ্রেণীর গায়ে গায়ে জড়ান, মিলন বই কারও কথা নেই আর কাজও নেই। সে এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব মিলনের ক্ষেত্র। সুতরাং আমার বাড়ী মিলনের দেশে, এক কথায় বল্‌তে পার।"

"বেশ দেশত, হাঁ মা, তোমার বাপ মা আছেন?"

"ষাট্ ষাট্ অমন কথা বলো না, তা আছেন বৈ কি, না থাক্‌বেন কেন? পিতা আমার মৃত্যুঞ্জয়, মাতা অনাদি প্রসূতি—অক্ষয়া অব্যয়া।"

"স্বামী?"

"অনেক অনেক, একটা আধটা নয়, অনেক

"[illegible] সে কি কথা।"

[illegible] বিস্মিত হচ্চ, অবাক্ হবার কি

পে[illegible]

[illegible]তি—

তুমি বল্‌বে, নারীর একাধিক

[illegible]"

মা, বল্‌তে সঙ্কুচিতা হচ্ছিলাম

স্বামীর তত্ত্ব বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। আমি সকলকেই ভালবাসি, সকলের সঙ্গে মিলে থাক্‌তে ইচ্ছা করি। যদি কারও সহিত দুই একদিন বনিবনা না হয়, কিন্তু পরে আর তা থাকে না। সব ভুলে যাই, আবার মিলে পড়ি। তোমার এ প্রশ্ন আমার পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, এক-জনকে সর্ব্বস্ব দান করে মনে অন্য সংকল্প করার নাম ব্যভিচার।" আমি বলেছিলাম, "আমার সর্ব্বস্ব সর্ব্বের, একের জন্য নয়।"

নি হেসে বল্লেন, "কর্ম্ম করে যাও, পরে

মি সেই অবধি কর্ম্ম করে যাচ্চি, তরঙ্গে ভাস্‌তে চ। কূল আছে কিনা জানি না, পাব' কিনা না। কর্ম্ম কর্‌ব। বিবাহিত স্বামীকে একটা অপরূপ জন্তু, তা ভেবে তঁ জনা চজনকে যেমন ভালবাসি, তাঁকে মনি নি মন্ত্রপূত স্বামী, এই বলে তি-

থায় আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্চে প না।"

"কথা যে এখন বহু দূরে গিয়ে পড়েছে। বুঝ্‌তে একটু আয়াস নিতে হবে।"

"বুঝিয়ে দাও মা, কষ্ট করতে প্রস্তুত আছি।"

"ইন্দ্রিয় দমন করে সকলকে ভালবাস্‌তে হবে। অসংযত ইন্দ্রিয়ের ভালবাসার কোনও শক্তি বা বল নেই।"

"তার জন্য কি সাধনার প্রয়োজন হয় না?"

"সাধনা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, বিনা সাধনায় অত বড় সিদ্ধিলাভ কি হ'তে পারে মনে কর?"

"মনে করি না, বলেছি ত তর্কের পথে চলেছি।"

সে দিনের ক[illegible] ঐ পর্য্যন্ত। দুইজনে অবিরাম চলিতেছে। সন্ধ্যা হইল দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুইজনে অনেক্ষণ মুগ্ধ নয়নে তাহাই দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ছায়ায় মিশিয়া গেল।

পরদিন প্রভাত হইল। প্রকৃতির বক্ষে নানাজাতীয় পক্ষী বসিয়া নানাবিধ রব করিতে লাগিল। পূর্ব্বদিকে তরুণ অরুণ দেখা দিল। নিশার শিশিরকণা তখনও শুকায় নাই। ইন্দুকে বিমর্ষ দেখিয়া সন্ন্যাসিনী কহিল, এখন কি মনে হচ্চে? এমন বিষাদযুক্ত কেন।"

"তাই কি দেখাচ্চে।"

"তাইত অনুমান।"

"কি জানি, আমি কিছু বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।"

"যাকে ছেড়েছ, তার জন্য এখন ভাব্‌লে চল্‌বে কেন ?"

"কেমন করে জান্‌ব, তুমি না বল্‌লে ?"

যুবতী সন্ন্যাসিনীর কটাক্ষ একটু ভিন্নরীতির অনুসরণ করিয়াছিল।

দুইজনে আবার চলিতে লাগিল; কয়েক দিন ধরিয়া স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া শেষে একদিন মুশৌরী পর্ব্বতের একটী গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গিনী মহিলা মস্তক হইতে কৃত্রিম জটা, কণ্ঠ ও হাত হইতে রুদ্রাক্ষমালা খুলিয়া ফেলিল; কমণ্ডলুর জলে অঞ্চলের প্রান্ত ভিজাইয়া মুখ মুছিয়া বলিল, "ইন্দু চিন্‌তে পেরেছো ?"

ইন্দু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া "দিদি—তুমি—তুমি এ্যাঁ" বলিয়া জয়ন্তীকে জড়াইয়া ধরিল। জয়ন্তী প্রিয় আলিঙ্গনে গালভরা হাসি হাসিয়া বলিল, "পোড়ার মুখী, কোথা মর্‌তে যাচ্চিস! ভাতার নিলেনা ত পাহাড়ে গিয়ে মর্‌বি কেন ? পাহাড় কি তোকে ভালবাস্‌বে ?"

ইন্দু জয়ন্তীর প্রত্যুত্তর না দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "পাহাড়ের ঈশ্বর আশুতোষ, তাঁর ভালবাসা অনন্ত। তাঁর ভালবাসার ক্ষেত্রে-অক্ষেত্রের ভুল ঘটে না বলেই ভোলানাথ! স্বখন জ্ঞান, দুঃখিনী বলেও ভালবাস্‌তে পারেন।"

মুশৌরী পাহাড়ের যেস্থানে হরিদ্বর্ণ ঘনবৃক্ষলতা ঢাকা অংশ-টির মধ্য দিয়া একটী ছোট নির্ঝর একটী শিবলিঙ্গের পদ-মূল ধৌত করিয়া কল্-কল্ শব্দে অবিরাম বহিয়া চলিয়াছিল, সে-স্থানে প্রত্যহই ইন্দু ও জয়ন্তী কোন আশায় বুক না বাঁধিয়া সেই শিবলিঙ্গের সান্নিধ্যে নিঃস্বার্থে পতিদেবতার মঙ্গলার্থে প্রার্থনা ও ফুল দিয়া পূজা করিত। কিংবদন্তী—মাঝে মাঝে মুশৌরীশিখরিণী শিহরিয়া উঠিত,সে কেবল সেই ব্যথিতা যোগি-নীর যোগচিত্ত নিরোধের পূর্ব্বের হা হুতাশ নিশ্বাসে! দ্বাদশবর্ষ এই তরঙ্গে অতীতের দ্বারে অতিথি হইল। মায়াদেবী মাধবী আর মায়াময় সংসারে নাই। যে দিন ইন্দু শরতের নিকট লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হইয়াছিল, যে দিন সেই আত্মহ[illegible] সরলা স্বামীর হৃদয়-পিঞ্জরের পূর্ব্ব সাধের পাখীর হত্যাদ[illegible]ঝিয়াছিল, যে দিন সে কূলে দাঁড়াইয়া সিন্ধুর আশ্রিত তর[illegible]সেই সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জন দেখিল, যে দিন সে একটী ব্যথি[illegible] বেদনায় ব্যথিত হইয়া তাহার সর্ব্বব্যথাহারী পতিপদে [illegible] ও বিহ্বলতাভরা কাতর প্রার্থনা জানাইয়াও আকা[illegible] পূরণে অসমর্থ হইল, সেই দিন হইতেই সেই [illegible] মনের দুঃখে শুকাইতে লাগিল। আসিল—ক[illegible]। তারপর পক্ষে পক্ষে সেই লাল টুকটুকে [illegible]লি ক্রমে ক্রমে শরতের সাধের বাগানের

প্রেমতরু হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দুই বৎসর হইল—শরতের সেই প্রেমনিবেদিত সুন্দর অম্লান পেলব পুষ্প তাপময় ভূলোকে দারুণ তাপ সহিতে না পারিয়া কোন্ অজ্ঞাত দুঃখলেশহীন মনোরম উদ্যানে গিয়া ফুটিল, তাহা শরৎ দুইবর্ষ ব্যাপী কঠোর সাধনায়ও নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া নির্জ্জন সাধনার জন্য গৃহত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ণিত মুশৌরী পাহাড়ের "বাবা শিবলিঙ্গের" শরণাগত হইয়াছিল। বৎসর গত হইয়াছে, ইন্দু আর শরৎ—দুই জনের মধ্যে পরস্পর এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই! আজ সে অতি ব্যথিত! হৃদয়হীন পূর্ব্বস্মৃতি—শরতের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এখনও তাহাকে ভ্রুকুটিভঙ্গে শাসন করিতে আসে, তাই সে এখনও বিহ্বলতায় কাঁদিয়া আকুল হয়। রা ও সে চক্ষুর সম্মুখে দেখে—বিরাট বিশ্বজোড়া ব্যথা! র বু দই ব্যথার বুকের মাঝে গাঁথা তার হৃদয়ের পরমে ণীর ে শাভরা দুটি "ব্যথিতা" মূর্ত্তি!

তার

বিনয়

শুা

—:*০*:—

নরকের পথে

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

উপন্যাস সিরিজের উনত্রিংশ সংখ্যা

নরকের পথে

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

মাঘ, ১৩২৮

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট্‌ মার্কেট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,
কলিকাতা।

কলিকাতা—৩৩, নং গৌরীবেড় লেন, সূর্য্য প্রে
শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

নরকের পথে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্ধু।

"ব্যস্, হার মানছি—ছাড় এবার।"

আলোকান্ধকারে আচ্ছন্ন রাজপথের উপরে পড়িয়া দুইজনে হুটোপুটি করিতে করিতে যে ব্যক্তি কথা কহিল, তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া সজোরে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল। অপর ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দুই হাতে টানিয়া তুলিতে তুলিতে প্রশ্ন করিলেন—

"তোমার নাম কি?"

কণ্ঠস্বরে সে একটুখানি সহানুভূতির আভাস বাজিল তাহাতে চকিত হইয়া, লোকটি, একবার প্রশ্নকর্ত্তার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া, জবাব করিল—

"না, ভাঁড়াবো না, নাম—গোরা বৈরাগী।"

"নামেতেও ভেল চালানো গুণ আছে নাকি?"

"গুণ ঢের—"

"তা বুঝেছি, যখন একটা অনাথা, গরীব, নিরুপায় স্ত্রী-লোককে নেশার পয়সা আদায় করবার জন্য মারতে ছুটেছিলে তখনই তা বুঝেছি, কিন্তু নিজের নামেতে যে ভেল চালাও—"

"তা দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে চালাতে হয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে নয়।"

"কারণ ?"

"আমি হেরেছি, এমন ভাবে আমাকে মেরে কাবু করতে আজ অবধি আর কেউ পারেনি—আপনাকে 'গুরু' বলে মানলুম। উঃ এখনো মাথার ভিতরে ঝিন্ ঝিন্ করে উঠ্ছে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি অপ্রতিভ ভাবে অনুতপ্ত স্বরে কহিলেন—

"দেও ভাই তোমার হাত দেও, কিছু মনে ক'রনা—বড় অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।"

"না না, আপনার দুঃখিত হবার কারণ সেই, আমি দোষী—শিক্ষা হওয়াই উচিত, নইলে জ্ঞান হত না, আর অপনার সঙ্গেও—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবেগভরে গোরার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বিমুগ্ধ ভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি মহৎ, তোমার ভিতরে এমন মনুষ্যত্ব আছে—এঁ্যা! তবে কেন তুমি—"

"সে ওর স্বভাব-দোষ—নেশায় করেছে।"

বলিয়া প্রথম ব্যক্তির কথার জবাব করিয়াই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি তরুণী আসিয়া গোরার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল—

"আহা বড্ড লেগেছে বুঝি? তা কেন তুমি শুধু শুধু আমাকে মারতে তাড়া করলে, জানতো, পয়সা আমার কাছে থাকলে কি তোমায় দিই না, পাব কোথায়? বল্লুম—বাড়ীউলী বেরিয়ে গেছে —ঘরে তালা দিতেও ভুলে গেছে, চুপি চুপি তার ঘর থেকে একটা পাইট বার করে এনে খাও, তা তুমি রাগে আগুন হয়ে জ্বলে উঠলে, 'আমি কি চোর' বলেই তেড়ে মারতে এলে।"

"তা মারবো না—অমন কথা বলিস?"

বলিয়াই গোরা কট্‌মট্ করিয়া চাহিল, যুবতী সদুঃখে কহিল—

"তাতেই তো এই দুর্গতি হল, দেখি কোথায় লেগেছে—এস আমার ঘরে।"

গোরা জবাব করিল না কিন্তু অপর ব্যক্তি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এ্যাঁ সেই জন্যেই কি তোমায় মারতে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ গো, মাতাল গুণ্ডা বটে—সবাই ওকে যমের মত ভয় করে, কিন্তু অমন মানুষ হয় না। কেবল দোষ এই যে চব্বিশ

নরকের পথে

ঘণ্টার ভিতরে একটা ঘণ্টাও নেশা কামাই যাবার জো নেই, তাহলে আর জ্ঞান-গম্মি থাকে না। তখন যে সাম্‌নে পড়্‌বে তাকে ওর মদের খরচ যোগাতেই হবে নইলে তার আর রক্ষা থাকবে না। তাই ওকে দূর থেকে আস্‌তে দেখলেই সবাই পালিয়ে যায়। আমি পালাতে পারিনি বলে ওর খপ্পরে পড়েছিলুম, ভাগ্যে আপনি ঠিক সময়ে এসে—”

“কুড়ুনি, কোথারে হারামজাদি—”

সহসা রোষ তীব্র কণ্ঠের কর্কশ চীৎকার যুবতীর মুখের কথা ঠোঁটের ভিতরেই রুদ্ধ করিয়া দিল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কুমারটুলীর যেখানে এখন মিউনিসিপ্যাল পার্ক, সেইখানে একটা মাঝারি রকমের ছোট লোকের বস্তি এমন বিরক্তিকর ও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল যে একটু বেশী রাত্রে কোন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার নিকট দিয়া যাইতেও মনে মনে ভয়ে কাঁপিত। বস্তির ভিতরের সরু সরু গলিপথে যে দুই চারিটা সরকারী কেরাসিনের আলো ছিল সে গুলা রাত বারটা না বাজিতেই শুধু যে তেল শূন্য হইয়া আপনাদের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিত এমন নয়, রজনীর প্রথম যামেও জোনাকির মত মিটি মিটি আলোক এবং প্রচুর ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া—অন্ধকার হরণ করা দূরে থাকুক—বরং আরও বাড়াইয়া জমাট করিয়া দিত এবং মাঝে মাঝে চোখ-খেকো

লোকেরা যে হঠাৎ তাহাতে আহত হইয়া 'বাপ' বলিয়া উপুড় হইয়া পড়িত না এমন কথাও শপথ করিয়া বলা যায় না।

বস্তিতে কতকগুলি হীন স্ত্রীলোক এবং কুলী-মজুরের বাস, তাহার ভিতরে গুণ্ডা-বদমায়েসের সংখ্যাই বেশী। প্রায় প্রতি রাত্রেই চীৎকার, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়াই থাকিত এবং রাত বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যে রকম মাতালের উল্লাস উদ্দাম হইয়া উঠিত তাহাতে অদূরবর্ত্তী চিৎপুর রোডের পুলিশ প্রহরী-গণকেও বিব্রত না করিয়া ছাড়িত না।

আকস্মিক তীব্র আহ্বানে যুবতী যে কোথা দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। গোরা কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া অপর ব্যক্তি সহসা তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"সত্যই তোমার ভিতরে যে এমন মনুষ্যত্ব আছে তা আগে বুঝতে পারিনি ভাই।"

"এঁ্যা—আমার মনুষ্যত্ব আছে?"

"নিশ্চয়, এতবড় দুর্দ্দান্ত মাতাল হয়ে, মদ চুরির এমন সুযোগ যে উপেক্ষা করতে পারে, অধিকন্তু তেমন হীন প্রস্তাব-কারিণীকে রেগে মারতে তেড়ে যায় যে সে সাধারণ মানুষ নয়, তুমি অতি মহৎ—আজ থেকে আমার বন্ধু। এখন বন্ধুর পয়সায় মদ খেতে বোধ করি তোমার আপত্তি হবে না?"

বলিয়াই—একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু গোরা যেন কেমন হইয়া পড়িয়াছিল, অভিভূতের মত আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"এঁ্যা—মহৎ, মনুষ্যত্ব আছে আমার?"

"নিশ্চয়, সংসারে এমন মনুষ্যত্ব কম লোকের দেখা যায়। তা ভাই এখন খাবে চল, ওকি—অমন হয়ে গেলে কেন, অমন করে ভাব্‌ছ কি?"

"মনুষ্যত্ব এখনো আমার ঠিক আছে?"

"প্রতারণা করিনি বন্ধু, চল—যাবে না?—"

"নিশ্চয় যাব।"

বলিয়া, গোরা সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—

"আজ থেকে গোরা আপনার দাস হল,—আর কখনো সঙ্গ ছাড়বো না। আপনার নামটী কি—"

"বন্ধু বল ভাই, আমার নাম সত্যব্রত মিত্র, সত্যকে মিথ্যা কলঙ্ক ও অপরাধের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবার জন্য জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করেছি।"

"এঁ্যা—আপনিই ডিটেক্‌টিভ সত্যব্রত?"

বলিয়া, গোরা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা তাঁহার পদতলে মাথা ঠুকিয়া আনন্দিত ভাবে বলিয়া উঠিল—

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য, অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল। যে ঘটনায় পড়ে আজ আমার এ দশা তার প্রতিকার যে একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কারও দ্বারা হবে না, তা এতদিন নিজে প্রাণপাত চেষ্টা করে বুঝেছি। কিন্তু ধন্য ভগবান!—আজ আপনি আমার চোখে এক নূতন আলো জেলে দিলেন, জীবনের সকল দুর্ভাগ্যের কথা আজ যেন আবার নূতন হয়ে একসঙ্গে জেগে উঠছে! উঃ ভদ্রসন্তান হয়েও, আজ আমি জাত হারিয়ে বৈরাগী নাম নিয়েছি, গুণ্ডা বদমায়েস মাতাল বলে পরিচয় রাষ্ট্র করেছি, কিন্তু তবুও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারিনি, আজ ভগবান আশ্চয্য রকমে যখন আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আর আপনার চরণ ছাড়বোনা। আবার আমার মনে আশা জাগছে যে এবার আমার কাজ মিটবে—উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে, এই জঘন্য ইতরের খোলস ছেড়ে ফেলে, আপনার অনুগ্রহে আবার আমি মেঘমুক্ত সূর্য্যের মত ভদ্র সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো। দয়া করে আমাকে স্থান দিন—পায়ে ঠেলবেন না—আপনার মহাব্রতে আজ থেকে আমাকেও দীক্ষিত করে নিন।"

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে কথাগুলা শেষ করিয়া, গোরা তাঁহার মুখের পানে এমন করিয়া চাহিল যে—সেই আলো-আঁধারের আবছায়ার ভিতরেও সত্যব্রত তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা অদ্ভুত রহস্যের আবরণ বিজড়িত দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধভাবে

চাহিয়া রহিলেন। যে সহানুভূতির অঙ্কুরটুকু ইতিপূর্ব্বেই হৃদয়ক্ষেত্রে জাগিয়াছিল, তাহা দৃঢ় আকর্ষণে পরিণত হইয়া গেলে সত্যব্রত দুই হাতে গোরাকে টানিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—

"বন্ধু, বন্ধু, আজ থেকে আমরা এক—"

"অন্ধ নাচার বাবা—দয়া করে একটা পয়সা দেও।"

বলিতে বলিতে সেই মুহূর্ত্তে সত্যব্রতের কথায় বাধা দিয়া সহসা এক ভিক্ষুক আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। গোরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উদ্দাম ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—

"তবে রে হারামজাদা, রাত দশটার সময়ে এ পাড়ায় এসে 'অন্ধ নাচার বাবা!' আজ তোকে—"

"আহা-হা গরীব ভিখারী—"

না, না, অপনি জানেন না,—"

বলিয়া গোরা উত্তপ্ত ভাবে কহিল—

"বেটারা সব পাকা বদমায়েস—শয়তানের ধাড়ী। এই ভিখারী থেকেই আজ আমার এ দশা, শুনলেই বুঝতে পারবেন। যে পথে আপনি নেমেছেন তাতে এ ব্যাটাদের চিনে রাখলে ঢের উপকারে লাগবে।"

"তা'হলে রাগের চেয়ে বরং ওদের প্রতি সহানুভূতি—"

"সহানুভূতি?—ব্যাটাদের ধরে ধরে জ্যান্ত কবর দিতে হয়, সব শুনুন আগে তখন—"

"সব শুনবো ভাই, যখন পেয়েছি তোমায় তখন আর ছেড়ে দেব না।"

বলিয়া সত্যব্রত মৃদু হাসিয়া একটা সিকি বাহির করিয়া ভিখারীর হাতে দিয়া কহিলেন—

"যাও অন্যত্র চেষ্টা দেখগে,—তুমি তো আর সত্য অন্ধ নও, তা' হলে এতরাত্রে এ জায়গায় একলা বেড়াতে পারতে না।"

ভিক্ষুক অর্দ্ধোচ্চারিত মঙ্গল কামনা শেষ না করিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল, সত্যব্রত হাসিয়া কহিলেন—

"সকল রকম লোক দিয়েই আমাদের কাজ, কারুকে অগ্রাহ্য করা চলে না, যদি আমার সঙ্গে ঘুরতে ইচ্ছা কর তা' হলে এই কথাধা সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে।"

"কিছু দরকার নেই—একা আমাতেই আপনি সব পাবেন।

বলিয়া, গোরাও এবার হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভিখারী

ঘণ্টাখানেক পরে আপনার অতীত জীবনের সকল কাহিনী একে একে শেষ করিয়া গোরা যখন জিজ্ঞাসা করিল—

—"এখন আপনি কি বল্‌তে চান?"—

তখন সত্যব্রত গভীর বিস্ময়ে এমন নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছিলেন যে বহুক্ষণ অবধি তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। গোরা আপনার মনেই বলিয়া গেল—

"সেই থেকে আমার এই দশা। এমন সঙ্গতি নেই যে পুলিশের সাহায্য নেব—আর তাতে হাঙ্গামাও ঢের, কাজেই আজ প্রায় বছর ভোর নিজেই নানা ফিকিরে সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। ভগবান অন্য সকল জিনিষে বঞ্চিত করে আমাকে যে অসুরের বল, আর বদ্‌মাইসী বুদ্ধি দিয়েছেন তাই আশ্রয় করে কাজে নেমেছি। কিন্তু সর্ব্বদাই সকল শ্রেণীর নানারকম ইতর বদ্‌মায়েসদের সঙ্গে মিশতে হয় বলে এই বৈরাগী নামের খোলস্ পর্‌তে হয়েছে। এর একটা ভারি সুবিধা যে ভদ্রলোক ভেবে কেউ আমাকে কোন রকম সন্দেহ করে না। মুসলমানের মজলিস্ থেকে মায় বৈষ্ণবের আখড়া পর্য্যন্ত আমার অবারিত

দ্বার। কিন্তু এত করেও আজ পর্য্যন্ত কোন কিনারা করে উঠ্‌তে পারিনি।”

চড়কডাঙ্গার পিছন দিকে একটা দোতলা মাঠকোঠার নীচেকার একটা নির্জ্জন ঘরে বসিয়া উভয়ে কথা কহিতেছিল। ঘরটা চওড়ায় খুব বেশী না হইলেও—লম্বায় বড়, তাহারই শেষের দিকের খানিকটা জায়গা দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘরটার অন্য প্রান্তে আবার একটা অনুচ্চ দরমার বেড়া—তার মাঝখানে দরজায় ছেঁড়া চটের ময়লা পরদা টাঙ্গানো—তার সঙ্গে সংলগ্ন বাহিরের ঘরটায় চাটের দোকানের সঙ্গে সঙ্গে নূতন চায়ের দোকান সাজাইয়া বসিয়া এক যমদূতের মত বলবান কৃষ্ণকায় প্রৌঢ় চা প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল এবং তাহারই অনতিদূরে এক কদর্য্য গঠন কৃশকায় প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক জনকতক খরিদ্দারকে চাট বেচিতে বেচিতে তাহার দক্ষ হস্তের রন্ধিত সামগ্রীর উৎকর্ষতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অদূরে রাজপথের উপরে মদের দোকানের প্রকাশ্য দরজা বন্ধ হইয়া গেলেও সেই গলির উপরে যে ক্ষুদ্র গুপ্ত দরজা ছিল, সে পথে খরিদ্দারের গতায়াত বন্ধ ছিল না। সত্যব্রত ছেঁড়া চটের পরদার ব্যবধান দিয়া চাটের দোকানের দিকে দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিল—

“এ রকম কতগুলি আড্ডায় তোমাদের জানা শুনা আছে?”

নরকের পথে

"এ সব অঞ্চলের প্রায় সবগুলিতে; ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে জাহির হয়েছি এবং তাতে আমার আসল কাজ না হলেও যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দাম অল্প নয়। দেখলেন তো—'অন্ধ নাচার' সেজে যে ব্যাটারা পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়, তারা এই সব জায়গায় এক একটা হীন স্ত্রীলোক নিয়ে কেমন মজায় সংসার পেতে কাল কাটাচ্ছে?"

"তাই তো—আশ্চর্য্য! এ অভিজ্ঞতা আমার তোমার কাছেই লাভ হল। কিন্তু সহরের সকল ভিখারীরাই কি এই রকম এক শ্রেণীর?"

"সমস্ত না হলেও বেশীর ভাগই বটে, প্রকৃত ভিখারীর সংখ্যা খুব কম—সে বেচারারা এদের প্রতাপে অন্ন সংগ্রহ কর্‌তে অস্থির হয়ে পড়ে। এদের দ্বারা হয় না—এমন কাজ নেই, এই সকল জায়গায় ঘুরে ঘুরে এত রকমের সব গুপ্ত ব্যাপার আমার নজরে পড়েছে যে সে সকল ঠিক যেন উপন্যাসের ব্যাপার বলে মনে হয়। এই সকল ভিখারীরা যে রকম সব গুপ্ত রহস্যে সংশ্লিষ্ট আপনাদের পুলিশেও তা ভেবে কিনারা কর্‌তে হেরে যায়। উপরে ভিখারীর খোলস পরে ব্যাটারা ভিতরে ভিতরে যে রকম লাভের ব্যবসা চালিয়ে নিয়েছে তা আশ্চর্য্য, এই সকল ভিখারীর অনেকেই বোধ করি নগদ হাজার দু' হাজার টাকা বার করে দিতে পারে।"

"এঁ্যা বল কি ?"

"একটুও রঞ্জিত নয়—আমি চাক্ষুস দেখেছি। ভিক্ষা করে এরা রোজ যা উপার্জ্জন করে তা বোধ করি একটা দশ বছরের চাক্‌রে কেরাণী পায় না, তার উপর অন্য নানারকম উপায়েও মোটামুটী থোক্‌থাক্ উপার্জ্জনও যথেষ্ট—অথচ খরচ মোটেই নেই, সুতরাং টাকা জমবে না কেন ? এই যে সব মাগীগুলোকে দেখলেন, এদের অনেকেরই যে রকম গয়না-গাঁটী আছে আমাদের গৃহস্থ কেরাণীদের ঘরে তা নেই। এদের যে সব ছেলে মেয়ে তারা অল্প বয়স থেকেই এই ব্যবসা শিখে একেবারে এমন পাকা হয়ে যায় যে আশ্চর্য্য ! ব্যাটাদের কোন কাজ-কর্ম্মে লাগিয়ে দিতে চান দেখি—কিছুতে তা কর্‌বে না। এ ব্যবসায়ে ব্যাটারা যা রস পেয়েছে, তা ছেড়ে কেউ পরের চাক্‌রী কর্‌তে যাবে না।"

"তা আমি দেখেছি বটে, কিন্তু কারণ ভেবে স্থির কর্‌তে পারিনি।"

"এখন তা টের পেলেন তো ? যত সব সর্ব্বনেশে শয়তান, গুণ্ডা, বদ্‌মায়েস্, উপরে ভিখারীর খোলস পরে ভিতরে ভিতরে সংসারের বুকের উপর নিরাপদে লীলা করে বেড়াচ্ছে। আর, সহরের অনেক চরিত্রহীন বিলাসী, বড়দরের বাবু ভায়াদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সংশ্রব আছে বলে এদের উপার্জ্জনও যেমন প্রচুর

সাহসও তেমনি যথেষ্ট। কোন একটা কাঙ্গালী ভোজনের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যদি একটু ভাল রকম লক্ষ্য করে দেখেন, তা'হলে অনেকেরই উপর আপনার সন্দেহ হবে। তবুও, কোন ব্যাপারে কেউ যে কেন এদের সন্দেহ করে না—এইটাই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হয়! আমার ইতিহাস শুন্‌লেন তো, আমি যতই এই সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে নানা ব্যাপার দেখ্‌ছি ততই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে যে এই শ্রেণীর কোন বদ্‌মায়েস্ শয়তানের দলের দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথাও কোন রকম সন্ধান করে উঠতে পার্‌ছি না। এই যে সব গৃহস্থ ভিখারী—"

গোরার কথায় বাধা পড়িল। সহসা একটা কদাকার খঞ্জ যুবক দোকানের ভিতর হইতে দরজার চটের পরদা ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল—

"আজ আর ফাঁকি দিলে ছাড়ছি না বৈরাগী, তিন দিন থেকে—"

বলিতে বলিতে লোকটা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াই সহসা সত্যব্রতের দিকে চাহিয়া থামিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। গোরা উচ্চ হাসিয়া কহিল—

"ভয় কি গুল্লা, থম্‌কে দাঁড়ালে কেন—এস, এস, কোন ভয় নেই, ইনি আমার একজন বিশেষ বন্ধুলোক, নইলে কি এমন

সময়ে এ জায়গায় সঙ্গে করে আন্‌তে পারি? এঁর সঙ্গে আলাপ করে রাখ অনেক সময় অনেক কাজ পাবে।”

বলিয়া, সত্যব্রতের পানে চাহিয়া কহিল—

“এই গুল্লা একজন ওস্তাদ লোক, খোঁড়া হলে কি হয় অন্য লোকের চেয়ে বুদ্ধিও যেমন বেশী—সাহসও তেমনি, কোন কাজে 'না' বল্‌তে শুনিনি। আপনার যখন যে কাজ পড়বে ওকে বল্লেই হবে।”

গোরাকে আর বলিতে হইল না। গুল্লার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, লাঠিতে ভর করিয়া ত্রিবক্র ভঙ্গীতে হেলিয়া দুলিয়া সত্যব্রতের নিকটস্থ হইয়া, দুই হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া প্রফুল্ল ভাবে কহিল—

“আজ্ঞে এ কোণটায় আঁধারের ভিতর বসে আছেন বলে প্রথমে হুজুরকে আমি দেখতে পাইনি। এ বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের অনেক দিন থেকে জানাশুনা, আমাদের উপর ওনার মেহেরবাণী খুব আছে। আপনি যখন ওনার দোস্ত তখন দয়া করে পায়ে রাখবেন, আপনার যখন যে কাজ পড়ে আমাকে বল্‌বেন, এমন চুপিসাড়ে ফুস্‌মন্তরে তা হাসিল করে দেব যে, এ বাড়ীর আর কেউ তা পার্‌বে না।”

“তা, মিথ্যা নয় মশাই,”

বলিয়া গোরা হাসিয়া কহিল—

"এর মত সকল কাজে ওস্তাদ খুব কম দেখা যায়। একবার একটা মেয়ে চুরির ব্যাপারে পড়ে, ঠ্যাং ভেঙ্গে, বছর খানেক খেটেও এসেছে।"

"নইলে কি মশায় বুদ্ধি পাকে না সাহস বাড়ে?"

বলিয়া, গুল্লা এবার গোরার পায়ের কাছে বসিল এবং তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল, গোরা হাসিয়া বলিল—"আমাদের যা মালপত্র ছিল, তা'ত সব ফুরিয়ে এসেছে, তোমার ত আর অল্পে সান্‌বে না।"

গুল্লা সত্যব্রতের মুখের পানে করুণভাবে চাহিয়া কহিল—

"আজ্ঞে হুজুর নতুন লোক, এনারা সব আমাদের জানেন সকালে উঠে অবধি সারাদিন রাত ভোর আমাদের যা খাটতে হয় তাতে একটু বেশী রকম না হলে জান্‌টাকে খাড়া রাখতে পারি না, তাতেই একটু বেশী অভ্যাস হয়ে পড়েছে। কিন্তু হুজুর, দিনকাল যা হয়েছে তাতে আমাদের ব্যবসা চালানোই মুস্কিল হয়ে পড়েছে, তা আর নেশার পয়সা জুটবে কোথা থেকে? আজ সাত দিন জলপথের মুখ দেখতে পাইনি কেবল শুকোতেই চলেছে। এই দেখুন না—"

বলিতে বলিতে কোমরে বাঁধা গেঁজে বাহির করিয়া, কতকগুলি পয়সা, আধলা, সিকি প্রভৃতি ঢালিয়া গণিয়া কহিল—

"আজকের রোজগার মোটে এই দু'টাকা, পাঁচ আনা, সাড়ে

তিন পয়সা। আমি মরি আর বাঁচি, ঘরে ভৈরব বোষ্টমীকে রোজ নগদ দু'টাকা আর বাজার খরচার জন্যে আট আনা—এই আড়াই টাকা দিতেই হবে, নইলে কুরুক্ষেত্র ব্যাপার বেঁধে যাবে, খেতে তো দেবেই না, তার উপর ঝেঁটিয়ে ঝাল ঝেড়ে দেবে—"

গোরা বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, তোমার বোষ্টমীও তো রোজগার করে, সে সব—"

"এজ্ঞে তার কাণাকড়িতে হাত দেবার জো নেই।"

বলিয়া, গুল্লা ঈষৎ হাসিয়া আরম্ভ করিল—

"সে ভিক্ষে সিক্ষে করে নেহাত মন্দ পেত না—তাতেই তো যা দু'একখানা গয়না-গাঁটি কর্‌তে পেরেছে, কিন্তু আমার জেল হওয়া অবধি সে এমনি ঘাবড়ে গেছে যে ভরসা করে আর কোন রকম বড় রোজগারের দিকে ঘেঁস্‌তে চায় না।"

"তা, তুমিও মাস-মাস সত্তর পঁচাত্তর টাকা দেও, তোমার বোষ্টমীও কোন না গড়ে রোজ দু'টো টাকা উপায় করে? এই প্রায় দেড়শো টাকাতেও তোমাদের দুটী প্রাণীর সংসার—"

"তাতে কি হয়, আখেরের জোগাড় করে রাখতে হবে তো? এই যে পুরো একটা বছর জেলে থেকে এলুম—এতদিন তো আমি আর এক পয়সাও রোজগার করে দিতে পারিনি, ওকে একলা উপায় করেই তো ঘর চালাতে হয়েছে—ছেলে মেয়েটাকে মানুষ কর্ত্তে হয়েছে। সেই থেকেই আমাদের কষ্টের দিন আরম্ভ

হয়েছে বাবু, নইলে তার আগে—বাইরে থেকে জোগাড় হোক আর না হোঁক—রোজ আধখানা করে "খাঁটি" গৈরবের আর আমার বাঁধা বরাদ্দ ছিল। দায়ে পড়ে এখন তাকেও শুক্‌নোতে নাম্‌তে হয়েছে, আর আমি তো খোঁড়া হয়ে পড়েছি—যদি বরাবর উপায় কর্ত্তে না পারি, কাজেই আখেরের জন্যে হুঁসিয়ার হতে হয়। তার উপর ভিখারীর ব্যবসা আজকাল এমন ঢিমে হয়ে পড়েছে যে তায় আর বল্‌বো কি! আজকাল আর তেমন সৌখীন বাবু ভায়াদেরও কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখতে পাইনে—যে মোটা রকম দু'পয়সা উপায়ের ভরসা থাক্‌বে। নইলে হুজুর বল্লে পিত্যয় করবেন না—এই ঠ্যাং ভাঙ্গবার আগে এমনিতর সব কাজে একদিনে তিরিশ টাকা অবধি রোজগার করেছি। তেমন সব সৌখীন কাপ্তেন বাবু এখন আর বড় একটা নজরে পড়ে না যে একবার সন্ধান পেয়েই আমাদের চর লাগিয়ে দেবে। আর যে রকম পুলিশের কড়াকড়ি বেড়েছে তাতে তাদেরই বা দোষ দেব কি? আর এখন আমাদের ব্যবসায়ে লোকও হয়ে পড়েছে অগুণতি, একটা দাঁও লাগলে অমনি চারিদিক থেকে পঙ্গপালের মত এত লোক এসে ঘিরে দাঁড়ায় যে আর থোক্‌থাক্ রোজগার কর্‌বার স্থবিধা হয় না। ব্যাটারা কোন কাজ হাসিল কর্‌তে পারে না, কেবল ভিড় বাড়িয়ে দর কমিয়ে দেয়। নইলে, গেল গঙ্গাচানের মোরস্থমটায় একটা জবর গোছের দাঁও এসেছিল

আমার হাতে, কোথেকে এক ব্যাটা নতুন লম্বা নাক, টেকো, কুঁজো জুটে নিলে কাজটা ছোঁ মেরে কেড়ে। নইলে সে খোট্টা বাবু পনর দিন আগে থেকে আমাদের সর্দ্দারনীর সঙ্গে বলা-কহা করে একজন কাজের লোক চেয়েছিল, তা আমার মত মোটা বখ্‌রা আর কেউ দিতে রাজী হয় নি বলে সর্দ্দারনী আমার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা ঠিক করেছিল, তা তখন এই গৌরব শাল্‌ী শুনে ভড়্‌কে গেল তাইতে আমিও গা দিলুম না, তাই এমন কাজটা ফস্‌কে গেল, নইলে কি আজ নেশার ভাবনা ভাব্‌তে হয় ?"

বলিয়া অনুতপ্ত ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সত্যব্রত তাহার কথাগুলির প্রত্যেকটি যেন গিলিতে ছিলেন, একটা অদম্য কৌতূহল তাঁহার বুকের ভিতর ফেনাইয়া উঠিতেছিল, গুল্লাকে তেমন ভাবে থামিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—

"আচ্ছা এই নেও, আগে নেশা করে চাঙ্গা হও, তোমার গল্প ভারি জমে উঠেছে—গঙ্গাস্নানের মোরস্থমের ওই ব্যাপারটা সব শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে—আগে খেয়ে নেও, কিন্তু এত রাত্রে জোগাড় করতে পারবে তো ?"

"আজ্ঞে, জোগাড়ের ভাবনা কি—এ শুঁড়ীর দোকানে সারারাতই পাওয়া যাবে, তা ছাড়া বাড়ী-উলীও ওদের চেয়ে ভাল

জিনিস রাখে—একেবারে নির্জ্জলা খাঁটী, তবে কিছু বেশী দাম নেয়। আমি এর চাইতেও বেশী রাতে কতদিন কত বাবু-ভায়াকে কিনে দিয়ে এসেছি। যদি এত দয়া করলেন হুজুর তবে আর পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিন বাড়ীউলীর কাছ থেকেই ভাল মাল এক বোতল নিয়ে এসে গৌরবকেও একটু দিই, আহা বেচারা হাতে স্বর্গ পাবে।"

বলিতে বলিতে মিনতিপূর্ণ নয়নে গোরার পানে চাহিল: গোরা আবার ঈষৎ হাসিয়া সত্যব্রতকে কহিল—

"তা একটাকা পাঁচ আনায় একটা কেন অনেক গঙ্গাস্নানের কাহিনী শুনতে পাবেন, বলেছিতো—গুল্লা একজন বড়দরের ওস্তাদ লোক, টাকা ব্যর্থ হবেনা।"

"তা, হুজুর এই আমাদের পেশা, যদি তেমন কাজকর্ম্ম দেন তো দেখে নেবেন যে গুল্লার বুদ্ধিতে ভেল্কী খেলে, তাতেই তো এ সহরের বড় বড় বাবু ভায়াদের এ গোলামের উপর নেক্-নজর আছে, আর যত সব ভারী সঙ্গিন্ সঙ্গিন্ কাজে আমাকে আগে না ডেকে সর্দ্দারনী আর কারুর কাছে যায় না।"

সত্যব্রত দ্বিরুক্তি না করিয়া আরও পাঁচ আনা দিলেন। খোঁড়া গুল্লার পা দু'খানা যেন উৎসাহে সোজা হইয়া দাঁড়াইল, সে চোখের পলকে টাকা লইয়া এমন ত্বরিতে প্রস্থান করিল যে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তারপর মিনিট পনের কাটিতে

না কাটিতে সে আবার যখন তাহার বৈষ্ণবীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল তখন সত্যব্রত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে সে বৈষ্ণবী পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গৌরব

বাস্তবিকই প্রকৃত সুন্দরী না হইলেও বৈষ্ণবীর সাদাসিধা সাজ-সজ্জার ভিতরে এমন একটু নিপুণতা ছিল যে ঘসিয়া মাজিয়া আপনাকে সুন্দরী করিবার চেষ্টা তাহার ব্যর্থ হয় নাই—দেখিলে কিছুতেই কুৎসিৎ বলিয়া মনে হইত না। পরণে একখানি—অর্দ্ধেক হলুদ ও অর্দ্ধেক সবুজবর্ণে ছোপান—মিহি কাপড়, চার আঙ্গুল চওড়া লাল রঙের পাড়, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম অভ্রের গুঁড়া সেই মৃদু আলোকেও ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। গায়ের রং মেটে মেটে হইলেও কোথাও মলিনতার ছায়ামাত্রও ছিল না, বরং মাজাঘসা অঙ্গ হইতে যেন একটুখানি স্নিগ্ধশ্যাম লাবণ্যের প্রভা কাপড় ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছিল। গঠন একহারা রকমের

কিন্তু যেমন শুষ্কতা ও নীরসতা বর্জ্জিত তেমনি ঢেঙ্গা কিংবা বেঁটেও বলিতে পারা যায় না। হাত দুইখানিতে সোণার গহনা না থাকিলেও যে চারিগাছি করিয়া টক্‌টকে লাল বর্ণের রেশমী চুড়ি ছিল, সেগুলি কাণায় কাণায় বসিয়া যেমন নিটোল—সুগোল দেখাইতেছিল, তেমনি দেহের বর্ণের সামঞ্জস্যে—একটু যে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের বিকাশ করে নাই, এমনও নহে। সর্ব্বোপরি বাহার মুখখানির!

বৈষ্ণবীর মুখখানি দিব্য গোলগাল মসৃণ। খোপা বাঁধা চুলগুলি দেখিবার উপায় না থাকিলেও, সম্মুখের দিকে চুল নামাইয়া পাতা কাটিয়া, কপালে একটি ক্ষুদ্র কাল টিপের উপরে অপেক্ষাকৃত বড় একটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া এবং নাকের উপরে অতি চিক্কণ রসকলি আঁকিয়া সে এমন করিয়াই সুন্দরী সাজিয়াছিল যে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেও তাহাকে বিলাসিনী নিশা-বিহারিণী ভিন্ন কিছুতেই ভিখারিণী বলিয়া মনে ভাবিবার উপায় ছিল না। তার উপর তাহার গতিভঙ্গী এবং হাবভাবে যে লীলাচঞ্চল বিলাসের ভঙ্গিমাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যে অনেক সৌখীন যুবকের চিত্ত আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না—এ কথাও শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়। তাহার পার্শ্বেই ঠিক বিপরীত—বিকলাঙ্গ কদাকার গুল্লার বিদ্যমানে গৌরবের সৌন্দর্য্যের গৌরব শত গুণে অধিক বাড়িয়া

গিয়াছিল। সত্যব্রত এই দু'টী বিপরীতদর্শন নর-নারীর পানে চাহিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল এ রমণীকে পূর্ব্বে যেন আরও কোথাও দেখিয়াছেন, কিন্তু ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

বৈষ্ণবীও সত্যব্রতের মুখের পানে চাহিয়া যেন চকিতের মত একটুখানি চম্‌কাইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই এমন দক্ষতার সহিত আপনাকে সামলাইয়া লইল যে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপরে যেন কত পরিচিতের মত—গলায় আঁচল দিয়া সত্যব্রতের পায়ের কাছে গড় করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার স্বরে কহিল—"আমাদের বড় ভাগ্যি যে আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে,—"

সত্যব্রত আরও আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমাকে চেন নাকি?"

বৈষ্ণবী তাঁহার পায়ের সুমুখের মাটিতে একবার হাত বুলাইয়া সেই হাত নিজের মাথায় দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলাইয়া প্রফুল্ল ভাবে জবাব করিল—

"চেনা শুনা তো এমনি করেই হয় বাবু, সাত দোরের কাঙ্গাল আমরা আপনাদের দয়াতেই তো মুখ তুলে কথা কইতে ভরসা পাই। কি বল বৈরিগী, তোমার সঙ্গেও তো প্রথম এমনি করেই আলাপ হয়েছে—"

গোরা এতক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল, বৈষ্ণবীর কথায় যেন একটু থতমত খাইয়া বলিল—

"না বাবা, তোমার এ রূপের সঙ্গে তো পূর্ব্বে আমার পরিচয় ঘটে নি, আজ আমারও এই সুরু।"

গৌরব মধুর হাসিতে ঘর ভরাইয়া মিনতিপূর্ণস্বরে কহিল—

"তা াঁচ ভদ্দর ঘরের ধূলো কুড়িয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়, তাদের সে সব জায়গায় যাবার জন্যে একটু পস্কের-ঝস্কের না হলে কি চলে গা? আজ আহীরিটোলার বামুন বাবুদের নতুন বৌয়ের ছেলের 'আট-কড়াইয়ে' গেল কিনা, তেনারা আমাকে বড় দয়া করেন, এই কাপড়খানা দিয়ে বল্লেন ভাল করে পস্কের-ঝস্কের হয়ে সেজে-গুজে থাকিস্, নইলে গায়ের গন্ধে যদি ভূত পালায় তাহ'লে এ বাড়ীতে আর মাথা গলাতে পাবি না।"

"বটে বটে, তা অন্দরেও হানা দিতে বাকী রাখ না বুঝি?"

"তা'হলে কি আমাদের চলে? কথায় বলে যে নারীর প্রাণে দয়া যেমন, পুরুষের নয়কো তেমন। মেয়েরাই লক্ষ্মীর অংশ কিনা, তেনারা যদি দয়া না কর্‌তেন, তাহ'লে পুরুষ মানুষের কাছে হাত পেতে কি কারুর চল্‌তো?"

বলিয়া সত্যব্রতের প্রতি আবার একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপসংহার করিল—

"তবে আপনার মত দয়ার শরীর পুরুষ তো সব ঠাঁই মেলে না, তাই অন্দরে মা-লক্ষ্মীদের কাছেও যেতে হয়।"

গুল্লা গর্ব্বভরে সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—

"এজ্ঞে গৌরব আমার ভিখারী হলেও ওর গুণ আছে ঢের, ওর কীর্ত্তন শুন্‌বার জন্যে সব বড় বড় ঘরের মেয়েরা হামেসা ওকে ডেকে পাঠায়, আর ও এমনি গায় যে একবার শুনে, সে আর ওকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পারে না, তাতেই তো আমাদের—"

"এক এক সময়ে মস্ত দাঁও লেগে যায়—না হে গুল্লা?"

বলিয়া গোরা সত্যব্রতের চোখে চোখে চাহিয়া কি ইঙ্গিত করিল। কিন্তু গুল্লা আনন্দের আতিশয্যে এমন মাতিয়া গিয়াছিল যে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়াই উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল—

"তা নেহাৎ মিছে আঁচ করনি বৈরিগী, ওকে দিয়ে যতবার যত বড় বড় কাজ পেয়েছি তেমন সদ্দারনীও আমাকে জোগাড় করে দিতে পারে নি। সে বার নাপ্তিনী হয়ে মাস খানেকের ভিতরে এক বাড়ীতে—"

কিন্তু গুল্লার কথা শেষ হইল না, গৌরব সহসা চঞ্চল হইয়া দু'চোখে আগুণ ছুটাইয়া চকিতে তাহার পানে এমন করিয়া চাহিল যে বেচারার সকল উৎসাহ মুহূর্ত্তে নিবিয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কথার শেষটুকু কণ্ঠনালীর ভিতরেই জমাট বাঁধিয়া আটকাইয়া

গেল এবং মুখখানা এমন ভাব ধারণ করিল যে দেখিয়া সত্যব্রত কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলেন। গোরা তাহার বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

"তা বল্লেই বা, তাতে অত গোঁসা করছো কেন গৌরব, এতো আরও তোমার গৌরবেরই কথা—নইলে অন্য ভিখিরীর বাড়ী না গিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য বাবুকে এখানে এনেছি কেন? আমার সঙ্গে তো তোমাদের আজকের জানা-শুনা নয়—আমার কাছে আর লুকোচুরি কেন? এ বাবুও আমারই মত একজন, তা না হ'লে কি এখানে আন্‌তে ভরসা পাই? ভাল করে আলাপ করে রাখ—ঢের কাজ পাবে।"

গোরা তাহার পানে চাহিয়া একটা অর্থসূচক কটাক্ষ করিল। গৌরব চকিতে মনের ভাব চাপিয়া সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত মুখে চোখে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া মধুর স্বরে সত্যব্রতকে কহিল—

"তা যদি দয়া করে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তাহ'লে এ হোটেলখানার ঘরে বসা ভাল নয় বাবু, এখনি নানারকম লোক জন এসে পড়বে, ভিতর বাড়ীতে আমার ঘরে গিয়ে বসলে—"

সত্যব্রত ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—

"না, আজ আর তায় কাজ নেই, রাত প্রায় একটা বাজে, আমি কেবল তোমার গুল্লার গল্প শুনবার জন্যে—"

"বেশ তো—আমার ঘরে বসেই শুনবেন। নইলে আপনি দয়া করলেন বটে, কিন্তু আমরা ত এ হাটের ঘরে বসে খেতে পারব না, কে কোত্থেকে এসে দেখে ফেল্‌বে আর আমাদের ভাত মারা যাবে বাবু, আর কি কেউ তাহ'লে আমাদের ভিক্ষা দেবে—দয়া করবে, আমি যার এই কাপড়-চোপড় পরে এখানে আস্‌তেই চাইনি, কেবল আপনি এসেছেন শুনে আর ওই মুখ-পোড়ার পেড়াপীড়িতে আপনাদের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্যেই ভরসা করে এসেছি। নইলে শুন্‌লেন তো, ওই বৈরাগীর সঙ্গে আমাদের এত জানাশুনো তবু উনিও কখনো আমায় সাজতে-গুজতে দেখেননি। উঠুন বাবু, যদি দয়া করে এয়েছেন তবে দাসীর ঘরে পায়ের ধূলো দিতেই হবে।"

বলিয়াই গৌরব এমন ভাবে সত্যব্রতের অভিমুখে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া চোখের কটাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভঙ্গি করিল যেন তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইবে। সত্যব্রত শশব্যস্তে দুই পা পিছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"আচ্ছা চল চল, যাচ্ছি, মেয়ে-মানুষ এমনি বাহাদুর জাত যে তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবার যো নেই।"

বলিয়া গোরার পানে চাহিয়া হাসিলেন, গোরা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—

"বিশেষ এমন বহুরূপী সুন্দরীর সঙ্গে।"

গুল্লা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া গিয়াছিল, গৌরব আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। সে আগাইয়া যাইতে যাইতে—মুখ না ফিরাইয়াই গোরাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—

"বৈরাগীর মুখে যে খই ফুটছে দেখ্‌তে পাই ?"

"ফুটবে না চাঁদ—এমন সুন্দরীর কাছে থাক্‌লে বোবারও বোল ফুটে যায়, তা আমি তো ঢেঁকির কচ্‌কচি।"

ততক্ষণে সকলে দোকান ঘরের বাহিরে আসিয়া গলি-পথে দাঁড়াইয়াছিল। দুজন দোকানী তাহাদের পানে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া পরস্পরে চোখোচোখি করিল। সত্যব্রতের মনে হইল যেন তাহারা কিছু বলিতে চায়। গৌরব গলিপথে অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়াইয়া যে কাহার সহিত ইঙ্গিতে কি বলাবলি করিতেছিল তা বোধ করি দোকানী দুজন ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। সত্যব্রত দোকানদারকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া গৌরব সেই অন্ধকারের ভিতর হইতেই বলিয়া উঠিল—

"এই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর দেরী করা যায় না, বাবু, ওদের যা দেবার তা ফিরবার সময়েই দিয়ে যাবেন' খন।"

সত্যব্রত আর তাহাদের সহিত কথা কহিবার অবসর পাইলেন না, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে মনিব্যাগ খুলিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"এতেই বোধ করি হবে ?"

দোকানদার ঈষৎ হাসিল—জবাব করিল না। সত্যব্রত গলিপথে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"তুমি আগে চল বন্ধু, এত অন্ধকারে এই সরু গলিতে আমাকে ঠোক্কর খেতে হবে।"

"ভয় কি, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে ভাল করে নিয়ে যাচ্ছি।"

বলিয়াই বিদ্যুতের মত চকিতে গৌরব সহসা তাঁহার গা ঘেঁষিয়া এমন ভাবে খপ্‌ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল যে সত্যব্রত বাধা দিবার সময় পাইলেন না। কিন্তু গোরা পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—

"কি বহুরূপি, এমন পাকড়াও করে আমাদের কোন নরকের পথে নিয়ে যাবে বাবা—মনে কিছু মতলব-টতলব আছে নাকি?"

"তোমার মত অরুচিকে দিয়ে আর কি মতলব হাসিল হবে ভাই—তোমার ভয়টা আজ নতুনতর দেখছি যে?"

গৌরব খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। গোরাও হাসিয়া কহিল—

"যে যমের অরুচি তারও পেত্নীর ভয় থাকে, একেই তো পয়সাগুলো সব বরবাদ হল—নেশা রসাতল।"

"ভয় নেই—নেশার চিন্তা কি, সে আপ্‌শোষ গৌরবীর কাছে মিটে যাবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অন্ধকার পথে

যে ঘরে বসিয়া সকলে ইতিপূর্ব্বে কথা কহিতেছিল, তাহার একপ্রান্তের দরমায় ঘেরা গলিপথ দিয়া গৌরব যখন বাড়ীর ভিতরে আসিয়া পড়িল তখন সত্যব্রতের চোখ অন্ধকারে অনেকখানি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। বাড়ীর ভিতরে কোথাও আলোকের ক্ষীণ রেখাপাত পর্য্যন্ত না থাকিলেও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে উঠানটি যেমন ক্ষুদ্র তেমনি অপ্রশস্ত, চারিদিকে উঁচু দোতলা খোলার মাটকোঠা কারা-প্রাচীরের মত ঘিরিয়া সে স্থানের আলো ও বাতাস বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তার উপর এমনি ভিজা ও স্যাঁৎসেঁতে যে প্রতি পাদক্ষেপেই মনে হইতে লাগিল যেন কাদায় পা বসিয়া যাইতেছে।

ভিতরে আসিয়াই গৌরব তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া আগে আগে যাইতেছিল। উঠান সোজা পার হইয়া আবার লম্বা দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ফিরিয়া কহিল—

"সাবধান ওখানে কূয়ো আছে—পাড় নেই এই থান দিয়ে দাবায় উঠুন।"

সত্যব্রত মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। গোরা মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিল—

"সত্যই কি এই দুটো নিরীহ জীবকে উচ্ছুগ্য করবার মতলব করেছিস নাকি গৌরবী, এ কোন যমপুরীর দক্ষিণ দোরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছিস বলতো, নইলে—নেশা করা মাথায় থাক্— তোমায় দু'শো সেলাম ঠুকে এইখান থেকেই পেছু কাটালুম, এ খানে এ বাড়ীত দেখিনি বাবা।"

"ছিঃ বন্ধু—একটা মেয়েমানুষের সঙ্গে যেতে এত ভয়?"

"আর কাজ কি বন্ধু—প্রাণ বিন্দু বিন্দু ঘাম্‌তে ঘাম্‌তে একেবারে সিন্ধু হয়ে উঠেছে। খাঁটি কথাটা কি বলে ফেল দেখি চাঁদ, নইলে সত্য বলছি—দিনমানে একবার এ অঞ্চলে হানা না দিয়ে আজ আর কিছুতেই এগোচ্ছিনি বাবা। ফিরে আসুন মশাই, গা বাঁধবার ব্যবস্থা না করে পেত্নীর পিছনে পিছনে এমন অমাবস্যার অন্ধকারে ধাওয়া করা সুবিধা নয়।

এবার গৌরব আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—

"সত্যি ভাই বৈরিগী তুমি যে ঢেঁকির কচকচি তা বড় মিথ্যা নয়, বকতে বকতে প্রাণ গেল। তুমি তো তিন চার মাস এ তল্লাট মাড়াওনি, এ বাড়ী হালে হয়েছে—এখনো ভাড়াটে

আসেনি দেখছ না, নইলে কি গোরস্থানের মত এমন অন্ধকারে থম্‌থমে হয়ে পড়ে থাকে ?”

এতক্ষণ পরে সত্যব্রত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। পুলিশে তাঁহার সুনাম ও দক্ষতার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। অনেক ভয়ানক ভয়ানক স্থানে নিঃশঙ্ক চিত্তে একাকী গিয়া তিনি বহুবার নিতান্ত দুঃসাহসিকতা ভরে যে সকল কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ভয় যে কাহাকে বলে তা তাঁহার কুষ্ঠীতে লেখা ছিল না। তবুও—কে জানে কেন—এই দিনটার ঘটনাবলী এমন একটু রোমান্সের মত করিয়া ঘটিয়া যাইতেছিল যে বিনা কার্য্যে—কেবল কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া—আসিয়া সেই ঘটনাচক্রের ভিতরে পড়িয়া তাঁহার মন কেবলই যেন একটা অজ্ঞাত গুরুভারে অবসন্ন হইয়া হাঁস ফাঁস করিতেছিল। বিশেষ করিয়া সেই অজ্ঞাত রহস্যময়ীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—ঠিক যন্ত্রচালিতের মতই—গভীর রাত্রে সেই দম-আটকানো বাড়ীখানার অন্ধকার—স্তব্ধতার ভিতর আসিয়া অবধি তাঁহার অন্তরের উদ্বেগ আরও বাড়িতেছিল বই কমে নাই এবং ঠিক অমনিতরই একটা ভাব যে মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে উদয় হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তেই গৌরবের ওই গোরস্থানের উপমাটা যেন তাঁহারই অন্তরের প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। অন্যের মুখ হইতে বাহির হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু কথাটা সেই রহস্যময়ী সুন্দরীর সুমিষ্ট

লঘু কণ্ঠস্বরহইতে রহস্যের অবতারণা করিয়া বাহির হইয়া তাঁহার হৃদয়ভার লাঘব করিয়া দিল। নিজের দুর্ব্বলতায় মনে মনে লজ্জিত হইয়া তিনি করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"তোমার গৌরব বিবি রসিক বটে বন্ধু—সকল রসেই পোক্ত।"

গৌরব হাসিয়া কহিল "আচ্ছা, সে পরিচয় মিলবে'খন। দেখবেন --হাত ধরুন, এই কোন্‌টা ঘুরে—এবার এদিকে—আবার একটা কোন্, এবার এ টুকু লম্বা পায়ে টপ্‌কে আসুন—নীচে কোমর ভোর দঁক্। আর একটুখানি—বাঁয়ে ঝুঁক্‌বেন না—ঝুঁক্‌বেন না, গলা ভোর পচা নদ্দমা—ডাইনে খুব দেয়াল ঘেঁসে চলুন—দেখবেন দেখবেন সাবধান গা ছড়ে যাবে কাপড় ছিঁড়বে, ওখানটায় মেলা সরু সরু লোহার গজাল—"

গোরার আর সহ্য হইল না, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"খুনেরে খুনে! জ্যান্ত ডাইনী! দোহাই বাবা গন্ধেশ্বরী, এ গোলকধঁাধার বৈতরণী পার করে নে যাও।"

বাস্তবিকই অন্ধকারে চোখে কিছু সুস্পষ্ট না দেখিলেও সেই বাড়ীর ভিতরে গৌর তাঁহাদিগকে যে রকম সব অত্যন্ত সরু আঁকা বাঁকা শুঁড়ি পথ ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং প্রায় প্রতি পাদক্ষেপেই একটা না একটা আশঙ্কার কথা জানাইয়া দিয়া সতর্ক করিতেছিল, তাহাতে সেই বাড়ীখানা একটা গভীর রহস্যের

আগার বলিয়াই সত্যব্রতের অনুমান হইল। কলিকাতার ভিতরে বহু আশঙ্কাজনক রহস্যময় স্থানের বিবরণ তিনি জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সে অঞ্চলে যে ওইপ্রকার কোন স্থান থাকিতে পারে ইহা তাঁহার আদৌ সম্ভবপর মনে হয় নাই। তিনি মনে মনে বাড়ীর অবস্থাটা একবার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, সহসা গৌরব আবার একটা মোড় ঘুরিয়াই বলিয়া উঠিল—

"এবার বৈতরণী পার, কোথাও লাগেনি তো আপনার ?"

সম্মুখেই একটুখানি ফাঁকা জায়গা, তারপরেই একটা ছোট বস্তি। দুই একখানি খোলার ঘরের ভাঙ্গা জানালা দিয়া আলো আসিতেছিল এবং মানুষেরও সাড়া পাওয়া যাইতেছিল। গোরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া কহিল—

"বাঁচলুম বাবা ধড়ে প্রাণ এলো, এখানটাতে থান দুই খোলার ঘর ছাড়া সবটাই ফাঁকা রাস্তা ছিল—কোন্ শালা এমন পথ আট্‌কে গোলোকধাঁধার বাড়ী করেছে রে ?

"শুনেছি এক খোট্টা বাবু করেছে, পাছে এ বস্তির ভাড়াটেরা পালিয়ে যায় তাই এখানে আসবার আর অন্য রাস্তা রাখেনি।"

বলিতে বলিতে গৌরব এঘর, সে ঘরের কানাচ দিয়া আঁকা বাঁকা সরু পথ ধরিয়া একটা মাঠ-কোঠার দিকে চলিল। অত

রাত্রেও বস্তি নিস্তব্ধ হয় নাই, কোথাও মাতালের জড়িত কণ্ঠস্বর, কোথাও কোন অশ্লীল গানের দু একটা ভাঙ্গা ছত্র, কোথাও ইতর রহস্যের আদান-প্রদান, আবার কোথাও বা মৃদু কলহের ঝঙ্কার উঠিয়া স্থানটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সত্যব্রত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখানে সব থাকে কারা ?"

"আজ্ঞে ভিখারীর বস্তিতে আর কি লোক থাকবে বলুন ?"

"ভিখারীর বস্তি—আশ্চর্য্য ?"

যেন আপনা আপনি কথাগুলা বলিয়া সত্যব্রত সম্মুখের দিকে অদূরবর্ত্তী একটা খোলা জানালার পানে চাহিয়া ঈষৎ থতমত খাইয়া গেলেন! তাঁহার মনে হইল যেন একখানা শ্মশ্রুগুম্ফ ঢাকা গৌরবর্ণ পুরুষের মুখ ধাঁ করিয়া সরিয়া গেল। জানালা হইতে ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, গৌরব ফিরিয়া চাহিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল—

"আজ্ঞে ভিখারীর বস্তি হলেও আপনাদের মত দু পাঁচজন দয়ালু বাবু ভায়ার পায়ের ধূলো মাঝে মাঝে পড়ে—"

সত্যব্রতের কর্ণমূল অবধি ঘৃণা ও লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। পিছন হইতে গোরা সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—" ও দেখে আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই, এ তো ওদের মামুলী পেশা, চলুন চলুন, আশ্চর্য্য যা—তা—"

গোরার কথা শেষ হইল না, হঠাৎ যেন আশে পাশের কোথাও হইতে একটা বিকৃত গোঙানীর শব্দ উঠিল এবং পরক্ষণেই সম্মুখস্থ একটা বড় ঝাঁকড়া গাছের ডালগুলা সশব্দে নড়িয়া উঠিয়াই একটা গুরুভার বস্তু পতনের শব্দ হইল। সকলেই এক সঙ্গে চমকাইয়া সেই দিকে চাহিল, গোরার মনে হইল যেন একটা বিদ্যুতের মত চকিতে পথ পার হইয়া পাশাপাশি দুইটা কুটীরের মাঝখানের সরু গলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে সত্যব্রতের গা টিপিয়া ইঙ্গিতে কি বলিতে গেল, সত্যব্রতও তাহাকে ইঙ্গিতে থামাইয়া আপনার গাত্রাবরণের ভিতরে হাত দিলেন। গৌরব তাঁহাদিগের এই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়াছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সে মহাভয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া সহসা তাঁহাকে সবলে দুই হাতে এমনি করিয়া জড়াইয়া ধরিল যে সত্যব্রত আর তাঁহার মনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলেন না, হাসিয়া কহিলেন—

"কি কি, এত ভয় কিসের ?"

প্রায় তাঁহার মুখের উপরে মুখ আনিয়া গৌরব কম্পিতস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—"বড় ভয় গো—বড় ভয় এখানে আর এক মিনিট নয়—শীগ্‌গির ভিতরে চল সেইখানে বলবো।"

"বেশতো ছেড়ে দেও, পথ দেখিয়ে আগে আগে চল।"

• "না বাবু তা পারবোনি, এমনি এস, শীগগির।" •

এই বলিয়া সত্যব্রতকে একরকম জড়াইয়া ধরিয়াই গৌরব যেন অত্যন্ত ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। গোরা কথা কহিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল। তারপর বাঁকা চোরা গলিপথে আরও তিন চারি খানি গৃহ অতিক্রম করিয়া একটা প্রকাণ্ড লাউ-মাচা বেড়িয়া গৌরব যখন সত্যব্রতকে লইয়া তাহার দোতলা মাটকোঠায় গিয়া পৌছিল তখন গোরা লাউমাচার বিপরীত দিকে পিছাইয়া পড়িয়াছিল। পাশেই কঞ্চির বেড়া ঘেরা একটুখানি বাগানের মত স্থানের সংলগ্ন একটা উঁচু খোলার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়া সরু আলোক রশ্মি আসিতেছিল, গোরার মনে হইল যেন সেইখানে পরিচিত কণ্ঠের চাপা স্বর শুনিল। সে ঘেঁসিয়া কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনুমানও মিথ্যা হইল না, কিন্তু সেই অদৃশ্য ব্যক্তিগণের ছাড়া ছাড়া কথার অর্থও যেমন সে বুঝিতে পারিল না, তাহারা যে কে তাহাও তেমনি স্থির করিতে পারিল না। কেবল একটা সন্দেহ তাহার হৃদয়ে ক্রমেই খরতর হইয়া উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে একটুখানি আশার রশ্মিও যে মনের ভিতর ঝিকমিক করিয়া উঠিল না—এমনও নহে। সে আরও একটু ঘরের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল সেই সময়ে সে শব্দও থামিয়া গেল এবং ওদিক হইতে গৌরবের কণ্ঠস্বর আসিল—

নরকের পথে

"কইগো বৈরাগী পিছিয়ে পড়লে কোথায়। আলো দেখাবো নাকি?"

গোরা ত্রস্তে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া আগাইয়া গিয়া গৌরবের ঘরের কাছে পৌঁছিয়া জবাব করিল—"না—তোমার রূপের জোছনা যে রকম বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়েছে তাতে আর আলো দেখাবার দরকার হবে না। কিন্তু বাড়ীময় কি ঝোপ-জঙ্গলরে বাপ—সাপে খায়নি যে এই সাত পুরুষের ভাগ্যি।"

কিন্তু গৌরব যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া মাটকোঠার দোতলার বারাণ্ডা ঘুরিয়া—সর্ব্বশেষের একখানি প্রশস্ত ঘরের ভিতরে লইয়া গেল, তখন ঘরের ভিতরে ইতস্ততঃ চাহিয়া গোরা প্রফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিল—

"মাপ্ কর্ ভাই—তোকে অনেক কটু বলেছি এ রকম, স্বর্গে আসতে গেলে অমন দশটা নরককুণ্ডুও পথে সাঁতার দেওয়া যায়, আঃ—বাঁচা গেল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রহেলিকা

বাস্তবিকই গৌরবের ঘরখানি যেমন পরিষ্কার তেমনি সুসজ্জিত। বিশেষ কোন রকম বড়মানুষী সাজ-সরঞ্জাম না থাকিলেও যে সকল আসবাব পত্র ছিল তাহাতে সেখানি ভিখারীর ঘর বলিয়া কিছুতেই বুঝিবার উপায় ছিল না।

ঘরের একপ্রান্তে একটি ঝক্‌ঝকে পালিস করা পালঙ্কের উপরে এক হাত পুরু দুগ্ধফেণণিভ শয্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বুক্‌কেশ, শেল্‌ফ, আলমারি, টিপয়, ছবি, আয়না, ঘড়ি, আনলা, বাঁধা হুঁকা, বৈঠক, গড়গড়া মায় পিকদানটী পর্য্যন্ত—যেখানে যেটি রাখিলে মানায় সেইখানে তেমনি ভাবে সজ্জিত থাকিয়া ঘরখানিকে যেমন জম্‌জমাট করিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি আবার রাশি রাশি পিতল কাঁসার বাসন হইতে কাচের গেলাস, ডিস্‌ জগ্‌, বাটী, পুতুল, খেলনা, গন্ধদ্রব্য, সাবান প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিলাসের ষোলকলা সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গোরা বহু ভিখারীর সুন্দর সুন্দর গৃহসজ্জা দেখিয়া অভ্যস্ত

হইয়া গিয়াছিল, তবুও তাহার মনে হইল যে—ভিখারীর কথা দূরে থাকুক—সহরের অনেক বিলাসিনীর ঘরেও তেমন ভাবে সুসজ্জিত দেখে নাই। পরিচিত সহজ সাধারণ আসবাব পত্র দিয়া কেমন করিয়া ঘর সাজাইয়া যে তাহার সৌন্দর্য্যে আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা যায়,সে বিদ্যায় গৌরবের অসাধারণ পণ্ডিত্য দেখিয়া গোরা যে শুধু মুগ্ধ হইয়া গেল এমন নয় তাহার মনে নূতন করিয়া সংশয় জন্মিল যে—এ নারীর জীবন প্রথম হইতেই কখনও এমন ভিক্ষাবৃত্তিতে অতিবাহিত হয় নাই, এবং সেই সঙ্গে তাহাকে ভাল করিয়া জানিবার আকাঙ্খা হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। সে একটু ইতস্ততঃ ভাল করিয়া দেখিয়া আবার কহিল—

"এতক্ষণে বুঝলুম গৌরব, কি গুণে তোমার বড় বড় বাড়ীর মেয়েমহলে এত পশার হয়েছে। যে এমন নরককুণ্ডের ভিতরেও এমন স্বর্গের শোভা ফুটিয়ে তুলতে পারে সে শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধরী, এ দুনিয়ায় তার অসাধ্য কাজ কিছু নেই।"

পালঙ্কের বিপরীত দিকে মেঝের উপর সুন্দর কার্পেট মোড়া পুরু গদীর ঢালা বিছানায় আড় হইয়া তাকিয়া ঠেশান দিয়া সত্যব্রত অন্যমনস্ক ভাবে একখানা ছবির পানে চাহিয়া কি চিন্তা করিতেছিল গোরার কথায় এতক্ষণের পর যেন তাঁহার হুঁস্ হইল। তিনি তাহাকে কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন—

"সত্যি, যে সকল স্থান দেখে এলুম তার তুলনায় এ স্বর্গপুরীই বটে। গৌরবের যে এমন সুন্দর ঘর তা স্বপ্নেও আমার মনে আসেনি।"

"এ সব তো আপনাদেরই চরণধুলোর জোরে বাবু। নইলে আমার মত কাঙ্গাল ভিখিরীর কি শক্তি যে—"

কথাটা শেষ না করিয়াই গৌরব স্বহস্তে তামাক সাজিয়া গড়গড়ায় বসাইয়া জরির নলটি সত্যব্রতের হাতে দিয়া পান সাজিতে বসিল। সুগন্ধি তামাকের মন-মাতানো গন্ধে ঘরখানি আমোদিত করিয়াছিল। তামাক পাইয়া তাঁহার ধড়ে যেন নূতন প্রাণ আসিল, গৌরবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, স্থান কাল অবস্থা ভুলিয়া পরম আরামে অর্দ্ধ নীমিলিত নেত্রে বিভোর হইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। গোরা তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিয়া গৌরব কহিল—

"কি বিদ্যাধরি, একজনকে তো স্বর্গে তুলেই সুধার ভঁড় হাতে দিলে আর একজনকে কি গলা শুকিয়ে মারবে নাকি? একসঙ্গে নিয়ে এসে ডুজনকে যদি এমন তফাত কর তা হলে কিন্তু এমন স্বর্গে আর কেউ আসতে চাইবে না।

কিন্তু গৌরবকে আর জবাব করিতে হইল না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গুল্লা হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"এখানে কি তফাৎ আছে বৈরাগী, সব সমান। একে তুমি পুরানো আলাপী

তায় তোমার দেখতায় বাবুকে পেয়েছি তোমার খাতির সবার আগে!”

“কই তার নমুনা তো দেখছিনি বাবা।”

“এই যে” বলিয়াই গুল্লা তাহার মলিন ছিন্ন বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা তার জড়ানো ব্রাণ্ডির বোতল বাহির করিয়া সম্মুখে বসাইয়া দিয়া কহিল “তুমি তো দাদা ওই আমাদের ছোটলোকের খাঁটীতে এগুতে চাওনা, তাই এর চেষ্টাতেই গিয়েছিলুম, কিন্তু এই আধখানার বেশী আর যে কোথাও পেলুম না ভাই—রাত অনেক হয়ে গেছে,কত ধস্তাধস্তি মারামারি করে এই খোলা বোতলটা জোর করে টেনে এনেছি—শালারা কি কিছুতে ছাড়ে,বলে একটা পাঁইট নিয়ে যাও, ওটা খুচরা খুচরা করে তিনগুণ দামে বেচবো। কিন্তু আমি কি সেই ছেলে—শালারা দোক্তার জল ঢেলে ঘরে পাঁইট করে রেখেছে—সেই ছাইভস্ম আনবো?

“সাবাস গুল্লা। দেখুন মশাই—ওস্তাদ কত বড়।”

বলিয়া গোরা উৎফুল্ল ভাবে বোতলটা একবার তুলিয়া দেখিয়া সজোরে বসাইয়া কহিল—“তবে আর দেরী কেন বিদ্যাধরি?”

সত্যব্রতের যেন বেশ একটু নেশার আমেজ জমিয়া আসিতে ছিল, ঈষৎ বিরক্তিস্বরে কহিলেন—“থাম থাম, হল্লা করোনা বন্ধু, ওর দাম পড়লো কত হে?”

“গুল্লা অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে জড়সড় হইয়া কহিল—“এজ্ঞে,

শালারা বলে ও জিনিষ খুচরা বেচে সাড়ে তিন টাকা হবে, তুমি আড়াই টাকায় পাঁইট নিয়ে যাও। আমি কিন্তু আড়াই টাকার বেশী দেব না।"

"না হে, এত রাতে যে জোগাড় করে আনতে পেরেছ এই ঢের, আর ঝগড়া ঝাঁটিতে কাজ নেই সাড়ে তিন টাকাই দিও।"

বলিয়া পুনরায় মনিব্যাগ খুলিতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা নোটের সঙ্গে সঙ্গে একটা গিনিও বাহির করিয়া ফেলিলেন। নোটখানা হাতে থাকিলেও গিনিটা বিছানার উপর পড়িয়া গেল। গৌরব কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া সেটা কুড়াইয়া হাতে তুলিয়া দিয়া হাসিয়া কহিল—

"এসব জায়গায় রাতভিতে অত টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে কি আসতে আছে বাবু? ভয়ের কারণ যদি কিছু ঘটে তা ও হতেই।"

সত্যব্রত হাসিয়া কহিলেন—

"সেইটেই তো দেখতে চাই যে লোকের কাছ থেকে গুণ্ডাতে কেমন করে মেরে ধরে লুটে নেয়?"

গৌরবের মুখখানা হঠাৎ যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল—কি কথা মনে পড়িয়া বেশ সুস্পষ্ট রকম কাঁপিয়া উঠিল। গোরা হাসিয়া জিজ্ঞাসিল—

"কি বিদ্যাধরি, অমন শুকিয়ে কেঁপে উঠলে যে, এ স্বর্গেও দৈত্যের ভয় আছে নাকি?"

"চুপ্ চুপ্ যে কাণ্ড আসবার সময় আজ স্বচক্ষে দেখেছি—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বল্‌তো সে কোন্ শালা—ব্যাপারখানা কি ?"

গৌরব কম্পিত হস্তে নূতন প্রস্তুত কলিকাটা গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া দিয়া উভয়ের কোল ঘেঁসিয়া বসিল, তারপরে আতঙ্কিত কণ্ঠে ফিস ফিস্ করিয়া সত্যব্রতকে কহিল—

"না বাবু তোমার ব্যাগ-ট্যাগ আর বার করোনা—টাকাকড়ির কথা মুখে এনো না। আজ যা দেখেছো ওই রকম যেদিন দেখা যায় সেই রাতেই এ বাড়ীতে একটা না একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়। সবাই বলে একটা দানো আর ডাইনী ওই গাছে আছে, সেদিন অমনি কচি ছেলের মত গোঙনীর আওয়াজ ওঠে তারপরেই গাছ নাড়াদিয়ে দানোটা ধপ্ করে নামে আর সারারাত এ বাড়ীময় বিষম কাণ্ড করে বেড়ায়। আজ আব এ বস্তির কেউ রাতে প্রাণ গেলেও দোর খুলবে না।"

গোরা এবং সত্যব্রত উভয়েই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু গুল্লা মুখখানাকে খুব বেশী রকম ভয়ের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া গৌরবকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ আবার তেমনি দেখা গেছে নাকি ?"

"ওরে একেবারে আমাদের সাম্‌নে, আর একটু হলেই আমার ঘাড়ে পড়েছিল আর কি, ভাগ্যি বাবু ছিলেন তাই জান বাঁচিয়ে এয়েছি।

"যাক ও সব কথা কওয়া ভাল না—চুপ্ চাপ করে গেলাস-টেলাস বার কর।"

সত্যব্রত উভয়ের আতঙ্ক দেখিয়া ভরসা দিয়া কহিলেন—

"আচ্ছা, আমরা আজ এখানেই রাত কাটিয়ে সকালে যাব তা হলে তো আর ভয় থাকবে না, এখন তোমরা আরম্ভ কর।"

গৌরব ও গুল্লা উভয়েই যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া মদ্যপানের সরঞ্জামগুলি বাহির করিল। গৌরব ক্ষুন্নভাবে কহিল—"আমরা তো বেশ স্ফূর্ত্তি করছি, কিন্তু আপনি যে শুধু তামাক টেনে—"

"কোন ভাবনা নেই তোমার। তামাকেই আমার বেশ গুলজার হয়ে আসছে—এমন তামাক তো কলকাতায় আমরা খুঁজে পাইনি।

"আজ্ঞে ও যে খাস বিষ্ণুপুরের চল্লিশটাকা ভরির মৃগনাভি আরও কি কি সব মশলা দেওয়া, ও তামাক এখানে কোথায় পাবেন? ও জিনিস বিষ্ণুপুরের রাজার জন্যে মাসে একবার করে তোয়ের করে। আমার বোনাই সেই তামাকের আড়তে কাজ করে কি না—তাই মাসখানেক আগে আমার জন্যে পোয়াটাক এনে দিয়েছিলে। তা আমিতো খাইনা—ও সেই তামাক!"

গৌরব সঙ্কুচিত ভাবে জবাব করিল—"বাবু দয়া করেছেন

বটে, কিন্তু ওনার স্মুখে কি খেতে পারি, আমাদের খাঁটী ওই দেখ।"

"তা চলবে না—একসঙ্গে বসে খেতে হবে চাঁদ, উনি তো চোখ বুজিয়ে আরামে ধুঁতরা ফুল দেখছেন। স্বচ্ছন্দে খাও বাবা।"

"হাঁ—হাঁ—গো—উঃ—তো—মরা—চালাও—চোখ বুজিয়ে আছি—চাঁ—আঁ—আঁ—দ, খালি—মাঝে—মাঝে—তামাক—টা—টা—পালটে—দি—ই—ই—ই—ও।"

বলিতে বলিতে সত্যব্রত ঈষৎ চোখ খুলিয়াই পুনরায় মুদ্রিত করিলেন। গোরা আর একমাত্রা খাইয়া লইয়া কহিল—"শুন্‌লে তো বাবা, এবার চালাও, নিয়ে এস, আমি ঢেলে দিচ্ছি।"

"না না আমি," বলিয়া গৌরব বোতল পাড়িয়া একটি ক্ষুদ্র গেলাসে ঢালিয়া গুল্লাকে প্রদান করিল। গুল্লা পান করিয়া কহিল—

"খাসা মাল একেবারে নির্জলা, একটু চাক্‌বে বৈরাগী?"

"আরে দূর তোর খাঁটী—চিনিস্ না বৈরাগীকে, ওই দেখ্‌ছিস্ তো—অমন ভয়ানক ব্রাণ্ডী তাই জল না দিয়ে—"

"কি বাবা একি পেঁচি পেয়েছিস যে পান্তা করে খাব।"

বলিতে বলিতে গোরা আবার একপাত্র ঢালিয়া পান করিল।

গুল্লা তাহার পানে চাহিয়া কহিল—"তোমার খুব নেশা হয়েছে বৈরিগী, আর খেও না—চোখ মুখ বুঝে যাচ্ছে।"

গোরা মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া কি বলিতে গিয়াও স্পষ্ট করিয়া কথা বলিতে পারিল না, চোখ দুটো জবার মত লাল হইয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে অতি কষ্টে বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করিয়া আর একপাত্র ঢালিয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নীচে হইতে কাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আসিল—গোউর—গোউর—"

গৌরব অত্যন্ত আতঙ্কে কাঁদিয়া কম্পিত স্বরে কহিল—

"ওই গো—সর্ব্বনাশ—কি হবে?"

গোরা একবার বিস্ফারিত চোখে চাহিল,তারপর কি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও পারিল না, কেবল একটুখানি অস্পট বিকৃত ধ্বনি মাত্র বাহির লইল। সহসা সে প্রবল চেষ্টায় হুড়মুড় করিয়া উঠিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঘরের বাহিরে ধপ্ ধপ্ করিয়া জোরে পদশব্দ হইল। গোরা দরজার দিকে সবেগে যাইতে গিয়াই ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বাভাবিক গোঁ গোঁ শব্দ উঠিল।

শব্দে চমকাইয়া সত্যব্রত অতিকষ্টে চোখ ঈষৎ মেলিলেন, তাঁহার মনে হইল যেন কতকগুলি অন্ধকার ছায়ার মূর্ত্তি ঘরেব ভিতরে নাচিয়া বেড়াইতেছে। সবেগে উঠিতে গেলেন কিন্তু

হাত-পা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড়ের মত বোধ হইল। পরক্ষণেই তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল দেহের উপর অত্যন্ত গুরুভারের সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত যাতনা অনুভব করিতে কারতে অল্প কালের ভিতরেই সংজ্ঞা হারাইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংশয়

যখন সংজ্ঞা ফিরিল তখন সত্যব্রত আপনার বাসার কক্ষে খাটের উপর শায়িত ছিলেন। সন্ধ্যার বেশী দেরী ছিল না— পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া ম্লান রবির কিরণ ঘরের ভিতর আসিয়া, তাঁহার পায়ের কাছে বিছানার উপরে পড়িয়াছিল এবং ঠিক তাহার পাশে বসিয়া পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য "কালো" তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। সত্যব্রত কষ্টে চক্ষু মেলিয়া একবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিলেন। অমনি কালো আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—

"বাবু—বাবু—ঘুম ভাঙ্গলো আপনার? উঃ কি কাণ্ড—কি ভয়ই আমরা পেয়েছিলুম কাল সারারাত—আজ সারাদিন ধরে কি ভাবনাটাই ভাবিয়েছেন, যাক্ ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে রক্ষা পেয়েছেন এই ঢের।"

সত্যব্রত যেন তাহার কথার ভাব বুঝিতে পারিলেন না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে চাহিতে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেন—হয়েছে কি—কি করেছি আমি?"

কালো চোখ ছুটো বিস্ফারিত করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে কহিল—

"কি হয়েছে, কি কাণ্ড করেছেন মনে পড়ছে না—এখনো ঘোর কাটেনি বুঝি? আচ্ছা উঠুন, আমি ধরছি, এইখানেই জলটল মজুত রেখেছি—মুখ চোখ বেশ ভাল করে ধুয়ে ফেলুন, তারপর চা খেয়ে বারাণ্ডায় এসে বসুন, আমি তেল মাখিয়ে মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছি। ডাক্তার বাবু তাই কর্‌তে বলে গেছেন।

"ডাক্তার,—ডাক্তার কিসের জন্য?"

"ডাক্তার কিসের জন্যে জিজ্ঞেসা কর্‌ছেন? আচ্ছা কাল সন্ধ্যের আগে সেই যে বেরিয়েছিলেন সারারাত কোথায় ছিলেন বলুন তো? ছেলেবেলা থেকে মানুষ করলেম, আপনার তো ও সব রোগ কখন দেখিনি, ওই ভয়েই যার মা-ঠান আপনাকে কল্‌কাতায় আস্‌তে দিতে চান নি। বিয়ে-থা কল্লেন না—কল্লেন

না, কিন্তু চাকুরি করবার দরকারটা কি? মা-ঠান আমাকে পিত্যয় করে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে আছেন, শেষ কি এই সহরে বেঘোরে প্রাণটা দেবেন, না বাবু, আর আপনার পুলিশের চাকরিতে দরকার নেই, ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়ে নে যেতে পারলে রক্ষা পাই।"

কালো আবেগভরে আপনা-আপনি বকিতে বকিতে স্বহস্তে সত্যব্রতের মুখ ধোয়াইয়া দিয়া—চায়ের জল গরম করিতে বসিল। তাহার কথার ভাবে সহসা সত্যব্রতের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইয়া গেল, একে একে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা পরম্পরা মনে পড়িল, কিন্তু নানাপ্রকারে মাথা ঘামাইয়াও শেষের ব্যাপারটা কিছুতেই পরিষ্কার হইল না। একটুখানি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"হ্যারে আমি বাড়ী এলুম কখন—কেমন করে?"

কালাচাঁদ ষ্টোভের আগুন নিবাইয়া চায়ের পাত্রে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জবাব করিল—

"তবু যা হোক স্মরণ হয়েছে, বলি এসব রোগ তো কখনো আপনার ছিল না—"

"নে থাম্—কি হয়েছে বল্?"

বাহিরে পদশব্দ হইল, কালো চা প্রস্তুত করিতে করিতে কহিল—

"আর আমার বলার দরকার নেই—ওই ওনারা আস্‌ছেন, সব শুন্‌তে পাবেন 'খন। ভদ্দর লোকেরা আজ তিনবার খবর নিয়ে গেছেন, আর ডাক্তার বাবুও—"

কথা শেষ হইল না,—"কিরে কালো খবর কি, বাবু সেরেছেন?" বলিতে বলিতে স্বয়ং ডাক্তার বাবু একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়াই সত্যব্রতকে দেখিয়া, হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি হুজুর, মেজাজ সরিফ?"

"তাই তো—কি ব্যাপার তোমার, বল ত সত্যব্রত? একটা আরজেণ্ট কেস তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু তিনবার তোমার খবর নিতে পাঠিয়েছেন।"

কলিকাতায় এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন সত্যব্রতের অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্য কেহ ছিল না। বাসায় স্ত্রীলোক কেহ ছিল না বলিয়া ইহারা সর্ব্বদাই নির্ব্বিবাদে যাতায়াত করিতেন। সত্যব্রত পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি ব্যাপার বল তো রমেশ, আমায় এখানে আন্‌লে কে? রাত প্রায় দু'টো পর্য্যন্ত মনে ক'রে বলতে পারি একজনের ঘরে শুয়ে শুয়ে তামাক টানছিলুম, তারপর আর কিছু মনে নেই।"

ডাক্তার বাবু একবার রমেশবাবুর পানে অর্থসূচক কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি মদ খেয়েছিলে বোধ করি?"

"আমি কি এ্যালকোহল ছুঁই—জান না তোমরা ?"

"কিন্তু তোমার মুখ—কাপড়-চোপড়—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তীব্র ধেনো মদের গন্ধ বার হচ্ছিল।"

"এঁ্যা বল কি ?"

"শুধু তাই নয়—এই কালীবাবুকে জিজ্ঞাসা কর—প্রায় মর্বার দাখিল হয়েছিলে, উনি বলেন কেউ পয়জন্ (poison) করেছিল।"

"নিশ্চয়, তার আর ভুল নেই, আমি আগে ভেবেছিলুম যে মদের সঙ্গে খাইয়াছে, কিন্তু শেষে ঔষধের ক্রিয়া দেখে সে ধারণা আমার গিয়েছিল, তাও আপনাদের বলেছি। এখন বুঝতে পারছি—ওই তামাকের সঙ্গেই—"

সত্যব্রত শিহরিয়া উঠিলেন, একটু ভাবিয়া কহিলেন—

"এখন মনে হচ্ছে তামাক টানবার পর থেকেই একটু যেন নেশার আমেজ বেশ জমাট বেঁধে আসছিল, দু-তিন ছিলিম টান্বার পর বেশ গভীর তন্দ্রা। নড়বার চড়বার ইচ্ছা ছিল না—দেহ একেবারে এলিয়ে পড়েছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর আর ঠিক মনে হয় না—যেন কি একটা স্বপ্ন—যেন কেমন একটা—"

"এ সেই বিষের ক্রিয়া। ভাগ্যে যথাসময়ে আপনারা পেয়ে-

ছিলেন, নইলে আর ঘণ্টা কতক কাট্‌লে বোধ করি কাণ্ড শক্ত দাঁড়াতো।”

“সে কেবল ওঁর পুণ্যের বল, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে রাস্তার ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, ভোর বেলায় বিটের কনেষ্টবল মাতাল ভেবে ঝোলায় করে তাদের থানায় নিয়ে যায়। সর্ব্বাঙ্গ কাদা মাখা, সার্টের বোতাম একটাও নেই—পকেট একেবারে খালি—জুতো দু-পাটী রাস্তার দু' জায়গায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বিকট ধেনো মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল, এই অবস্থায় সে তোমায় পেয়েছিল। সকাল বেলা তাদের থানার ইন্‌স্‌পেক্টার তোমায় চিন্‌তে পেরে আমাদের থানায় খবর দেন। আমরা তখনি গিয়ে তোমায় এখানকার থানায় নিয়ে আসি। তারপর চৈতন্য করবার জন্য ঢের চেষ্টা করেও যখন পারা গেল না—সেই সময়ে হঠাৎ ডাক্তার বাবু থানার সাম্‌নে দিয়ে ‘কলে’ যাচ্ছিলেন। উনি শুনেই সে ‘কল’ বন্ধ করে গাড়ী থামিয়ে নেমে এলেন, পরীক্ষা করে বল্লেন বিষের ঘোরে আচ্ছন্ন রয়েছে! ইন্‌স্‌পেক্টার বাবু তখনি কলেজে পাঠাবার ব্যবস্থা করছিলেন, কেবল উনি তাঁকে বলে কয়ে বুঝিয়ে তোমায় ঘরে এনে নিজে প্রাণপণে সুশ্রূষা করেছেন। পুলিশে তোমার সুনাম যথেষ্ট আছে —সকলেই সম্মান করে। তোমার এ ব্যাপারে এই দু' থানাতেই হুলস্থুল পড়ে গেছে। সেখানে এন্‌কোয়ারীতে তোমার জুতো

দু'পাটী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। সকলেই তোমার সুস্থ হয়ে উঠবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল বল দেখি ?"

সত্যব্রতের মুখ চিন্তায় আচ্ছন্ন হইল, ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমার সে জামা, জুতো কাপড় চোপড় থানায় কি ?

"না এখানেই সব আনা হয়েছে, তুমি আরাম হ'লে তোমাকে না দেখিয়ে ইনিস্‌পেক্‌টার বাবু সাফ্ করতে মানা করে দেছেন বলে, ঠিক তেমনি অবস্থাতেই আছে।"

"কই সেগুলো—দেখি ?"

কালাচাঁদ একধারে দাঁড়াইয়া সকল কথাবর্ত্তা শুনিতেছিল, আজ্ঞা মাত্র সেগুলি লইয়া গিয়া সম্মুখে ধরিল। সত্যব্রত সেগুলি উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কনেষ্টবল এগুলো সব এই রকম অবস্থাতেই কি পেয়েছিল, ভতরে কি কিছু ছিল না ?"

"এই রকম তো তারা বলে।"

সত্যব্রত সেগুলি নীচে ফেলিয়া দিয়া জুতা জোড়াটা তুলিয়া লইয়া দেখিয়াই ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

"শালারা নেহাৎ পেঁচি, ছোট লোক কোকেন খোর, আর

সব শালাই মেড়ো, যা হোক্ তাদের কাঁধে চড়ে আসাটুকুই লাভ, হিঁচ্‌ড়ে টেনে ফেলে দিয়ে যায় নি যে এই যথেষ্ট।"

রমেশ আশ্চার্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোকেন ধর্‌তে কি মেড়োদের গুণ্ডার দলে গিয়েছিলে নাকি ?"

"না হে না, তবে শুন।"

সত্যব্রত একবার চোখ বুজিয়া আড়াগোড়া ব্যাপারটা একবার মনে মনে আলোচনা করিয়া লইলেন পরে সকল ঘটনার কথা একে একে ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিলেন—

"ব্যস্ আমার জ্ঞান এই পর্য্যন্ত, তারপর যে কি হয়েছে তা আর কিছুই জানিনি, প্রথম চোখ মেলেছি এই ঘরে তোমরা আস্‌বার ঠিক আগেই।"

সত্যব্রতের ইতিহাস শুনিয়া সকলেই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপরে রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তারা যে কোকেন খোর মেড়ো তা কেমন ক'রে বুঝলে, আর তোমায় যে মড়ার মত তারা কাঁধে ব'য়ে আস্তে আস্তে রাস্তার ধারে শুইয়ে রেখে গেছে তাই বা টের পেলে কেমন করে ?"

সত্যব্রত ঈষৎ হাসিয়া জবাব করিলেন—"কালী এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সাজ তো, কিন্তু তুমি পুলিশ হ'য়েও এ প্রশ্ন

করছো? এর প্রমাণ তো জুতো জামার উপরে স্পষ্ট লেখা রয়েছে হে।"

"সে কি, থানার সকল লোকেই ওগুলো খুব ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখেছে, কিন্তু কেউ তো অমন সন্দেহ করে নি!"

'যা এত খুব সহজেই বোঝা যায় এরা যদি তেমন বড় গোছের জবরদস্ত দল হ'ত তাহ'লে আমার জামার সোণার বোতাম, মনিব্যাগ প্রভৃতি চুরি করতো না, এরকম সামান্য জিনিস দেখে পেঁচি ছিঁচ্‌কে চোরেরই লোভ হয়, আর প্রায় দেখা যায় যে গুলিখোর, কোকেন খোর প্রভৃতি লোকেরাই ওই রকম ছিঁচ্‌কে চোর হ'য়ে থাকে। ও অঞ্চলে কোকেন খোরেরই প্রাদুর্ভাব বেশী—আর তাদের বেশীর ভাগই হিন্দুস্থানী মেড়ো—এ সেই কোকেন খোর মেড়োদেরই কাজ, তা'ছাড়া আরও প্রমাণ আছে। কোকেন খোরেরা সর্ব্বদাই পান খায় আর কস্ ব'য়ে পানের পিচ্ গড়িয়ে পড়ে, আমার জামাতে অনেক যায়গায় তার দাগ লেগেছে। আর যে কাঁধে ব'য়ে নিয়ে এসেছে তারও একটা ঐ হেতু, তা'ছাড়া জুতোতে আমার কাদার দাগ কোথাও নেই—আর যদি বল যে জুতো পায়ে ছিল না, তাহলেও হাঁটিয়ে আনলে পায়ের আঙ্গুলের গলিতেও কোথাও না কোথাও ঈষৎ কাদার দাগ থাক্‌তোই। কারণ আমার তেমন মর-মর অজ্ঞান অবস্থায় কালো যে সর্ব্বাগ্রে ধীরে সুস্থে ভাল করে আমার পা

ধুইয়ে আঙ্গুলের গলির ভিতর পর্য্যন্ত ঘসে মেঝে সাফ করে মুছিয়ে তারপরে শুইয়ে দেছে—তাও সম্ভব নয়, আর টেনে হিঁচ্‌ড়ে আন্‌লে অন্ততঃ গায়ে না হোক জামাতেও তার কিছু না কিছু চিহ্ন থাক্‌তো। সুতরাং তারা যে সাবধানে কাঁধে ব'য়ে এনে রাস্তার ধারে শুইয়ে দিয়ে গেছে—তা নিশ্চিত। তা'ছাড়া আরও এমন সূক্ষ্ম প্রমাণ ঢের আছে যে আমার ধারণা মিথ্যা নয়। এ বদ্‌মায়েস্‌ গুণ্ডার দলের আস্কারা করতে আমায় বেশী বেগ পেতে হবে না—এ তোমরা নিশ্চয় জেনো।"

ডাক্তার বাবু বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিলন—

"আশ্চর্য্য—এখন এ সকল তো অতি সহজ বোধ হচ্ছে, আমি যে পুলিসের লোক নই—তবুও এ হেতু গুলো ঠিক মনে হচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণ পর্য্যন্ত তো আর কেউ কিছুমাত্র ঠিক করতে পারলেন না।"

"তা'হলে তো সবাই ওর মত পাকা গোয়েন্দা হতে পার তো।"

বলিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল—

"এখন করবে কি ?"

"আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হ'তে আজ রাত্রিটাও যাবে, তার আগে আর আমার কিছু করবার শক্তি হবে না, আমি কাল সকালে গিয়ে যুক্তি স্থির করবো। তুমি ভাই এখনি থানায় গিয়ে

বল—সেই হুদ্দোর পুলিশ সেই বস্তি নজর-বন্দি রাখুক, যদি গৌরব বা গুল্লাকে পায় তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করবে, কারও কোন রকম সন্দেহজনক ভাব দেখলেই ধরবে। গোরার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে চাই, তারপর আমার নিজের কথা। সে বেচারাকে আমি মদ খাইয়েছি, জানি না তার অবস্থা কি, তাই ভেবে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কফিখানা

সত্যব্রত উপস্থিত মত সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কিছুই হইল না। পুলিশ সেই রাত্রি হইতেই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল—এমন কি, সে অঞ্চলটা চষিয়া ফেলিল বলিলেও হয়, কিন্তু শুধুই যে অপরাধীগণের সন্ধান পাইল না এমন নয়, গোরারও চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাইল না। সত্যব্রত অপরাধীগণের সম্বন্ধে অমনিতরই আশা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গোরার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহার সম্বন্ধে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি সকল কার্য্য ছাড়িয়া কেবল তাহার অন্বেষণেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে সন্ধান পাওয়া তো দূরের কথা—গৌরবের অত জিনিষ পত্রে ভরা সুন্দর, সুসজ্জিত ঘরখানির যে অবস্থা সকাল বেলা গিয়াই প্রথমে প্রত্যক্ষ করিলেন তাহাতে আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের খেলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বস্তির ভিতরে সে মাঠকোঠা ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া আছে

কিন্তু সুন্দরীর সেই সুসজ্জিত ঘরখানি একেবারে ফাঁকা পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছে! আসবাব পত্র দূরের কথা দেয়ালের গায়ে একটা পেরেক পুতিবার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। মাসখানেকের ভিতরেও যে সে ঘরে কেহ বাস করিয়াছে এমনও মনে হয় না। অথচ অর্দ্ধরাত্রি এবং একটা দিনের মাত্র ব্যবধান! এই পনেরো ষোল ঘণ্টার ভিতরে লোক চক্ষুর অন্তরাল দিয়া তাহারা যে কেমন করিয়া সেই বিরাট গৃহ-সজ্জার চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া লোপ করিয়া দিয়া গেল তাহা কিছুতেই ভাবিয়া না পাইয়া সত্যব্রত একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। অতঃপর কি সূত্র ধরিয়া কোন পথ দিয়া যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন, তিনি তাহা সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না—পুলিশও চার পাঁচ দিন ধরিয়া ক্রমাগত নিস্ফল হইয়া পরিশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া সত্যব্রতরই উপরে নির্ভর করিয়া রহিল। সত্যব্রতও এদিকে একটা অদ্ভুত রকমের নূতন ব্যাপারের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সেই দিকেই আপনার সকল শক্তি, দক্ষতা ও মনোযোগ সমর্পণ করিয়া দিলেন।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, বিকাল হইতেই এক পসলা বৃষ্টি সুরু হইয়া কলিকাতার রাস্তা কাদায় অগম্য করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষ করিয়া মুসলমান পল্লী এবং বস্তিগুলির ভিতরকার পথের তো কথাই নাই। সন্ধ্যার দিকেও বৃষ্টি না থামিয়া—রাত্রির

সঙ্গে সঙ্গে—যেমন টিপ্-টিপিনী বাড়িয়াই যাইতেছিল আকাশে মেঘও তেমনি একটু একটু করিয়া জমাট বাঁধিয়া ক্রমেই দুর্য্যোগের আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিল। আটটা না বাজিলেও রাস্তায় লোকের যাতায়াত খুবই কমিয়া আসিয়াছিল।

তেমনি সময়ে স্থরতি বাগানের ভিতর বড় রাস্তার ধারে একটা ছোট, জীর্ণ তেতালা বাড়ীর রাস্তার ধারের নীচেকার কাফিখানায় এক ভদ্রবেশধারী বলিষ্ঠ মুসলমান যুবক ভিজিতে ভিজিতে একগাছা মোটা লাঠি হাতে করিয়া প্রবেশ করিল।

কফিখানা বলিলে যা বুঝায়—এ কফিখানা ঠিক তেমনতর নয়, বরং শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের হোটেল বলিলেই মানায় ঠিক। কারণ বাহিরের দোকানখানায় কেবল কফি ও চা বিক্রয় হইলেও, সেখানে কি যে না পাওয়া যাইত তাহা বলা কঠিন। যাহারা পরিচিত খরিদ্দার তাহারা মুসলমানের হোটেলের উপযোগী সকল প্রকার খানাতেই যে কেবল উদর পূর্ত্তি করিতে পাইত এমন নয়—সেইখানে বসিয়াই তাহাদের সর্ব্বপ্রকার পান-ভোজন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও চলিত। তাহা ছাড়াও এই বাড়ীখানার দ্বিতল ও ত্রিতলের কক্ষগুলিতে সময়ে সময়ে অস্থায়ী ভাড়াটিয়ারও আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া প্রায় সারারাত্রি পর্য্যন্ত যে প্রকার সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমজীবি ও আপামর জন সাধারণের

জটলা বাঁধিয়া উঠিত, তাহাতে নিরীহ পথিককুল কিছুতেই নিঃশঙ্কচিত্তে সে পথ দিয়া যাতায়াত করিতে সাহস করিত না।

এ সকল ছাড়াও বাড়ীখানাতে আর একটা এমন আকর্ষণ ছিল যে প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর শুষ্ক মূর্ত্তি—বিকৃত চেহারা কুব্জ দেহ, কোঁঠরগত চক্ষু কতকগুলি বৃদ্ধ এবং প্রায় তদনুরূপ যুবকগণকে নিজ নিজ মুখের সাম্‌নে হাতে তুড়ি দিয়া ক্রমাগত হাই তুলিতে তুলিতে প্রবেশ করিতে দেখা যাইত। ইহাদের ভিতরে চীনার সংখ্যাই বেশী থাকিলেও, মুসলমান এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরও অভাব ছিল না, এবং মাঝে মাঝে ভদ্রবেশধারী হিন্দুস্থানী যুবক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গেরও আবির্ভাব হইত। ইহারা দোকানে প্রবেশ করিয়াই—এক প্রান্তের অন্তরালযুক্ত একটা বিভিন্ন পথ দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইত। এই পথের মুখে বাহিরের দোকান ঘরে বসিয়া যেমন এক ভীষণাকৃতি যমদূতের মত কাফ্রী জাতীয় ব্যক্তি দোকানদারী করিত, ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারেও তেমনি একজন যুবক হামেসা উপস্থিত থাকিয়া আগন্তুকগণের অভ্যর্থনা করিত। যাহারা উপর তলায় ভাড়াটিয়া থাকিত তাহাদিগের গমনাগমনের জন্য রাস্তার উপর হইতে পৃথক পথ থাকিলেও, উপরে যাইবার সিঁড়ি এমন স্থানে ছিল যে মগ যুবকের চক্ষু এড়াইয়া কেহই সেখান দিয়া যাতায়াত করিতে পারিত না।

যুবক প্রবেশ করিয়াই কাফ্রী দোকানদারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চোখে চোখে কি ইঙ্গিত করিল। তাহার পায়ে জরির ফুলতোলা নাগরা, পরণে মূল্যবান রেশমী লুঙ্গী, দেহে আদ্ধির পাঞ্জবী, মাথায় সাদা দোপাট্টা টুপী। এতভিন্ন পরিচ্ছদের আর কোন বাহুল্য না থাকিলেও, এবং বাঙ্গালীর মত মুণ্ডিত শ্মশ্রু হইলেও, তাহাকে দেখিলেই কলুটোলার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার বলিয়া মনে হয়। দোকানদার একবার মাত্র তাহার পানে চাহিয়াই সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া, ভিতরে যাইবার প্রবেশ পথ দেখাইয়া নিম্নস্বরে কহিল—"ইধার সে আইয়ে হুজুর।"

যুবক আর কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া অন্তরালযুক্ত ভিতরের পথে প্রবেশ করিল। পথের শেষে কক্ষদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র সেই মগ-যুবক শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া সিঁড়ির পাশ দিয়া নিঃশব্দে আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল এবং দুইটা সরু, বাঁকা, অন্ধকার দালান পার হইয়া, একটা অত্যন্ত নীচু, ক্ষীণ আলোকিত, দুর্গন্ধময় কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া কাঁসার আওয়াজের মত কণ্ঠস্বরে মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"চার আনা, আট আনা, কি রুপেয়া-ওয়ালা হুজুর?"

"আবিতো আট—আনা-ওলা দেও, দেখে—হামরা দোস্তকো হিঁয়াপর মিলে তো পিছু ফিন দোঠো রুপেয়াওয়ালাকা জরুরৎ হোয়ে গি।"

"বহুত খোস্ হুজুর, তাঁবেদার উও সিঁড়িকা পাশ কেওয়াড় পর হামেসা হাজির হ্যায়।"

বলিয়া, তাহার হস্তে একটা লম্বা বাঁশের নল এবং শালপাতায় বাঁধা কোন দ্রব্য দিয়া, পুনরায় সেলাম করিয়া কহিল—"ভিতর মে যাইয়ে, হুয়াই আগ্-উগ্—মউজকা সরাঞ্জাম কুল তিয়ার হ্যায়।"

যুবক আর বাক্যব্যয় না করিয়া সেই মহাধুম পানের সরাঞ্জাম দুইটা হাতে লইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। কক্ষটী ধোঁয়ায় এমন আচ্ছন্ন যে কোথায় কি আছে তাহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। শীতের ভোরের নিবিড় কুয়াশায় ক্ষীণ দিবালোক যেমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই গভীর দগ্ধ আফিমের দুর্গন্ধময় জমাট ধূমে কক্ষ মধ্যস্থ ক্ষীণ আলোকও তেমনি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে কেবল একটানা ফিস্ফাস্ কথার শব্দ এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধারাবাহিক একঘেয়ে ধ্বনি ভিন্ন আর শব্দমাত্র ছিল না। তাহাও এমনি অস্বাভাবিক বোধ হইতেছিল যে মধ্যরাত্রে শুব্ধ, নির্জ্জন কবরখানার, সহস্র সহস্র প্রেতকুলের হাহাকারপূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাসের মত একটা বিষম জমাট থম্থমে ভাবের অবতারণা করিতেছিল।

যুবক কষ্টে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। মাঝখানে সরু পথ, তাহার উভয় পার্শ্বেই বরাবর লম্বা

কাঠের পাটাতন, তাহার উপরে যে কি প্রকারের আস্তরণ বিছান ছিল—তা বুঝিবার উপায় নাই। এবং তাহাদের উপরে সারি সারি ছায়ার মত গড়া গড়া যাহারা নিস্পন্দভাবে পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে—এখানে-ওখানে—একটুখানি ক্ষীণ অগ্নি জোনাকির মত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিয়াই নিবিয়া যাইতেছিল।

দুর্গন্ধে যুবকের মাথা ভার হইয়া উঠিল, গা বমি বমি করিতে লাগিল, অসহ্য সর্ব্বাঙ্গে যাতনা বোধ হইল, তবুও সে উভয় পার্শ্বেই উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে আগাইয়া চলিল। একস্থানে একটা উঁচু জায়গার উপরে মাটীর গামলায় কাঠের আগুন গন্ গন্ করিতেছিল। তাহার ঠিক উপরেই একটা আলো টাঙ্গানো এবং তাহার নীচে বসিয়া এক অদ্ভুত দর্শন বৃদ্ধ মুসলমান কুঁজো হইয়া ঝিমাইতেছিল। তাহার হাতের নলটী কোলের উপর পতিত, চক্ষু জ্যোতি বর্জ্জিত, এবং দেহ নিস্পন্দ। হঠাৎ দেখিলে জীবিত বলিয়া বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না।

যুবক বৃদ্ধের পাশ দিয়া আগাইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার জামায় টান পড়িল। সে চমকাইয়া চাহিয়া বুঝিতে পারিল না যে কে টানিল, বৃদ্ধ তেমনি নিস্পন্দ-নীবব। যুবক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আবার যাইতে গেল হঠাৎ যেন তাহার পায়ের নীচে হইতে অত্যন্ত মৃদু ফিস্ ফিস্ কণ্ঠস্বর উঠিল—"ঠোঁট বুজিয়ে

থেক—খবরদার, একটু এগিয়ে চলে গিয়ে ফিরে চেও, তারপর বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করো।”

কে সে, কাহাকে বলিল তাহা না বুঝিলেও যুবকের মনে কেমন একটুখানি সন্দেহ জাগিল, কিছুদূর নিঃশব্দে আগাইয়া সে একবার পিছন ফিরিয়া বৃদ্ধের পানে চাহিল। সেই মুহূর্ত্তে সেই ক্ষীণ আলোকেও যাহা দেখিল তাহাতে গভীর বিস্ময়ে অতর্কিতে যে একটুখানি অস্ফুটধ্বনি তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল তাহা দমন করিতে তাহার সমস্ত দেহের শক্তি নিয়োজিত করিতে হইল। পরক্ষণেই সে প্রফুল্ল ভাবে আবার ফিরিয়া বৃদ্ধের পাশ কাটাইয়া গেল এবং হাতের নলটা পার্শ্বস্থ শায়িত একব্যক্তির কাছে ফেলিয়া দিয়া দ্রুত কক্ষত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অজ্ঞাত খুন

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির বিরাম ছিল না, রাস্তায়ও লোক চলাচল একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুবককে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, মিনিট পাঁচেক পরেই বৃদ্ধ মুসলমান আসিয়া মিলিত হইল এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"এখনও নয়, আরো খানিক এগিয়ে বালাখানার মোড় পার হয়ে মুখ খুলো।"

যুবক গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া কুব্জ বৃদ্ধের সঙ্গে নিঃশব্দে চলিল। ক্রমে বালাখানার মোড় পার হইয়া উভয়ে কলুটোলার পথে আসিয়া পড়িল; কোথাও মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। আরও একটুখানি আগাইয়া ডাইনে একটা গলির মোড়ে আসিয়া কুঁজো মুসলমান সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল—"এমনভাবে যে আবার দেখা হবে এ স্বপ্নেও ভাবিনি যা হোক আছ তো ভাল—তোমার জন্য বিষম ভাবনা আমার হয়েছিল।"

"আজ্ঞে, ভাবনারই কথা বটে, সে সব পরে বলছি, আগে

আপনার সংবাদ বলুন। এ কয়দিন উত্থানশক্তি রহিত হয়ে পড়ে পড়ে কেবল আপনার কথাই ভেবেছি, কেবল উঠ্‌তে পারিনি বলে——”

“এ অবস্থা যে তোমার হবে তা আন্দাজেই বুঝেছিলুম, যারা তামাকের সঙ্গেও বিষ দিয়ে বিপদ ঘটাবার চেষ্টা কর্‌তে ছাড়ে না তারা যে পানীয়ের সুযোগ উপেক্ষা করেছে তা মনে হয় না, যাহোক ভগবান যে তোমাকে রক্ষা করেছেন এজন্য তাঁকে প্রাণভরে ধন্যবাদ দেও বন্ধু, নইলে সত্যব্রতের মত লোকের সঙ্গেও যাবা এমন খেলা খেলতে সাহস করে তারা সাধারণ নয় কিন্তু কারণ কি তা ত এখনো ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনি।”

“কারণ কি তা আমি বুঝেছি—এবং এই গোরাই তার মূল, এই দেখুন দেখি কাগজখানা পড়ে।”

এতক্ষণে দু’জনকে চিনিতে বোধ করি আর কাহারও বাকী নাই। উভয়ে একটা গ্যাসের নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া একবার সন্তর্পণে ইতস্ততঃ চাহিল তারপরে সত্যব্রত গোরার হাত হইতে কাগজের টুকরাটুকু লইয়া পড়িলেন——

“কেমন হে বৈরাগী—নিজে বুঝি আর হা’লে পানি পেলে না, তাই শেষে ওই গণ্ডমুর্খ অকেজো টিক্‌টিকিটার সঙ্গে ভিড়েছ? সত্যব্রতের মত ও রকম হাজার টিক্‌টিকি একসঙ্গে ভিড়লেও কিছু ফয়দা হবেনা, এইকথা বুঝিয়ে দেবার জন্যে আজ মাত্র একটু

নমুনা দেখালুম। এখনও থেমে যাও চাঁদ—নয়তো—বুঝেছ বন্ধু-

কাগজের আর কোথাও কিছু ছিল তাহা নিজের কাছে রাখিয়া কহিলেন—"তোমার উদ্দেশ্য তারা অবগত আছে দেখ্‌ছি, যাহোক এর ব্যবস্থা পরে হবে। উপস্থিত তোমার শরীর সুস্থতো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ কেবল আজকেই ধাত ঠিক হয়েছে। একটা মড়ার খাটে শুইয়ে শালারা আমাকে একেবারে কাশীমিত্রের ঘাটে গঙ্গার ধারে রেখে গিয়েছিল। মেলা লোক কৌতুহলের বশে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, আমারও অল্পে অল্পে নেশার ঘোর কেটে যাচ্ছিল। এমন সময়ে বাড়ীর দু'তিনজন ভাড়াটের সঙ্গে কুড়ুনী গাইতে গিয়ে আমায় সেই অবস্থায় দেখ্‌তে পায়। তার বাড়ীউলি আগের দিন নবদ্বীপ চলে গিয়েছিল—তাই রক্ষে। সে জোর করে আমাকে তার ঘরে এনে আশ্রয় দিয়ে এ কয়দিন সেবা করে খাড়া করে তুলেছে। সেই রাত্রে সেই বস্তিতে আমি ঢন্‌ঢনিয়ার গলার আওয়াজ শুনেছি তারপরেই অজ্ঞান হয়েছিলুম। শুন্‌লুম আগে দু'দিন সে বাড়ীউলীর সঙ্গে একজোট হয়ে কুড়োকে তুলে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাবাস মেয়ে বটে,—পারেনি। শেষ কুড়োকে এক বিষম ভয়ের কথা বলে শাসিয়ে গেছে, তারই সত্যমিথ্যা জান্‌বার

জন্যে আজ এই চণ্ডুর আড্ডায় ঢুকতে হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে যে আবার এত শীঘ্র এমনভাবে এস্থানে দেখবো তা স্বপ্নেও——"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বন্ধু, আমিও শীকারের সন্ধানেই এয়েছিলুম। একটা অদ্ভুত তদন্তের ভার নিয়েছি। ব্যাপারটা খুব সোজা বলেই প্রথমে অনুমান হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়, এবং তোমার ওই চিরকুট পড়ে মনে হচ্ছে, যে এ উভয় ব্যাপারে সংস্রব আছে, এখন আমার সঙ্গে থাকতে পারবে কি ?"

"নিশ্চয়—তার আর কথা ?"

"তবে চল—এখনই বালিগঞ্জে যেতে হবে।" বলিয়া সত্যব্রত মুখে দুইটা আঙ্গুল পুরিয়া খুব জোরে শীষ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির অপর প্রান্ত হইতে তেমনি আর একটা শীষ শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই এক গুণ্ডা গোছের মুসলমান সহিস্ ঘোড়ার মুখ ধরিয়া একখানা টম্‌টম্ লইয়া উপস্থিত হইল। গোরা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল——

"কি ব্যাপার বলুন দেখি, দশটা তো প্রায় বাজে, এতরাত্রে বালিগঞ্জে——"

"হ্যাঁ, আজ দু'তিন দিন থেকে—স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য আমার নিয়োগ কর্ত্রীর বাড়ীতেই থাকতে হয়েছে—কিন্তু কিছুই করতে পারছিনি। যতই চেষ্টা করছি ততই যেন আমার

বুদ্ধিতে ও মস্তিষ্কে জড়তা অনুভব হচ্ছে, এমন সময়ে তোমার সাহায্য আমার বিশেষ দরকার।”

“কিন্তু আমিতো কিছুই শুনিনি।”

“শুনবে—আগে চড়ে বোস।”

কথাবার্ত্তা আর কিছু হইল না, উভয়েই টম্‌টম্ চড়িয়া বসিল, গাড়ী ফাঁকা রাস্তায় তীরবেগে ছুটিল। অবশেষে গড়ের মাঠে আসিয়া পড়িলে সত্যব্রত আরম্ভ করিলেন——

“আমাদের সে রাত্রে সেই যে ঘটনা ঘটেছিল, এ ব্যাপারের সূত্রপাতও ঠিক সেই দিন বিকালে। জে, সি, গুস্ নামে বিলাত ফেরতা বাঙ্গালী সাহেব আজ আড়াই বছর থেকে বালিগঞ্জে একখানি মাঝারি গোছের বাংলা কিনে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করছেন। তাঁর স্ত্রী এদেশী বাঙ্গালী খৃষ্টানের মেয়ে। দেখতে সুন্দরী ও হৃষ্টপুষ্ট—বি, এ, পাশ করে কোন মেয়ে ইস্কুলে চাকরি করতেন, বিয়ে হবার পরে আজ তিন বছর থেকে, সে চাকরি ছেড়ে গৃহস্থালী নিয়ে আছেন। একটি বছর ছয়ের পুত্র সন্তান ছাড়া ছেলেপিলে নাই। স্বামী স্ত্রী দু’জনেই বিদ্বান, দু’জনেই স্বচ্চরিত্র, মিষ্টভাষী, মিশুক, অহঙ্কার শূন্য পরোপকারী এবং সাহসী। এই আড়াই বছরের ভিতরে বালিগঞ্জে বেশ একটু পশার প্রতিপত্তি জমিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু গুস্ সাহেব কাজকর্ম্ম যে কি করেন তা কেউ জানে না।”

"হয়েছে—গলদ যা কিছু তা ওখানেই।"

"হতে পারে, কিন্তু কেউ তা সন্দেহ করে না। প্রকাশ যে কলকাতায় তিনি দালালী করেন; রোজগারও যথেষ্ট করেন এবং খরচ পত্রেও কেউ কখনো কৃপণতা তাকে করতে দেখেনি। সকলেরই বিশ্বাস যে কিছু টাকা কড়িও জমিয়েছেন। প্রত্যহ ভোরে সাজগোজ করে তিনি বাজার গাড়ীতে (Produce Train) কলকাতায় যান এবং যথা নিয়মে রাত ৮টার গাড়ীতে বাড়ী আসেন। কেবল রবিবারে বার হন না, রবিবার এবং অন্য ছুটীর দিনে গৃহেই থাকেন এবং পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখাশুনা মেলামেশা করে বেশ প্রফুল্ল ভাবেই দিন কাটিয়ে দেন। স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসা এবং যত্নও খুব, কখনও কেউ তাঁদের ঝগড়া শুনেনি, বিশেষত ছেলেটী তাঁর বুকের পাঁজরার মত। এখন এঁদেরই গৃহে এক বিষম বিপদের সূত্রপাত হয়েছে। এই গুপ্ত সাহেব সহসা অদৃশ্য হয়েছেন।"

"এঁ্যা কেমন করে—কতদিন?"

"আমাদের সেই ঘটনার রাত্রের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, কিন্তু কেমন করে তা কেউ বলতে পারে না, অত্যন্ত আচম্বিতে—"

তবে যে বল্লেন সেই দিন বিকালে সূত্রপাত?"

"হ্যাঁ—আগে শুন সব কথা। প্রায় এক পক্ষেরও কিছু বেশী-কাল অতীত হল একটা ভারী রকম গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল।

গুস্ সাহেবও ঠিক নিয়মমত সেদিন বেরিয়েছিলেন। কিন্তু সেই যাওয়াই শেষ যাওয়া—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রের সমস্ত গাড়ীগুলিই একে একে চলে গেল তিনি আর ফিরলেন না। এরূপ ঘটনা এই প্রথম, তবুও তাঁর স্ত্রী লিলি গুস্ সে রাত্রি উৎকণ্ঠায় যাপন করে ভাবলেন যে, কোনও কারণে রাত্রে ফিরতে পারেন নি, পরদিন নিশ্চয় আসবেন। কিন্তু পর দিনও গেল, রাতও কাটলো তবু তিনি ফিরলেন না, কিম্বা কোনও সংবাদও পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিনও যখন সেই ভাবে কাটলো অথচ কোন সংবাদই এলোনা তখন 'লিলি' আর স্থির থাকতে পারলেন না, লোয়ার চিৎপুর রোড়ে একটা সংবাদ পত্রের সঙ্গে তাঁর কিছু সংশ্রব ছিল, সেইখানে গিয়ে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং লালবাজারে পুলিশ আফিসেও স্বামীর নিরুদ্দেশ বার্ত্তা ডায়েরী করে এলেন। কিন্তু ক্রমে আরও চারদিন কেটে গেল, ফল কিছুই হল না। অবশেষে পঞ্চম দিন যে রাত্রে আমাদের গৌরবের ঘটনা ঘটে—সেই দিন সকালে হঠাৎ তাঁর স্বামীর হস্তাক্ষরে লিখিত এক পত্র পেলেন যে কোন অনিবার্য্য কারণের জন্য তিনি একস্থানে নিযুক্ত আছেন অনতিবিলম্বেই গৃহে ফিরবেন, চিন্তার কারণ নেই।"

গোরা শুনিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছিল, কহিল—গঙ্গাস্নানের যোগের দিনের ঘটনা বল্লেন না, মনে পড়ে কি গুল্লাও সে রাত্রে এই গঙ্গাস্নানের কথা উল্লেখ করেছিল ?"

"হ্যাঁ মনে আছে কিন্তু সমস্ত শুন আগে। চিঠি পেয়ে লিলি সেই দিন বিকালে আবার সেই সংবাদ পত্রের আফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপন বন্ধ করেন এবং লালবাজারেও সেই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। সেইখানেই ছয়টা বাজে। পরদিন তাঁদের 'মহিলা সমিতির' বার্ষিক উৎসব ছিল, ফেরবার সময়ে তিনি স্বরতি-বাগানের একটা দোকানে সামিয়ানা ও আলোর ব্যবস্থা করতে গমন করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে একটা গলির মোড় ঘুরে যেমন বড় রাস্তার দিকে আসবেন, অমনি ওই চণ্ডুখানার উপর থেকে আচম্‌কা একটা চীৎকার শুনে চেয়ে যা দেখেন তাতে মুহূর্ত্তের জন্য ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বলেন যে তেতলার কোণের ঘরের খোলা জানেলার স্বমুখে তাঁর স্বামী দাঁড়িয়ে ছিলেন মুখের ভাব অত্যন্ত শুষ্ক বিকৃত এবং চোখ দুটো যেন মস্ত বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছিল। দুজনে চোখো-চোখি হতেই তিনি দু'হাত তুলে যেন সাহায্যের জন্য লিলিকে আহ্বান করেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হল কেউ যেন সবলে তাঁর স্বামীকে পিছন দিকে টেনে নিলে। ভয়ে লিলি অধীর হয়ে পড়লেন, কি উপায় করবেন—ক্ষণকাল তা ভেবে নির্ণয় করতে পারলেন না। তখন রাস্তায় সবে বাতি জ্বালতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে একজন সার্জেণ্টের সঙ্গে জন কতক কনেষ্টবল সেইখানে দিয়ে যাচ্ছিল তিনি

শশব্যস্তে সংক্ষেপে সাহেবকে সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব তৎক্ষণাৎ দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন, কিন্তু দোকানের অধিকারীরা দৃঢ়স্বরে আপত্তি করে জানালে যে তেমন কোন লোক সে বাড়ীতে নাই—কিম্বা আসে নাই।

"লিলির দেখতে ভুল হয়নি তো? সন্ধ্যার আবছায়ায় ভুল হওয়া বিচিত্র হয়।"

"দোকানের লোকেরা তাই বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু লিলিও দৃঢ় কণ্ঠে শপথ করে বল্লেন যে তাঁব ভ্রম নয়, তিনি গুস্ সাহেবকে সেখানে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে স্বচক্ষে দেখেছেন। সার্জেণ্ট তখন দলবল নিয়ে উপরে উঠে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, কিন্তু সমস্ত তেতলার উপরে একবেটা কুঁজো, টেকো, খোঁড়া এবং অত্যন্ত কদাকার ভিখারী ভিন্ন আর জনপ্রাণীকেও দেখা গেল না। ভিখারীও দৃঢ় কণ্ঠে বারম্বার বল্লে যে সেখানে সে ভিন্ন আর কেউ ছিল ন। সার্জেণ্ট তখন লিলির দৃষ্টির ভ্রম সাব্যস্ত করে ফেরবার জোগাড় করছিলেন এমন সময়ে লিলি হঠাৎ অস্ফুট চীৎকার করে—এক কোণের কতকগুলো আবর্জ্জনার ভিতর থেকে একটা কোট এবং রুমাল টেনে বার করলেন, কোটের গলার ভিতরদিকে এবং রুমালে J. C. Goose.—এই ক'টি অক্ষর লেখা ছিল।"

"ব্যাপার আশ্চর্য্য বটে—অমন কুঁজো, খোঁড়া কদর্য্য ভিখারী—সে একা অমন ষণ্ডা লোকটাকে খুন করেছে তাও মনে হয় না।"

"ঠিক বলেছ—রহস্য ওইখানেই। কিন্তু কোট আর রুমাল পেয়ে সার্জেণ্টের সন্দেহ প্রবল হল, তিনি দস্তুরমত খানা-তল্লাসী করলেন। সেই ঘরের পিছনে ছোট আর একটা পাই-খানার মত ঘর ছিল, তার এক মাত্র জানালা বাড়ীর পিছনে একটা বস্তির দিকে, জানালায় গরাদে ছিল না, এবং তা বন্ধ ছিল। জানালা খুলে দেখা গেল তার নীচে বস্তিটার এক প্রান্তে খানিকটা জঙ্গলভরা পড়ো জায়গা। জানালার চৌকাটে এবং সেই ঘরের মেঝেতে স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট রক্তের দাগ, অন্বেষণে ভিখারীর কাপড় চোপড়েও রক্তের দাগ দেখা গেল। তাই দেখেই লিলি চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হলেন। ইনিসপেকটার তখন কোনক্রমে তাঁকে সেখান থেকে বাইরে এনে—কনেষ্টবল সঙ্গে দিয়ে গাড়ী করে থানায় পাঠিয়ে দিলেন, তারপরে আবার ফিরে গিয়ে প্রায় রাত দশটা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন তাঁর বোধ হল যে কেউ গুস্ সাহেবকে খুন করে সেই জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বস্তির সেই জায়গায় অন্বেষণে একটা সার্ট ও ওয়েষ্টকোট ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া গেল না তার সমস্ত পকেট গুলোই পয়সা, আধলা, আনী দুয়ানীতে ভরা।

সাহেব যে খুন হয়েছে তা স্পষ্টই বোধ হল, কিন্তু কার দ্বারা ও কেমন করে সেইটে বোঝা গেল না। ভিখারী বলেছে যে তার [illegible] া কেটে ঘরে ও জানালায় [illegible] তার চোপড়ে [illegible] লেগেছে। তা ছাড়া ওই সার্ট, কোট, রুমাল যে কার এবং কেমন করেই বা সেখানে এলো তা সে বলতে পারে না। যা হোক ইনিস্‌পেকটার ভিখারীকে সন্দেহ করে' ধরে চালান দিয়েছেন, সে এখন হরিণবাড়ীর হাজতে আছে। এবং বাড়ীখানার আশে পাশেও পুলিশ মোতায়েন রেখেছেন—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত, আর কোন কিছু কিনারা হয়ে উঠেনি।"

"আমার মনে হয় যে এ ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের সেই কাণ্ডেরও যেন কোথাও না কোথাও সংশ্রব আছে। প্রথম দেখুন সেই গঙ্গাস্নানের কথা গুল্লাও বলে ছিল এবং আপনার বর্ণনার মত টেকো, কুঁজো, খোঁড়া একটা ভিখারীর কথাও ছিল—সেই দিনেই গুস্ সাহেব প্রথম অদৃশ্য হয়েছেন। তারপর যে রাত্রে আমাদের সেই কাণ্ড ঘটে ছিল সেই বিকালেই এখানে এই কাণ্ড। দুই জায়গাতেই ভিখারীর সংশ্রব।

"তার উপর এই দুদিন চণ্ডুখানায় যাতায়াতের ফলে যে টুকু টের পেয়েছি তাতে আমারও ওই রকম সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে, আর এও বুঝতে পারছি যে এই ব্যাপারের কিনারা করতে পারলে—

তোমার ব্যাপারের কিনারা করা সহজ হয়ে আসবে। যা হোক দেখা যাক কি দাঁড়ায়।”

নবম পরিচ্ছেদ

।

যখন গাড়ী আসিয়া বালিগঞ্জের বাংলায় থামিল তখন পর্য্যন্ত লিলি জাগিয়া সত্যব্রতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, অন্ধকারে দুই জনকে নামিতে দেখিয়া তিনি আহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম ঘুচিল, কপাট ধরিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। সত্যব্রত কাছে আসিয়াই কহিল—“ইনি আমার বন্ধু, আমার কাজ শিক্ষা করছেন—বড় সুচতুর ও বুদ্ধিমান।”

লিলি উভয়কে অভ্যর্থনা করিয়া হলঘরে লইয়া বসাইলেন, তার পরে নিজে একধারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“আজকার সংবাদ কি?”

“বিশেষ কিছুই নয়, কেবল সেই ভিখারী সংক্রান্ত কতকগুলো সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছি এই মাত্র।”

লিলি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সত্যব্রতর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্য বলবেন ?"

"জিজ্ঞাসা করুন, বলবো।"

"আচ্ছা ঠিক করে বলুন দেখি—আপনার মনে কি হয়, আমার স্বামী জীবিত আছেন ?"

সত্যব্রত ক্ষণকাল ইতঃস্তত করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন—

আমার ধারণা মন্দের দিকে, তবে আজকার ভিখারী সংক্রান্ত গোটাকতক কথা শুনে মনে একটা গভীর সন্দেহ—"

লিলি বাধা দিয়া বিরাগভরে বলিয়া উঠিলেন—"ও সব সন্দেহ আরগুমেণ্ট আপনারা করুন গে, তিনি কি জীবিত নাই ?"

"বল্লুম তো আমার ধারণা মন্দের দিকে।"

"তবে; আজ এ চিঠি এলো কোথা থেকে ?"

বলিয়াই একখানা ময়লা খাম বাহির করিয়া দেখাইলেন। আগ্রহভরে লাফাইয়া উঠিয়া চিলের মত ছোঁ মারিয়া খামখানা সত্যব্রত আলোর নীচে রাখিয়া প্রথমে ঠিকানাটা দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি সাহেবের হাতের লেখা ?"

"না—কিন্তু ভিতর খুলে পড়ুন।"

সত্যব্রত চিঠি খুলিয়া পড়িলেন—

"প্রিয়তমে, ভাবিও না, একটা গুরুতর ভুলের দরুণ এখনও দিন কতক আমার বাড়ী যাওয়া ঘটিবে না, এ ভুল মানুষের শীঘ্র ভাঙ্গিবে, দিনকতক ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, আবার বলি, ভাবনা নাই।

তোমার চিরদিনের—গুস্।"

"দেখছি এক টুকরা বাজে কাগজের উপরে পেন্সিলে লেখা—ঠিক চিনতে পেরেছেন যে এ আপনার স্বামীর হস্তাক্ষর ?"

নিশ্চয়, তবে স্বাভাবিক হস্তাক্ষর নয়, খুব তাড়াতাড়ি ব্যস্ত-ভাবে লিখলে—লেখা তাঁর ঠিক এই রকম হয়।"

সত্যব্রত, চিঠিখানা ক্ষণকাল বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন এবং ডাকঘরের ছাপটা পড়িলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহ ভরে কহিলেন—

"যাক, এখন বোধ করি ব্যাপারটা নিরাকরণ করিতে বেশী বেগ পেতে হবে না—এবং সুফলই আশা করি, তা বলে' আপনি এখন মনে খুব বেশী বিশ্বাস করে থাকবেন না। রাত প্রায় দু'টো বাজে, ভোরেই যেতে হবে—উপস্থিত বিদায়—"

"সে কি—আহার করবেন না ?"

"এমন উদ্বেলিত মনের অবস্থায় আহার আমার কোন কালেই মুখে ওঠে না, তুমি খেয়ে নিতে পার গোরা।"

বলিয়াই, শয়ন কক্ষে গমন করিলেন। গোরা আহারান্তে

গিয়া দেখিল—সত্যব্রত একটা কৌচের উপরে আমীরি কায়দায় শুইয়া আলবোলার নল মুখে লইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মাঝে মাঝে মুখ নিঃসৃত ধূমরাশি কুণ্ডলী আকারে উঠিয়া ঘরখানি ছাইয়া ফেলিতেছে। কাছেই সারি সারি আরও পাঁচ ছয়টি সজ্জিত কলিকা এবং একটী দেশলাই রক্ষিত। দেখিয়া গোরার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে সত্যব্রত সারারাত্রি জাগিয়া সেই রহস্যের পথ পরিষ্কারের জন্য ক্লান্ত নিশ্চয় হইয়াছেন। গোরা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে পার্শ্ববর্ত্তী পালঙ্কখানার উপরে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বেই নিদ্রায় মগ্ন হইল।

সহসা ঠেলাঠেলিতে তাহার অতৃপ্ত ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গোরা সবিস্ময়ে দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড গোলাকার ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল যে চারটা বাজিতে দশ মিনিট মাত্র বাকী। সত্যব্রত ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—

"পাড়াগাঁয়ের নির্ম্মল প্রভাত বায়ুতে দেহ তাজা করবার ইচ্ছা থাকে তো শীঘ্র প্রস্তুত হও।"

"এই শেষ রাত্রে যাবেন কোথায় বলুন তো—ভাবনায় মাথা আপনার বিগড়ে গেছে দেখছি।"

"না—এত দিন বিগড়ে ছিল আজ ধাতে এসেছে। দেখ বন্ধু, আমাদের শত্রুরা তোমাকে যে চিঠি লিখেছিল তার একবর্ণও মিথ্যা নয়, আমার মত নির্ব্বোধ অকেজো লোক সহরে আর

নেই, নইলে আর এই অতি সহজ সরল কেসটাকে প্রকাণ্ড জটিল ভেবে অন্ধের মত এতদিন হাতড়ে বেড়াই ?"

গোরা উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"এঁ্যা, দিশে পেয়েছেন—কতক্ষণ—কেমন করে ?"

"রাত জেগে, পোয়াটাক তামাক ভস্ম করে, লিলি বিবির বাথরুমের ভিতরে এইমাত্র এ রহস্যের চাবিটি হস্তগত করেছি। আলাদিনের গহ্বরের দ্বার যদি মুক্ত দেখতে চাও তো আর দেরী নয়।"

বলিয়াই সত্যব্রত হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা মুখ হাত ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে শুনিল যে বহির্দ্বারে টম্‌টম্‌ সজ্জিত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই উভয়ে যখন নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়া টম্‌টম হাঁকাইয়া চলিয়া গেল—তখন সেই নিস্তব্ধ পল্লীতে কাক-কোকিল পর্য্যন্ত ডাকিতে সুরু করে নাই এবং যখন তাহারা হরিণবাড়ীর কারাগার সম্মুখে আসিয়া থামিল তখন নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়ীতে একটা বিশেষ রকমের কতকগুলি ধারাবাহিক শব্দ বাজিয়া ছয়টা বাজিতে পনের মিনিট বাকী—প্রচার করিয়া দিল।

সত্যব্রত কারা প্রহরীকে আপনার নিদর্শন দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং অনেকগুলি দালান পার হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানেও

একজন প্রহরী দ্বার বন্ধ করিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ কার চার্জে আছে?"

"ইনস্পেকটার—সাহেব।"

পুনরায় নিদর্শন দেখাইয়া সত্যব্রত কহিল—"সাবকো সেলাম দেও, বহুৎ জরুরী কাম।"

"ভিতর আফিসমে বৈঠিয়ে হুজুর।"

বলিয়া প্রহরী ঘর দেখাইয়া দিল। সত্যব্রত গোরার সহিত সেই গৃহে যাইয়া উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই পাশের দিকের দরজার পরদা ঠেলিয়া এক সুন্দর গঠন প্রৌঢ় মুসলমান প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আরে, মিত্তির যে, এত সকালে আজ! কি ভাগ্য আমার! হঠাৎ কি মনে করে?"

"কিছু মনে করে নিশ্চয়, কিন্তু এত সকালে এসে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করলুম না কি?"

ইনিস্পেকটার হাসিয়া কহিলেন—"তোমার সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব তাদের কি আর এমন সময়ে সুখশয্যায় থাকা ধাতে সয়? এখন কাজের কথা বল।

"সেই ভিখারীর কেসের জন্য এসেছি, যে সেই সুরতিবাগানে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে এয়েছে। লোকটা কেমন হে?"

ইনিস্পেকটার অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন—"আরে তোবা

তোবা—ব্যাটা নেহাতই ভিখারী, যেমন চেহারা জঘন্য তেমনি সাত চড়ে রা নেই—অতি ঠাণ্ডা, সে ঘরে মানুষ আছে বলে টের পাবার জো নেই। বেচারাকে মিছে সন্দেহ করে ধরেছে—ও যদি খুনে হয় তো এতকাল পুলিশে কাজ করে চুল পাকানো আমার ব্যর্থ হয়েছে।”

. “ইঃ ভাবে যে মসগুল দেখতে পাই—তবু যদি ব্যাটা পুরুষ না হয়ে মেয়ে মানুষ হত, তা হলে অমন সুন্দরীকে বোধ করি নিকে করে......”

“আরে ওয়াক্ ওয়াক থুঃ, কি বল’ছ তুমি—মনে হলেও ত্রিভুবনে জোড়া মেলা ভার। আজ আটদশ দিন এয়েছে তা স্নান করা দূরে থাকুক হাত মুখ পর্য্যন্ত কেউ ধোয়াতে পারে নি, গায়ের দুর্গন্ধে কেউ ওর ঘরের সুমুখে পাহারা দিতে চায় না। একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে ব্যাটাকে সাত দিন অবধি আমি জলে চুবিয়ে রাখবো। ওয়াক থুঃ থুঃ......।

সত্যব্রত গোরার পানে চাহিয়া চোখের একটা ইঙ্গিত করিল, তারপরে হাসিয়া ইনস্‌পেকটারকে কহিলেন—

“তা তোমার এ সুন্দরীকে একবার চোখে দেখে চক্ষু সার্থক করতে পাই না কি, ব্যাটা করছে কি এখন?”

“ভোঁস্ ভোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা, ব্যাটা ভিক্ষে করে করে হায়রাণ হত, এখানে রাজার হালে নিয়মিত সময়ে খোরাক

মুখের কাছে পৌঁছুচ্ছে কিনা, তোফা আরামে আছে, বেলা ৮টার আগে আর ঘুম ভাঙ্গে না। দেখতে চাও তো এস, তোমার ব্যাগটা থাক্ না ওখানেই।"

"না না—ওর ভিতর ঢের মন্ত্র তন্ত্র আছে, ও আমার সঙ্গের সাথী—কাছ ছাড়া কবতে পারি কি ?

বলিয়া সত্যব্রত আপনার হাতব্যাগটী তুলিয়া লইয়া ইনিসপেক্টারের অনুসরণ করিলেনএবং পরক্ষণেই এদিক-ওদিক দিয়া ঘুরিয়া যখন আসামীর ঘরের সম্মুখে আসিলেন তখন—একটা প্রবল নাসিকার ধ্বনি ঘরের একমাত্র ক্ষুদ্র দরজা লোহার গরাদ দিয়া ঘেরা—তাহার ফাক দিয়া দেখা গেল যে ভিখারী সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে পরম আরামে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে।

সত্যব্রতের ইঙ্গিতে ইনস্পেকটার খুব সন্তর্পণে নিঃশব্দে ঘরের চাবি খুলিলেন তারপরে তিন জনেই তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। সত্যব্রত পা টিপিয়া টিপিয়া একেবারে ভিখারীর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরক্ষণেই ব্যাগ হইতে একটা বড় ভিজা স্পঞ্জ বাহির করিয়া চোকের পলকে সবলে ভিখারীর মুখের উপর বারকতক ঘসিলেন। সে আচম্কা একটা বিকৃত আর্ত্তনাদ করিয়াই ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র অবাক্ হইয়া চাহিয়া 'হা ভগবান'—বলিয়াই দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন

ইনিস্‌পেক্‌টার এবং গোরা যে দৃশ্য দেখিল তাহাতে তাহারা উভয়েই একেবারে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত মুহূর্ত্তকাল অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ইনস্‌পেকটার সাহেব সত্যব্রতের পানে বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন—"এ যে সত্য সত্যই আলাদিনের ব্যাপার ঘটিয়ে ছাড়লে মিত্তির? এই তো নিরুদ্দিষ্ট গুস্‌ সাহেব সাম্‌নে বসে। আমি তার ফটো যে কাল রাত্রেও দেখেছি—তবে খুন সম্পূর্ণ মিথ্যা!"

সত্যব্রত কেবলমাত্র মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিলেন—জবাব করিলেন না। সকলে দেখিল যে ভিখারীর সর্ব্বাঙ্গ থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। সে সহসা প্রবল উদ্যমে মুখের হাত খুলিয়া ইনসপেকটারের কথায় জবাব করিল—"তা'হলে তো আর আমার উপরে খুনের চার্জ্জ হ'তে পারে না—দেখছেন তো কি বিষম ভুল!"

"তা বটে—বিষম ভুলই বটে, খুনের চার্জ্জ তো ফেঁসে গেল দেখছি—কিন্তু কথা হচ্ছে যে—এ ভুল কার, এজন্য দায়ী কে?"

"আমি—আমি—আমিই দায়ী!"

বলিয়া, সহসা পাগলের মত চীৎকার করিয়া গুস সাহেব আবার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—

"হা ভগবান, যা ভয় করি তাই! এখনি সহরে সমস্ত রাষ্ট্র হয়ে যাবে, আমি কোন্ মুখ নিয়ে ঘরে ফিরে যাব—স্ত্রী পুত্রের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে। উঃ—এর চেয়ে ফাঁসীতে মরাও যে ঢের ভাল। কি হল—কি হল—কি করলুম—কি করলুম—কি কেলেঙ্কারী—উঃ—"

তাঁহার মর্ম্মান্তিক কাতরোক্তিতে—সকলেরই হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। সত্যপ্রিয় আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"দেখুন, কেন এ কেলেঙ্কারী করেছেন; তা যদি আগাগোড়া সরলভাবে, অকপটে ব্যক্ত করতে পারেন, তা'হলে ইনসপেকটার সাহেব এ ব্যাপার চেপে দেবার চেষ্টা করবেন—বাইরে কেউ কিছু জানতে না পারে—এমন ব্যবস্থা করা যাবে।"

গুস সাহেব সহসা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ইনসপেকটারের পদতলে পড়িয়া কহিলেন—"রক্ষা করুন সাহেব, রক্ষা করুন, আমি সব বল্‌ছি।"

"যিনি এ রহস্য নির্ণয়ের কর্ত্তা তিনি যখন কথা দিয়েছেন তখন রক্ষা নিশ্চয় করবো—এ ব্যাপার চেপে দেবার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু আগে উনি যা অনুরোধ করলেন—সমস্ত কথা প্রকাশ করে বলুন।"

"অনুরোধ নয়—আদেশ, এখনি বলছি, শুনুন তবে।"

বলিয়া গুস সাহেব আরম্ভ করিলেন—

"বাল্যকাল হতেই লেখাপড়ার চেয়ে—থিয়েটার, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতির প্রতি আমার আকর্ষণ কিছু বেশী ছিল। পরে ঘটনাক্রমে, লেখাপড়া শেখবার জন্যে বিলেত গিয়েও—ওই সকল বিষয়েই শিক্ষা লাভ করি এবং চরিত্রহীন হয়ে উঠি। সেখানে এক থিয়েটার সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে এ পথে বেশ সুনামও অর্জ্জন করেছিলুম, কিন্তু ভাগ্যে তা সইলো না—এক হীন নারীর প্রলোভনে, থিয়েটার ছেড়ে—তাদের ম্যাজিকের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করি এবং বছর দুয়ের ভিতরেই সে বিদ্যাতে দক্ষতা লাভ করি। এই সম্প্রদায় নানাস্থানে ম্যাজিক দেখিয়ে উপার্জ্জন যথেষ্ট করতো। এদের সঙ্গেই আমি কলকাতায় ফিরে আসি। পরে এই সম্প্রদায় যখন বিদায় হয়, তখন আমিও তাদের দল ছেড়ে নিজেই এদেশে একটা ম্যাজিকের দল গঠিত করি।

এই উদ্যমে আমার যা কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়েছিল—সমস্ত ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু যেমন আশা করেছিলুন তেমন উপার্জ্জন হল না। আমাদের দেশের লোক বিদেশীর কাছে ঝুঁটো জিনিষও যথেষ্ট দামে কিনবে তবু স্বদেশী স্বজাতির সাচ্চা জিনিষও অর্থ দিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়, কাজেই ম্যাজিকের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লুম—দল তুলে দিলুম, কিন্তু পেট চলবার উপায় নেই। আত্মীয়-স্বজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘৃণায় আমার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনেন না। করি কি? আমার এক

অল্যবন্ধু এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক হয়েছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বিস্তর চেষ্টা ও খোসামোদীর পরে অতি সামান্য বেতনে একটা রিপোর্টারের চাকরী গ্রহণ করি। তাতে কষ্টে আমার থাকা আর খাওয়ার খরচটা চলতো—কিন্তু একটা পয়সাও বাঁচতো না, বা অন্য খরচ চলতো না, কাজেই অন্য চাকরীর চেষ্টায় রইলুম, কিন্তু কিছুতেই কোথাও, আর কোন চাকরি জুটলো না—অথচ প্রতি মাসেই কিছু কিছু দেনা হ'তে আরম্ভ হল—কিন্তু উপায় কিছুই খুঁজে পেলুম না।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটলো। আমাদের সম্পাদক কোন এক বিলাতী কাগজে একটা প্রবন্ধ পড়ে একদিন আমাকে বলেন —'দেখ, কেমন নূতন জিনিস, এ দেশের ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে যদি এমনি একটা ধারাবাহিক কিছু লিখতে পার, তা'হলে তার কদর হয়।' আমি স্বীকার করলেম, কিন্তু কি উপায়ে যে ভিখারীদের ভিতরকার সকল বিষয় অবগত হব তা ঠিক করতে পারলেম না। অবশেষে ভাবতে ভাবতে মাথায় এক বুদ্ধি এলো। পূর্ব্বের ম্যাজিকের সাজ-গোজ এবং মুখ ও চেহারা বদ্‌লাবার নানা রকম রং আঠা অন্যান্য সরাঞ্জাম কিছু কিছু আমার ছিল। এক সন্ধ্যায় তাই আমার চেহারা বিকৃত করে ভিখারী সেজে বার হলেম। সেটা পূজার সময়, ঘণ্টা তিন চার ঘুরে ফিরে ভিক্ষা করে প্রায় দু'টাকা পেলুম, এবং কতকগুলো ভিখারীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়

হয়ে গেল। এমনি করে দিন সাতেকের ভিতর উপার্জ্জন হল তেত্রিশ টাকা, আর ভিখারীদের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ এবং হদিসও অনেকটা বুঝতে পারলুম। সেই হল আমার কাল!"

বলিয়া গুস সাহেব একটুখানি গুম্ হইয়া কি ভাবিলেন। সত্যব্রত কহিলেন—"আপনার এডভেন্চার বিস্ময়জনক বটে।"

"বিস্ময়ের এখনো কিছুই আসে নি—সব শুনুন আগে, তখন বুঝবেন।"

বলিয়া সাহেব আবার সুরু করিলেন—"তখন পর্য্যন্ত সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, জ্ঞান একেবারে হারাই নাই, কিন্তু অভাব বড় বালাই! ঘটনাক্রমে সেই কাগজওয়ালাদের সঙ্গে টাকাকড়ি নিয়ে আমার বিবাদ হল—চাকরি গেল। নিরুপায় হয়ে মাঝে মাঝে ঐ নূতন ব্যবসা সুরু করলুম। দশ বার দিন ভিক্ষা করি—তারপর মাসের বাকি দিনগুলি আমোদ-প্রমোদে কাটাই, আবার দিনকতক ভিক্ষা সুরু করি। এমনি করতে করতে ক্রমে সাহস বাড়লো, ঘৃণা-লজ্জা দূরে গেল, ব্যবসাটার প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মালো। সেই সময়ে ঘটনাক্রমে এক মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীকে দেখে মুগ্ধ হলুম।"

"তিনিই কি আপনার 'লিলি' নাকি?"

গুস সাহেব বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সত্যব্রতের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ্যাঁ আপনি তাকে জানেন. এঃ—আপনাদের

ডিটেকটিভদের কাছে কিছুই গোপন রাখবার উপায় নেই দেখছি।"

সত্যব্রত হাসিয়া আশ্বাস দিলেন—"ভয় নেই, আপনার গুপ্ত কথা কিছুই প্রকাশ হবে না—স্বচ্ছন্দে বলে যান।"

"তারপর উভয়ে আলাপ-পরিচয় হল—কোর্টশিপ চল্লো, আমিও রীতিমত ভাবে দিনের বেলায় প্রতিদিন ভিখারী হয়ে, রাত্রে আবার ভদ্রলোক হতে লাগলুম। এই রকমে মাস ছয়ের ভিতরে তিন শো টাকা জমালুম, কিন্তু সে টাকা অবলম্বন করে বিবাহ করতে সাহস হল না—ক্রমে উপার্জ্জনের আরও নানা ফন্দী মাথায় আসতে লাগলো এবং ভিখারী সম্প্রদায়ে মেলা মেশা করে মাঝে মাঝে থোক্‌থাক্ রোজগারেরও পথ দেখতে পেলুম। একবার তুই একজন মাড়োয়ারী বাবুকে কোন ভদ্র লোকের রক্ষিতাকে হাত করবার সহায়তা করে থোক্ দেড় শো টাকা পেলুম, এবং আরও ঐ রকম বাবু ভায়াদের কাজ-কর্ম্ম করে, এবং তার সঙ্গে দৈনিক ভিক্ষায় এক বছরে খরচ পত্র করেও আমার প্রায় আড়াই হাজার টাকা জমলো। তখন লিলিকে বিয়ে করলুম এবং এই ব্যবসাতেই আমার সমস্ত মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, বল অর্পণ করে উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হলুম। ক্রমে আমার দৈনিক আয় পনের টাকা থেকে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত হতে লাগলো এবং প্রায় প্রতি মাসেই দু' একটা কাজে বেশ থোক্‌থাক্ মোটা

টাকাও হাতে আসতে লাগলো, এবং আরও বছর খানেকের ভিতরে যা জম্‌লো তাতে বালিগঞ্জে একটী ছোট বাংলা কিনেও হাতে হাজার তিনেক টাকা রইলো। তখন থেকে সেইখানে বাস করতে স্থরু করলুম—ভদ্র সমাজেও পশার প্রতিপত্তি হল। সেই বছর আমাদের একটি ছেলে হল—সঙ্গে সঙ্গে উপার্জ্জনও বাড়তে লাগলো। আরও বেশী উপার্জ্জন করতে পারতুম, কেবল জেলের ভয়ে, আর প্রকাশ হবার ভয়ে এ পর্য্যন্ত কোন ফৌজদারী আইন-নিষিদ্ধ কাজে হাত দিই নাই।"

"এ বলটুকু এখনো আছে—কেবল ভদ্র সন্তান বলেই, কিন্তু চিরদিন এ ব্যবসায়ে তা থাক্‌বে না—নিশ্চয় জানবেন।"

বলিয়া সত্যব্রত একবার গোরার প্রতি কটাক্ষ করিলেন। সে বলিয়া উঠিল—

"ওসব ভিখারীর পরিচয় আমাদের যথেষ্ট জানা আছে, এখন হালের কথা বলুন—আপনার গৃহের পরিচয়ও আবশ্যক হবে না।"

"শুনুন তবে। প্রতিদিন প্রাতে বাজার গাড়ীতে কলকাতায় আস্‌তুম এবং সন্ধ্যার পরের গাড়ীতে বাড়ী ফিরতুম। এখানে স্থরতির বাগানে এক কফিখানার তেতালায় এককোণে একখানা ঘর ভাড়া করে রেখেছিলুম—সেই ঘরেই আমার সাজ-সরাঞ্জাম থাক্‌তো। ষ্টেশন থেকে ভোরে এইখানে এসেই ভিখারী সেজে

ধার হতুম, এবং সন্ধ্যায় আবার নিজমূর্ত্তি গ্রহণ করে বাড়ী ফিরতুম। এই কফিখানার একটা মগ চাকর এবং কর্ত্তা কাফ্রি মুসলমান—এই দুটী ব্যক্তিমাত্র এ পৃথিবীতে আমার গুপ্ত কথা জানে, আর আজ আপনারা শুনলেন। সেই মগ আর কাফ্রি ঘরের ভাড়া ছাড়াও আমার কাছে প্রচুর অর্থ পায়, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি নিরাপদ।

"যাক্ দিনকতক আগে হালে একটা গঙ্গাস্নানের যোগ গেছে। ঐ সকল উপলক্ষ্যে উপার্জ্জন যথেষ্ট হয়। সে দিন সুরতি বাগান থেকে সেজে বেরিয়েই আমি জগন্নাথ ঘাটে যাচ্ছিলুম। প্রায় পুলের কাছাকাছি গিয়েছি এমন সময় একখানা গাড়ী একেবারে হুড়মুড় করে কতকগুলি মেয়ের উপর এসে পড়ে। ঘোড়া ক্ষেপে গিয়েছিল—কোচোয়ান রুখতে পারছিল না। শরীরে আমার শক্তি যথেষ্ট আছে, আমি ঘোড়ার মুখ ধরে থামিয়ে মেয়েগুলিকে রক্ষা করলুম। তাই দেখে ভিতর থেকে এক গোট্টাবাবু বল্লেন—তোমার গায়ে এত জোর, ভিক্ষা কর কেন, কাজ করতে পার না?" আমি বল্লুম—"কাজের মত কাজ পেলে করি, কিন্তু দেয় কে?" কথা শুনে তিনি যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝলেন, চুপি চুপি বল্লেন—"আমি কাজ দিতে পারি, একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে পিছিয়ে গেছে, আমার একটা জবরদস্ত গোছ তুখোড় লোকের দরকার,

একটা বাগান বাড়ীতে কিছুদিন খবরদারি করতে হবে—পারবে ?"

গোরা অধীর ভাবে প্রশ্ন করিল—"কি রকম চেহারা, খুব বেঁটে, মুখ থ্যাবড়া—দু' একটা বসন্তের দাগ আছে কি ?"

"তার চেহারা ওরকম নয়, কিন্তু আর একজনের ঠিক ওই রকম চেহারা বটে, তাকে পরে দেখেছি। তারপর শুনুন, বাগান বাড়ীর কথা শুনেই ব্যাপার বুঝলুম, বল্লুম—"হুজুর এমন কাজই আমি খুঁজি, পেট ভরলেই পারি।" বাবুটী বল্লেন—"দেখ সাতদিন মাত্র, তারপর দোসরা বন্দোবস্ত হবে, এই সাতদিনে কত চাও ?" ক্রমে তিন শো টাকা কবুল হল—আমাকে তৎক্ষণাৎ যেতে হল, গাড়ীর পিছনে উঠলুম। গাড়ীখানা বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে বাগবাজার পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। বাবু একখানা নৌকায় আমায় তুল্লেন, তার ভিতরে জন দুই হিন্দুস্থানী এবং এক বাঙ্গালীর মেয়ে ছিল—মেয়েটি বোধ হল কাঁদছে, খোট্টা মাগীগুলো তার সঙ্গে ইতর ভাবে রসিকতা কচ্ছিল।"

গোরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা গেলে কোথায় ?"

"প্রায় চন্দন নগরের কাছাকাছি গঙ্গার ধারে একটা বাগান বাড়ীতে। আমার আর বাড়ী ফেরা হল না, ভেবেছিলুম চিঠি লিখবো—তারও সুবিধা হল না—সেইখানেই এক হপ্তা কাটলো।

তখন বাড়ীর জন্য মন অধীর হয়ে উঠেছে, চাকরী ছেড়ে পালাতে ইচ্ছা করছিল। তেমনি সময়ে, আপনি যে রকম বল্লেন—ওই রকম চেহারার একটা লোক গিয়ে আমার হাতে তিন শো টাকার নোট দিয়ে বল্লেন—এ টাকা কাউ পেলে, এখন এ বাবুর কাছে তোমার বাকী টাকা নিয়ে সরে পড়, তোমার জায়গায় আমি একটা লোক বাহাল রাখতে ইচ্ছা করি, সে·কাল রাতের ভোরেই এসে পড়বে। কিন্তু খবরদার ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ হয়, সেই মুহূর্ত্তে তোমার প্রাণ যাবে, আমার বহুত চর আছে—তোমায় নজরে নজরে রাখবে।" বলেই বাবু তো অন্তর্দ্ধান।"

গোরা উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল—"এ নিশ্চয় চন্‌চনিয়া।"

"ভগবান জানেন আমি চিনি না, কিন্তু বুঝলুম ভিতরে একটা গভীর রহস্য আছে সেই দিনই আমার বাবুর কাছে বিদায় চাইলুম, তিনি আর একটা দিন থাকতে বল্লেন এবং কলকাতায় একজন লোক পাঠালেন, আমি অনেক যোগাড়-যন্ত্র করে একখানা চিঠি লিখে তার হাতে কলকাতায় পোষ্ট করতে দিলুম। লিলিকে লিখলুম—কাল সন্ধ্যার পর বাড়ী যাব। কিন্তু হায়, তা আর অদৃষ্টে ঘটলো না। পরদিন সেখান থেকে বিদায় হ'য়ে কলকাতায় যখন এলুম তখন বেলা প্রায় তিনটে। সঙ্গে ছ'শত টাকা, বরাবর সুরতির বাগানের বাসায় গিয়ে উঠলুম। দু'মাসের আগাম ভাড়া এবং কাস্ত্রীকে পঁচিশ আর মগটাকে দশ টাকা বকশিশ দিলুম।

তখনো সন্ধ্যার দেরী ছিল, ভিক্ষায় বার হলুম, পাঁচটার পর আবার ফিরে গেলুম। বাড়ী যাবার জন্যে রং টং ধুয়ে প্রস্তুত হচ্ছি, হঠাৎ জানালার নীচে চেয়ে দেখি—লিলি! ভয়ে, বিস্ময়ে মুখ ফুটে একটুখানি বিকৃত স্বর বেরিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি দু'হাতে মুখ ঢেকে বিদ্যুতের মত চকিতে সরে এসেই আগে মগ ছোঁড়াটাকে সতর্ক করে দিয়ে এলুম, তাড়াতাড়ি আবার রং টং মেখে ভিখারী সেজে ফেল্লুম, এবং সে দিনের ভিক্ষা পয়সা শুদ্ধু আমার সার্ট আর ওয়েষ্ট কোট তাড়াতাড়ি ভিতরকার আর একঘরের জানালা খুলে নীচে ফেলে দিলুম। দিনকতক আগে আমার হাত কেটে চামড়া ক্রমে বুজে গিয়েছিল, সেই তাড়াহুড়োতে জানালার একটা পেরেক লেগে আবার সে জায়গাটা কেটে গেল—ঘরময় রক্ত ছড়াছড়ি হল—ব্যস্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। মনে মনে ভয় হচ্ছিল যে এতদিনের হঠাৎ আদর্শনের পর আজ যখন লিলি আমায় স্পষ্ট দেখে ফেলেছে, তখন সেইখানে সে খোঁজ করতে না এসে ছাড়বে না। হলও তাই, নিজের ঘরে ফিরে এসেই নীচে গোলমাল শুনতে পেলুম, তারপরেই অনেক লোকের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার শব্দ। হঠাৎ দেখি যে তাড়াহুড়োতে আমার গায়ের কোট আর রুমাল বাইরে ফেলে দিতে ভুলে গেছি। করি কি, তখন আর সময় ছিল না, কাজেই কোট আমার সেই বহুরূপীর সাজ-

সরঞ্জামের ভিতর গুঁজে রেখে দিলুম। তখন ভয়ে আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে—যদি লিলি ধরে ফেলে—যদি চিন্‌তে পারে! কিন্তু ভগবানের দয়ায় সে তা পারলে না। ভিখারী সাজতে সাজতে এমন পোক্ত হয়ে গেছি—যে নিজের স্ত্রীর চোখে ধূলো দিলুম। যাক্ আমারই স্বমুখে—আমিই খুন হয়েছি বলে প্রচার হল, লিলিও রক্তের দাগ এখানে ওখানে দেখে মূর্চ্ছিত হলো। এও আমার সৌভাগ্য বল্‌তে হবে, কারণ ইন্‌স্‌পেক্‌টার সাহেব আর কনেষ্টবলেরা তাকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে গেল—আর আমিও সেই স্বযোগে তাড়াতাড়ি একটা পেন্‌সিল্ দিয়ে একটুক্‌রা বাজে কাগজে তাকে ভরসা দিয়ে দু'লাইন চিঠি লিখলুম, তারপর অন্য একটা চিরকুটে লিলির নাম ও ঠিকানা লিখে, সেই কাগজ দু'খানা আর আমার নোটের তাড়াটা চুপি চুপি গিয়ে মগ চাকরটার হাতে জিম্মা করে দিয়ে, চিঠিখানার ঠিকানা অপর কারুর দ্বারা লিখিয়ে ডাকে দিতে বলে এলুম।

তার একটুখানি পরেই ইনস্‌পেকটার সাহেব ফিরে এলেন এবং তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করে আমাকে গ্রেপ্তার করলেন—এই আমার ইতিহাস। কেবল স্বরূপ প্রকাশ হবার ভয়ে আমি স্নান করিনি—জলের ধার দিয়েও যাইনি, তবুও আপনাদের হাতে ধরা পড়লুম।"

গুস্ সাহেব এমন একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে

সকলেই ব্যথিত হইল। এতক্ষণের পর প্রৌঢ় ইনিস্পেক্টার কহিলেন—

"চিন্তা নাই, আমাদের কারও দ্বারাও আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ হ'বে না, আমি যেমন করে পারি আজই আপনাকে ছেড়ে দেব। যখন গুস্ সাহেব নিজেই এখানে হাজির তখন তাঁকে খুন. করবার সন্দেহ যে মিথ্যা তা আর কারুকে বোঝাতে হবে না, সুতরাং আমি ভিখারীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলে আমারও দুর্ণাম রটবে না। এখন আপনি আমার কোয়ার্টারে চলুন—এই বেলা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে নিন—একবার হাকিমের কাছে হাজির হতে হবে। আপনার নিরুদ্দেশের জন্য মনে মনে একটা গল্প রচনা করে রাখুন—ব্যস। কিন্তু সাবধান—ফের যদি কখনও ঐ উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করেছেন দেখি কিম্বা শুনতে পাই—সেই দণ্ডেই আপনার গুপ্ত কথা মায় সংবাদ পত্রে পর্য্যন্ত ছাপা হতে বাকী থাকবে না—এ কথা স্মরণ রাখবেন।"

"আবার! এই নিজে নিজের নাক কাণ মলছি! আপনাদের এ উপকারের জন্য চিরকৃতজ্ঞ রইলেম্, শত শত ধন্যবাদ!"

সত্যব্রত হাসিয়া কহিলেন—"শুধু মুখের ধন্যবাদে চলবে না, জানেন তো পুলিশের লোক কিছু লোভী হয়, যখন বন্ধুত্ব হল, তখন আমাদের অন্য আর একটা কাজে কিছু সাহায্য করতে হবে।"

"আপনাদের এমন কি কাজ আমার দ্বারা হবে? তবুও প্রতিজ্ঞা করছি প্রাণপণে সাহায্য করতে কখন বঞ্চিত হব না।"

"উত্তম—এবার আমাদের কাজটা আপনার সেই ঠিকে মনিবের বাগান বাড়ীর ধার দিয়েই আরম্ভ হবে। যাক সে পরের কথা, এখন বিদায়—যথা সময়ে আপনার বালিগঞ্জের বাড়ী গিয়ে অতিথি হব। লিলি বিবিকে আমার প্রীতিসম্ভাষণের সঙ্গে এই সংবাদটা দিয়ে আমাদের এই তুটী বন্ধুকে বাধিত করবেন।"

বলিয়া, সত্যব্রত গোরার হাত ধরিয়া, মধুর হাসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

হারাধন

সপ্তাহ খানেক পরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ববর্ত্তী সাত পুকুরের বড় বাগানের কাছাকাছি একটা ছোট খাট বাগান বাড়ীর পিছন দিকে তিন চার জন চাষা একটা ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। ক্ষেতের এক প্রান্তে সেই বাগান বাড়ীর বুক সমান উঁচু প্রাচীরের উপরের ঘনসন্নিবিষ্ট লোহার গরাদের গায়ে

খুব মজবুত করিয়া তারের জাল এমন ভাবে নিবদ্ধ ছিল যে সেখান দিয়া মানুষের প্রবেশ করা দূরের কথা—ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালও গলিয়া যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ। সেই প্রাচীর ভিত্তিমূলে বসিয়া একব্যক্তি ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে বারম্বার উঠিয়া বাগান বাড়ীর ভিতর দিকে চাহিতেছিল। সেই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া ক্ষেতের অপর প্রান্ত হইতে অন্য একজন চাষা জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কাজ কর্‌তে কর্‌তে একশোবার উঠে ওদিক-বিগে দেখ্‌তিছিস কি বলতো ?"

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া ক্ষণকালের বিপুল চেষ্টায় তো—তো—করিয়া জবাব দিল—"ওই বাগিচেখানার বাহার, গোলাপ ফুল যে এত বড় হয় তা মোদের দেশের কেউ চক্ষে না দেখিলে পিত্যয় যাবেক নি।"

ওই কয়টা কথা বলিতেই লোকটার কণ্ঠার ও কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিয়া মুখখানাকে এমন বিকৃত করিয়া তুলিল যে তাহা দেখিয়া প্রশ্ন কর্ত্তা হাসিতে হাসিতে পার্শ্ববর্ত্তী একজন বৃদ্ধ চাষাকে কহিল—

"কি মানুষই রেখেছিস খুড়া, শালা যেমন হাবা-গোবা—তোৎলা—তেমনি জংলা দেশে ঘর—গোলাপ ফুল চোখে দেখেনি !"

বুড়া সাদাসিধা ভাল মানুষ, ঈষৎ হাসিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে কহিল—

"তা সে চাষার গাঁয়ে গোলাপ দেখবে কোথা, তাই অবাক হয়ে গেছে কিন্তু, তুই যখন তখন ওর পিছু অমন করে লাগিস নি —তা হলে লোক টি\`কবে নি। দেখতিছিস তো—আজকাল এই রোয়ার দিনে কি জন-মজুর মেলে? হাবা-গোবা ব'লেই এত সস্তায় পাওয়া গ্যাছে। তোৎলা হোক্—জোয়ান যেমন —তেমনি ভূতের বাড়া খাটৃতিছে। ওই পাঁচীলের ধারে যা গেঁদে লেগেছিল তা আর এ বছর মোরা খুড়ো ভাইপোতে মারতে পারতুম না ও কিন্তু আজ চার দিন নতুন এসেই তার আর্দ্ধেকেরও বেশী সাফ করে ফেলেছে।

"তা কাজের লোক দেখতিছি বটে, কিন্তু শালা দিন রাত্তির যে পান খায়—ছ'কস বেয়ে লাল ঝরতিছেই, দেখলে না-হেসে থাকা যায় কি? আর কথা কইতি তো—তো করে মুখখানাকে যেমন সংয়ের পারা করি তোলে, তাতে ওকে রাগিয়ে মজা দেখতে সাধ করে নি?"

বৃদ্ধ ঈষৎ বিরক্তিভরে কহিল—"না না, তা করিস নি, নেশা ভাং করেক নি—তামাকটি পর্য্যন্ত লয়, তা ছ'টো বেশী পান খাবে নি তো খাটবে কিসের জোরে? তাও তো ওর নিজের কড়িতেই কিনে খায়। বেচারা নেহাৎ ভাল মানুষ বোষ্টমের ছাওয়াল তায় লতুন কলকাতায় এয়েছে—সেইজন্যে নিজের আলাদা বাসায় থেকে, নিজের খেয়ে—অত কমে আমাদের কাছে

ঠিকে জন খাটতি আসে। নইলে ওর ভাবনা কি? লোকে লুফে নিবে যে! রামবাবুজী লোকের জন্যে আমাদের কত বলতিছে—দেখতিছিস তো, তিনি খবর পেলে এখুনি ছোঁ মেরে লিয়ে যাবে যে?"

"সেইজন্যেই তো বলি—তুই যাই বলিস ও লোক টিঁকবে নি। দেখিস নি রামবাবুজীর ওই বাগান বাড়ীটার কথা হামেসা খালি শুধোয়, আব ওখানে যে পাগলাটা আছে—সে এসে দাঁড়ালেই তার সাথে কথা কইতি থাকে—"

বৃদ্ধ সভয়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিল—

"আরে চুপ চুপ বাতাসেরও কাণ আছে, রামবাবুজী জানতি পারলে আর আমাদের তার ভুঁই চষি খাতি হবে নি। সেটা একটা দানা, নইলি পরে ওই ভূতো বাগানটাতে থাকতি পার তো? রাত ভোর এমন ধারা সব বিকট আওয়াজ হয় যে মরা মানুষের পিলে কেঁপে উঠে, তারির লেগেই তো চাকর দরোয়ান সাঁঝের পরে কেউ হোথায় থাকে নি। বাবুজী কি আর কথা কইতি মা না করে দেছে সাধে—শালার চাউনি দেখিস নি?"

"দেখিনি তো আর বলতিছি কিসের লেগে? ও শালা নৈতুন মানুষ কিছু জানে নি তো, তাই ওই ক্ষেতটার গেঁদে সাফ করতে রাজী হয়েছে, নইলে কত জন মুনিষকে বলেছিলি

কেউ এয়েছিল কি, তাই তো বল্‌তিছি তোকে যে গতিক ভাল লয় ও মুনিষ তোর টিকবে নি খুড়া, ও যখন সেই পাগলা দানার সাথে রাকাড়তি সরু করেছে—”

বৃদ্ধ আবার সভয়ে চাপা গলায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—

“আরে চুপ চুপ তোর আক্কেল কি হবে নি, এ ভয়ের কথা কাণে গেলে ও লতুন মানুষ আজই পালাবে,আর ওদিকে বাবুজীর কাণে উঠলে আমাদেরও হায়রাণির একশেষ না করে ছাড়বে নি। ওসব কথা আর মুখে আনিস নি। আর দু’টো দিনেই ও ক্ষেতের কাজ হয়ে যাবে তখন ওকে আর এদিক বিগে না খাটালেই চলবে। এ দুটো দিন ওর দিগে আর লজর রাখিস নি—যা খুসী করুক—ক্ষেতটা তো তোয়ের কচ্ছে সেইটেই আমাদের লাভ।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই তোৎলা চাষাকে কহিল—“হাত চালিয়ে আজকের মত সেরে নিয়ে আয় ভাই।”

তোৎলা চাষা তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই জবাব করিল—“এ—এ—এগিয়ে চল তোমরা—কাঠা খানেক ভুঁই বাকী—এটুকু ঝট্‌পট্‌ সেরে লিয়ে আসতিছি—নইলে পরে রাতারাতি এ শালা গেঁদের ঝাড় হাত খানেক করে শিকড় চালিয়ে দিবেক।”

বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রের পানে প্রসন্নভাবে চোখের ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে সঙ্গে হইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। ক্ষেতের বাহিরে গিয়া যুবক কহিল—"এ শালার নেহাৎ মরণ দশা ধরেছে খুড়ো, নইলে ভরা সাঁঝে ও ক্ষেতে কাজ করতি থাকে?

"চুপ—চুপ—মোদের সে কথায় কাজ কি, এমন খাটিয়ে জোয়ান মুনিষটা টিকলে মোদেরই ভাল।"

উভয়েই একবার পিছন ফিরিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, কিন্তু সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে কেহই দেখিতে পাইল না যে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাগান বাড়ীর ভিতরে তাহাদের কথিত সেই 'পাগলা দানা' তোৎলা চাষার নিকটে আসিয়া প্রাচীরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তোৎলা চাষা তৎক্ষণাৎ একটা কাগজের সরু লম্বা মোড়ক পেটের ভিতর হইতে বাহির করিয়া তারের বেড়ার ফাঁক দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিল। পাগলা মোড়াটি হাতে পাইয়াই আনন্দে বলিয়া উঠিল—"আর রাত দু'পুরে এসে শালা আবার জ্বালাবে, কিন্তু ভাই তুমি বেঁচে থাক দাদা—আর তাকে ডরাই নি—দুদিনের মউজ আমার মজুত রইলো। কাল কিন্তু আর কিছু বেশী করে দিতে হবে দাদা।"

চাষা চাপা গলায় কহিল—"যদি আমার মতে চল।"

"চলবো—চলবো—নিয্যস চলবো—দিলেসা করছি।"

"বেশ—ওই কাগজের টুকরোতেই লেখা আছে—পড়েই পুড়িয়ে ফেলবে, হুঁসিয়ার।"

বলিয়াই চাষা আর তাহাকে কথার অবসর না দিয়া ত্রস্তে চলিয়া গেল। পাগল মূহূর্ত্তকাল আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া পিছন ফিরিতেই তাহার ঘরের কাছে ক্ষীণ আলোকের রশ্মি দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়ক সাম্‌লাইয়া লইল। গৃহের নিকটে আসিতেই গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—"কাঁহা গ্যয়েথে রে?"

"ধূঁতরো আন্‌তে আর কাঁহা, শালা গাঁজাটাও তো দম্ ভোর দিবি নি—কি করি!"

"তোম্ শারে কেত্তা নেশা করোগে, চণ্ডু—কোকিন গাঁজা—ধূত্তর—দিন ভোর মরা আদমিকো সামিল হো কর পড়া রয়তা, অব খানা খা যা।"

দরোয়ান খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। পাগলার কাণে সদরে তালা বন্ধের শব্দ প্রবেশ করিল। সে তাড়াতাড়ি ক্ষীণ দীপালোকের সম্মুখে আসিয়া কাগজের মোড়াটি খুলিল। অমনি যে পরিমাণ সাদা গুঁড়া তাহার চক্ষে পড়িল, তাহাতে তাহার অত্যন্ত শুষ্ক মুখে এবং কোটরগত জ্যোতিহীন চক্ষেও যেন আনন্দের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

ঘরের এক কোণে পানের উপকরণ ছিল, তাড়াতাড়ি গোটা দুই পান সাজিয়া লইয়া, খানিকটা সাদা গুঁড়ার সহিত মুখে

পুরিয়া দিল, তারপর লুক্কায়িত স্থান হইতে একটা ছোট শিশি বাহির করিয়া—বাকী গুঁড়াগুলি তাহাতে পুরিয়া সেইস্থানে আবার লুকাইয়া রাখিল; তারপর ক্ষীণ দীপালোকের পার্শ্ববর্ত্তী —মেঝের উপরে আপনার জীর্ণ মলিন শয্যার উপরে আসিয়া বসিল। তখনো সেই মোড়কের কাগজটুকু হাতে ছিল। হঠাৎ যেন কি কথা মনে পড়িল—তাড়াতাড়ি কাগজের টুকরাটুকু আলোর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। কিন্তু তখন তাহার চক্ষের জ্যোতি এমন নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল যে পড়িতে পারিল না। তেমনিভাবে সেটুকু হাতে লইযাই নিস্পন্দবৎ আড় হইয়া পড়িল।

কতক্ষণ যে সেভাবে কাটিয়া গেল—তাহার হুঁস রহিল না, সহসা শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার নেশার ঘোর কাটিয়া চৈতন্য ফিরিল, ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ হইয়াও তখনো মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। তাড়াতাড়ি উস্কাইয়া দিতেই হস্তচ্যুত কাগজটুকুর উপর নজর পড়িল। ত্রস্তে সেটুকু তুলিয়া লইয়া এবার কষ্টে পড়িল—

"চনুচনিয়া যা করিতে বলে—বিনা ওজরে রাজী হইও—তাহাতেই মঙ্গল হইবে—বিশ্বাস কর—বন্ধু। এটুকু পোড়াইয়া ফেলিও।"

কথা কয়টার ভাল রকম অর্থ বোধ হইল না—আবার মস্তিষ্কের জড়তা আসিল, কিন্তু কাগজের টুকরাসহ একখানা হাত

যেন আপনা-আপনি প্রদীপের শিখার কাছে উঠিল এবং সেটুকু জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা আবার যে অবশ হইয়া বিছানার উপরে নামিয়া পড়িল—তা তাহার হুঁস রহিল না। জ্বলন্ত কাগজের আগুন অবিলম্বেই নিবিয়া গেল বটে কিন্তু বিছানার চাদরের একপ্রান্ত ধরিয়া ধোঁয়াইতে লাগিল—সে কিছুই টের পাইল না—নিস্পন্দবৎ পড়িয়া রহিল।

সেই মুহূর্ত্তে একব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"এ কেয়া হ্যায় ?"

সেই চীৎকারে সংজ্ঞা ফিরিয়া, চম্‌কাইয়া উঠিয়া বসিতে গিয়া পাগলা এমন ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিল, যে পিল্‌সুজে আঘাত লাগিয়া জ্বলন্ত প্রদীপটা বিছানার উপরে উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেল এবং হতভম্ভ আগন্তুকের চোখের সাম্‌নেই দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত কয়েকের ভিতরেই চাদরখানা ভাল রকম ধরিয়া উঠিল। অথচ পাগলা দিব্য নির্ব্বিকার চিত্তে একটুখানি পিছনে সরিয়া গিয়া পরম আরামে দেয়ালে ঠেস দিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। আগন্তুক ঘৃণাভরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল—"ইঃ নেশায় শালার মগজ একদম বিগড়ে দেছে। আর গৌণ করলে চল্‌বে না।"

বলিয়াই চীৎকার করিল—"পাঁড়ে, খুবলাল—পানি জলদি।"

অবিলম্বে দুইজন চৌগোঁফাধারী পালোয়ানের মত

হিন্দুস্থানী দুই ব্যক্তি জলসহ প্রবেশ করিয়া সেই দৃশ্য দেখিয়াই মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপরেই অগ্নি নির্ব্বান করিল। আগন্তুক প্রশ্ন করিল—"এ হাল ক্যায়সে হুয়া ইন্‌কো ?"

পাঁড়ে বিজ্ঞতা হাজির করিয়া কহিল—"শারে কো গাঁজা নেহি দিয়া বোলকে বাগান সে ধূস্তুর লে আকে খায়া।"

"জল্দি শিরপর পানি ডারো।"

অতঃপর সেই দুইজন অসুর পাগলাকে শূন্যে তুলিয়া বাহিরে লইয়া গেল। আগন্তুক ডাকিল—"ভিতরে আও বাড়ীউলী।

একজন আধাবয়সী কণ্ঠিধারী স্থূলকায় স্ত্রীলোক ঘৃণাভরে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। আগন্তুক কহিল,—"দেখলে তো তোমার বোনপোর হাল ? ধুত্‌রা খেতে ধরেছে শুন্‌লুম। প্রথম আফিং থেকে স্থরু করে গুলি, চণ্ডু কোকেন, শেষ ধূতরায় উঠেছে—আর বেশীদিন নয়, এইবারে দেখছি ফাঁকি পড়তে হল—সব মাটী।"

"সে কি গো! এঁ্যা তবে আর এত করে মরলুম কিসের তরে ? ওর মা যে ঘর দু'খানা আর সামান্য জমীজমা রেখে গেছে তার আর আয় কি ? নিজেই দেখছো তো, তা এতদিন কুড়োকে পুষতেই সব যাচ্ছে তবু সে হারামজাদীকে কিছুতে এপথে আনতে পারলুম না যে দশ টাকা উপায়ের আশা থাকবে ? কোথেকে ওই গুণ্ডো গোরা নচ্ছার জুটে

সব ভেস্তে দিলে, তবু এই হারুর জন্তেই এখনো সে বেটীকে পুষতে হচ্ছে। এখন ভরসা যা—হারুর সঙ্গে যো-সো করে কোন রকমে একবার গৌরীর মালা বদলটা করিয়ে দেওয়া—তা যেমন করে হোক করতেই হবে, নইলে—"

"তাইত বলছি হারামজাদার মাথা নেশায় এত খারাপ হয়েছে তবুও নিজের কোট ভোলে না,—এত কষ্ট দিচ্ছি—আটক করে রেখেছি—তবুও বাগাতে পারছিনি, সেই এক গোঁ। এখন তুমি যদি বল যে কুড়ো নষ্ট হয়েছে তবেই তার বিশ্বাস হতে পারে, তা হলে আর গৌরীকে বিয়ে করতে আপত্তি করবে না। নইলে, আমরা কুড়োকে নষ্ট করবার এত চেষ্টা এত মতলব করেও হেরে গেছি—একথা ঘুণাক্ষরে টের পেলেও আর কিছুতেই গৌরীকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। অন্য আপত্তি যা ওর ছিল তা আমি অনেক চেষ্টায় ভেঙ্গে দিচ্ছি, কেবল এখন এইটাই হচ্ছে প্রধান বাধা।"

"আচ্ছা, সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি, কিন্তু তা'হলে বিয়ে তো কাল পরশুই দেওয়াতে হবে, তারা সব ঠিক করে রেখেছে তো?"

"সে তোমাকে ভাবতে হবে না, গৌরীকে পরশু সাঁঝে ঠিক হেথা তারা এনে হাজির করবে—গুরুদয়ালের বাগানে আমার লোক মোতায়েন করে রেখেছি, তুমি খালি তোমার বোনপোকে দুরস্ত কর।"

"তারপর গৌরীর বাপের উইল—"

"হাঁ—হাঁ—সে সব ঠিক আছে—এ্যাটর্নী তো আমাদের হাতে। বিয়ে দেওয়ার পরেই একখানা সাদা ষ্ট্যাম্প কাগজে হারাধনের সই করিয়ে নিতে হবে, সাক্ষী সাবুদ সব আমার মজুদ আছে ব্যস্।"

এতক্ষণের পরে বাড়ীউলী তাহার প্রতি একটা প্রখর বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—

"কিন্তু দেখো ভাই শেষ যেন আমার সঙ্গে বেইমানী করোনা, তোমার কত বড় বড় কাজ আমি হাসিল করে দিচ্ছি—সেই কথা যেন মনে থাকে রামবাবু। আমায় যা বলেছ—নগদ দু'হাজার দিতে হবে—এসব কাজে বাকী বকেয়া চলবে না কিন্তু ভাই—আপনার বোনপোর সর্ব্বনাশ করছি শুধু তোকে ভালবেসে ঢন্‌ঢনিয়া।"

"তা জানি পদ্ম কিন্তু তুই আমার ভালবাসার এত খোঁটা কেন করিস বল্‌তো? ভেবে দেখ্‌তো—তোর আমি কিছু করিনি? খেতিস বোষ্টম ভিখিরিদের সঙ্গে এদেশ সেদেশ ঘুরে—ভিক্ষা করে আমি তোকে কলকাতার বাড়ীউলী বানিয়েছি।"

"তা কি অস্বীকার যাই কখনো, তবু তোরা পুরুষ জাত বলে বলতে হয়।"

"ওঘরে যা—ওঘরে যা—ওই ওরা আস্ছে, ঠিক সময়ে ডাকবো—কাণ খাড়া রাখিস।"

বাড়ীওয়ালী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই দ্বারবানদ্বয় হারাধনকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না যে সেই কক্ষের গরাদে আঁটা খোলা জানালার বাহিরের দিকে রাস্তার ধারের প্রাচীন বটগাছের উপর নিঃশব্দে বসিয়া সেই তোৎলা চাষা তাহাদের সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরিচয়

বড়বাজারের মীরবহর ঘাটের কাছাকাছি গঙ্গার ধারের নির্জ্জন রাস্তায় অতি প্রত্যুষে এক মুসলমান সহিস ঘোড়া টহলাইতেছিল। সবেমাত্র ভোর হইয়া আসিয়াছে গাছে বসিয়াই কাকের দল ডাকাডাকি করিতে সুরু করিয়াছে। তখনো সে পথে লোক চলাচল সুরু হয় নাই। কেবল ঝন্ ঝন্ শব্দে দিক মাতাইয়া দু'একখানি স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি বাহির

হইতেছে আর দূরে দূরে এক একজন মিউনিসিপালিটীর ঝাড়ুদার ধুলার মেঘ সৃষ্টি করিয়া নীরবে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। রাস্তার আলো তখনও নিবাইতে সুরু করে নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে কঁ্যা-কোঁ শব্দে সহরবাসীদের অতৃপ্ত নিদ্রায় ব্যাঘাৎ করিয়া দু'একখানি তরকারির গাড়ী সে পথ মাতাইয়া চলিয়াছে এবং গঙ্গাবক্ষেও নৌকার উপরে জাগরণের প্রথম সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সহিস ঘোড়া টহলাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ঘন ঘন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিতেছিল, সহসা ঘন ধূলার আবরণ ভেদ করিয়া এক চাষা একটা তরকারির বোঝা মাথায় লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সহিস তাহাকে দেখিয়াই একবার তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে চাহিয়া লইল, তারপর মৃদু হাসিয়া কহিল—"ইঃ তোমারা ক্ষেতে ফসল তো আচ্ছা হুয়া দেখতা হ্যায়?"

চাষাও মৃদু হাসিয়া জবাব করিল—"হবেনি, কত বড় লোকের জমী—রামচরণ ঢন্‌ঢনিয়া! আপনি তার সহিস—আপনার পোষাক দেখলেই লোকে তাক্ হয়ে যায়—তেমন বাবুর জমী কি খারাপ হয়, তার আবার আজ চারদিন থেকে আমি নিজে সে ক্ষেতের গেঁদে সাফ করতে লেগেছি। আর দুটোদিন মাত্র—আজ আর কালকের দিনটা হলেই সব গেঁদে একেবারে বেবাক ঝাড় শুদ্ধ সাফ হয়ে যেতে পারে।"

বলিয়াই চাষা তরকারির ঝুড়ীটা দুই হাতে করিয়া সহিসের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। সহিস এক হাতে ঘোড়ার মুখ ধরিয়া অন্য হাতে তরকারি বাছিতে বাছিতে এমন মৃদুস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া চাষার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল যে তাহাদের নিকটে কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহা বুঝিতে পারিত কিনা সন্দেহ। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া তরকারি বাছাবাছির পরে সহিস দুইটা বড় পেঁপে বাহির করিয়া লইয়া কহিল—

"এ দুটো আমার কোচোয়ান সাহেবকে ভেট দিতে হবে, বহু চেষ্টার পরে সাহেব সদয় হয়ে মনিবকে বলে আমার চাকরী করে দেছে, নইলে আজ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত!"

চাষা দুঃখিত ভাবে কহিল—"সে কি বল্‌ছেন, ও দুটো যে কত কষ্ট করে আপনার জন্যই সংগ্রহ করে এনেছি অমন গাছ-পাকা পেঁপে কি সহরে মেলে?"

সহিস ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"না বন্ধু বোঝ না, এখনো ঢের কাজ তাকে দিয়ে বাকী—এর চেয়েও গাছ-পাকা ফল আদায় কর্‌তে হবে তো?"

"আমার তবে আর গুরুদয়ালের বাগানে—"

সহিস আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া চাপা গলায় কহিল—"না, সেদিকে রমেশ আর কালোর ভার। তোমাকে এ দুটো দিন ক্ষেতে গেঁদে সাফ কর্‌তে হবে—নইলে

ফসল পাবে কেমন করে? মনে রেখ—বেলা এগারটা থেকে একটা—এই দু' ঘণ্টা মাত্র আমার আবার ছুটী।”

গ্যাসের আলো নিবাইতে নিবাইতে একটা লোক তাহাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। চাষা অভিবাদন করিয়া বিদায় লইবার উপক্রম করিতেই সহিস দ্রুত একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়াই—ঘোড়ার মুখ ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। চাষাও ট্যাঁক্ হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া গণিতে গণিতে বিপরীত দিকে চলিয়া গেল।

এগারটার সময়ে সত্যব্রতের বাসায় তাহার প্রিয় ভৃত্য কালো অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে আপনা-আপনি বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চায়ের জল গরম করিতেছিল। পাশেই স্নানের ঘরে বসিয়া সত্যব্রতের বন্ধু ও সহকারী রমেশ বাবু উত্তমরূপে সাবান ঘসিয়া হাত মুখ পরিষ্কার করিয়া ধুইতেছিলেন। তেমনি সময়ে রামচরণ ঢন্‌ঢনিয়ার নব নিযুক্ত সহিস আসিয়া প্রবেশ করিল। পদশব্দে ফিরিয়া চাহিয়াই কালো রুক্ষস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—

“ছি ছি ছি ছি কি চাক্‌রীই আরম্ভ করছে বাবু, শেষ কিনা জাত-কুল দেবার দাখিল করে তুল্লে, আজ হপ্তাভোর মোছলমান সহিস হয়ে বড় মানুষের বাড়ীতে ঘোড়ার গা ডলাই-মলাই করতে একটু ঘেন্না-লজ্জা হয় না, মা-ঠান্ শুন্‌লে—”

কথা শেষ হইল না, সত্যব্রতের আগমন অনুভব করিয়া রমেশ সেই স্নানাগার হইতেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন।

"তোমার সেই বোষ্ঠবীর সঙ্গে কণ্ঠী বদলের ব্যবস্থা করা যাবে কালো, কেমন তাকে মনে ধরেছে তো?"

"ওয়াক্ থু থু বেটী পর্‌বী—ছায়া মাড়ালে নাইতে হয়,"

বলিতে বলিতে কালো বিকৃত মুখে কেটলীতে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে কহিল—"তোমাদের কি ঘেন্নাপিত্য সব গেছে বাবু? আরে রাম রাম একজন হলেন সহিস—একজন হলেন ছাই মেখে নাগা ফকির, আর আমাকেও জোর করে দলে টেনে এই বুড়ো বয়সে বাঁদর নাচ করাচ্ছেন।

"থাম কালো—এর মজা দেখিস্ কাল, তখন নিত্যি বলবি আমাকে এমনি নাচাও।"

বলিতে বলিতে সত্যব্রত স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সহিসের পরিচ্ছদ ছাড়িতে ছাড়িতে রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হলে ব্যূহ ভেদ করেছে, কেমন যা সন্দেহ করেছিলুম—সেই গুল্লা গৌরব তো?"

"হ্যাঁ, গুল্লা তো একেবারে মস্‌গুল, দু' চারটা মন্তর-তন্তর ঝেড়ে হাত দেখে দু'টো একটা আঁতের কথা ইসারা করতেই সে একেবারে সিদ্ধ সাধু বাবার গোলাম—চেলা বলে গেছে, এখন সাধুবাবা মরতে বল্লেও সে মরতে রাজী, তবে বিষম

ঘড়েল তোমার ওই গৌরবী বেটী। ওখানে তিনি আর গৌরব নন্—স্বয়ং চন্দ্রাবলী—"

রমেশ বাবু আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, মাঝখান হইতে বাধা দিয়া কালো বলিয়া উঠিল—"এখন আসুন আসুন, চা জুড়িয়ে গেল, আজ দু'দিন ধরে হায়রানী হয়ে জঙ্গলে ডাঁসের কামড় খেয়ে প্রাণ যায় যায় হয়েছে, নেয়ে খেয়ে একটু জিরোতে পারলে বাঁচি।"

কালোর কথায় উভয়ে হাসিতে হাসিতে মুখ হাত ধুইয়া ভিতরে আসিয়া চা লইয়া বসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে বর্হিদ্বারে কে হাঁকিল—"আলু-উচ্ছে বেগুণ লিবেক গো।"

কালো ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"না না ওসব কিছু চাই না।"

কিন্তু পরক্ষণেই চাষা একেবারে ঝাঁকাশুদ্ধ উপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—"না বল্লি শুন্‌বেক কেডা, এ তোমার নিতেই হবেক কালো।"

রমেশ ও সত্যব্রত উভয়েই মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। কালো রাগে অত্যন্ত গরম হইয়া তরকারী বিক্রেতা চাষাকে কি কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ বন্ধুদ্বয়ের হাস্য প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়াই থামিয়া গেল, তারপর ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাষার মুখের পানে চাহিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"এ্যা গোরা বাবু

তুমি ? এঃ বাবু দেখছি সবাইকে ক্ষেপিয়েছে, তুমি এমন চাষা সেজেছ যে কার বাপে চিনতে পারে ?"

"তবে বক্‌শিশ্ দেও কালো—শরীর এলিয়ে পড়েছে ভাই।"

"বোস বাবু বোস্, এখুনি চা করে দিচ্ছি।"

বলিয়া কেটলী লইয়া যাইতে যাইতে মৃদু হাসিয়া কহিল—

"আর আমার আপশোষ নেই, যখন একধার থেকে সবাই সং সেজেছ, তখন আমি তো তোমাদের গোলাম—আমি নারাজ হই কেন ?"

রমেশবাবু উৎসাহ দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"সাবাস্ কালো, এইবার ঠিক বলেছ, তোমার মত বলবান বীর পুরুষের উপযুক্ত কথা বটে। এখনো আসল কাজ বাকী—কালকের দিনটা হলেই—"

"এ ঝঞ্ঝাট মিটবে বলে বোধ হচ্ছে।" বলিয়া গোরা মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া কহিল—"কিন্তু একটা সন্দ আমার মিট্‌ছে না। শুনেছিলুম একদল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গার পথে ঘোষপাড়ার মেলায় যাবার সময়ে গৌরীকে তাঁর বাপের 'মশাইয়ের' (গুরু) কাছে নিয়ে যাবে বলে দশ বার দিন সে গাঁয়ে থেকে অনেক করে ভুজং-ভাজং দিয়ে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। অবশ্য সে বেটা-বেটীরা যে ভিখারীর দল এবং সুন্দরী মেয়ে চুরী করে কলকাতায় নিয়ে বিক্রী

করে দাঁও মারবার মতলবে ছিল—এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা না হ'য়ে গৌরী গুরুদয়ালের বাগানে গিয়ে উঠলো কেমন করে? আর এইজন্যই এতকাল ধরে বৈরিগী হয়ে কলকাতার সকল বদ্ পল্লীগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কুল কিনারা পাই নি।"

সে প্রশ্নের জবাব না করিয়া সত্যব্রত কি চিন্তা করিতে করিতে গোরাকে প্রশ্ন করিলেন—"এই গুরুদয়ালকে তুমি চেন নাকি?"

"হ্যা, ছেলেবেলায় দেখেছি। মুর্শিদাবাদে গৌরীর বাপের যে রেশমের কারবার ছিল তার একটা শাখা ছিল কাশিতে, গুরু দয়ালের বাপ জগৎনারাণ বাবু ছিলেন তার অর্দ্ধেক অংশীদার। লোকটী আসল খাঁটী মানুষ—বড় ধর্ম্মভীরু, নিজে হিন্দুস্থানী রাজপুত হলেও গৌরীর বাপকে সহোদর ভাইয়ের মত ভাল বাসতেন, তাঁর স্ত্রীও ছিলেন তেমনি ভাল। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ছেলে পুলে হয়নি বলে শশী চাটুয্যে মশায়ের ওই মা-হারা গৌরী মেয়েটীকে ছেলেবেলা থেকেই কাছে কাছে রেখে মানুষ করতেন। গৌরীর মা মারা যাবার পর চাটুর্য্যে মশাই আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি, বাড়িতেও তেমন আত্মীয় স্ত্রীলোক কেউ ছিল না, তাই তিনি পরম বন্ধু ও কাশীর কারবারের, অংশীদার জগৎ বাবুর উপরেই মেয়ের পালনের ভার ছেড়ে দিয়ে

নিশ্চিন্ত মনে মুর্শিদাবাদে থেকে কারবার দেখতেন। সেইজন্য ছেলেবেলা থেকেই গৌরী প্রায়ই থাকতো কাশীতে। শশীবাবু পাঁচ-ছ'মাস অন্তর কখনো বা কাশীতে যেতেন আবার কখনো বা মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া দু'তিন মাস নিজের কাছেও রাখতেন।"

কালো গোরাকে চা ঢালিয়া দিয়া একপাশে নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার গল্প শুনিতেছিল, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—

"এ গৌরী মেয়েটী কে গো?"

কিন্তু গোরা জবাব করিতে না করিতে সত্যব্রত কহিলেন— "যার জন্য উপস্থিত আমাদের এতগুলি লোকের সং সাজার দরকার হয়েছে।"

"আর যার খোঁজ নেবার জন্যে তুবড়ীওলা সেজে গঙ্গার ধারের সেই ভাঙ্গা বাগানের পিছনের জঙ্গলে সাপ ধরবার অছিলায় ঢুকে বৃন্দে বোষ্টবীর সঙ্গে তাকে দেখে এয়েছ কালো, সেই মেয়েটীরই কথা হচ্ছে।"

বলিয়া রমেশ বাবু হাসিলেন, কিন্তু কালো অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল "সে কি গো, সে কি বাঙ্গালী? আমি তো খোট্টার মেয়ে ভেবেছিলুম।"

"হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে কাশীতে জগৎবাবুর বাড়িতে প্রতিপালিত হয়ে গৌরীর ধাঁজ-ধোঁজ যেমন তাদের মত হয়ে গেছে,

—সাহসও তেমনি পুরুষের চেয়ে বেশী বেড়েছে—ভারি ডাকা-বুকো, তাই সহজেই সেই ভিখারী বোষ্টমদের সঙ্গে নির্ভয়ে গিয়েছিল।"

ঠিক কথা গোরা বাবু, উঃ যে কাণ্ড সে দিন দেখেছিলুম তাতে একটা খুন-খারাপী না হয়ে যেত না, আর বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের মত হলে তার সর্ব্বনাশ নিশ্চয় হত।"

বলিয়া কালো গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"কি, কি, কি দেখেছিলে ?"

কালো গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বলিয়া গেল—"প্রথম যখন সেই উঁচু ঢিবিটার উপরের ঝোপের ভিতর ঢুকে চেয়ে দেখি, তখন জানালার ধারে মাথা নীচু করে মেয়েটি নিসাড়ে বসে কি পড়ছিলো। আমার হঠাৎ মনে হল ঠিক যেন একটি সুন্দর মোমের পুতুল কেউ বসিয়ে রেখেছে,—এমনি সুন্দর ! কিন্তু পড়তে পড়তে সে যে কাঁদছিল তা আগে টের পাইনি, হঠাৎ দেখি মুখ তুলে চোখ মুছ্‌ছে। তারপর আবার পড়তে লাগলো। আমি চলে আসবো ভাবছি—এমন সময় দেখি একজন খুব সুন্দর, গোলগাল হিন্দুস্থানী যুবা পুরুষ পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো—মেয়েটি টের পেলনা। তারপরে যেমন সেই লোকটা পিছন থেকে দু-হাত আস্তে আস্তে বাড়িয়ে জড়িয়ে

ধরতে গেল অম্‌নি বাপ্‌রে কি কাণ্ড! চোখের নিমিষে ধাঁ করে দাঁড়িয়ে উঠেই মেয়েটা তিন হাত সরে গিয়েই পেটের ভিতর একখানা ছোরা বার করে মারতে গেল। লোকটা হতভম্ব হয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে কি বলতে গেল—মেয়েটা বাঘিণীর মত হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো—বাপ্‌রে, তখন তার কি মূর্ত্তি! তারপর কি হল বোঝা গেলনা, দেখি সেই বোষ্টমী মাগী ঢুকে হাস্‌তে হাস্‌তে বাবুটীর হাত ধরে টেনে বাইরে রেখে এলো, তারপর মেয়েটীর হাত ধরে সেই জানালার ধারে এসে বস্‌লে। খানিকক্ষণ দু'জনের, কি কথবার্ত্তা চল্লো, তারপর দেখি মেয়েটীর মুখে হাসি ফুট্‌লো। তখন বোষ্টমী গান আরম্ভ করলে। কিন্তু চমৎকার গলা বটে তার, শুনলে সব ভুলে যেতে হয়—"

রমেশবাবু ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাই বুঝি তার গানে মস্‌গুল হয়ে এ খবর শোনাতে ভুলে গিয়েছিলে কালো?"

কালো জবাব না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রস্থান করিল। গোরার মুখের উপর উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, কি চিন্তা করিয়া কহিল—

"ওই লোকটাই গুরুদয়াল বটে! এখন বোঝা যাচ্ছে যে অসদভিপ্রায়ের জন্যই সে গৌরীকে আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু এর

পূর্ব্বে তার এ রকম মতি-গতির কথা তো কখনো শুনিনি—বরং বোনের মত যত্ন আদর করতো—"

সত্যব্রত প্রশ্ন করিল—"তবে যে বল্লে জগৎ বাবু নিঃসন্তান ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তাই বটে, গুরুদায়ালকে শেষ দশায় একটা ঝোঁকে পড়ে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের কুঠীতে বাবা ছিলেন শশী বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। দূর সম্পর্কে ওঁদের সঙ্গে আমাদের একটু অত্মীয়তাও ছিল। জ্ঞাতিবিরোধে সর্ব্বস্বান্ত হবার পর দেশের সম্পর্ক মুছে ফেলে আমরা সকলে এসে শশী বাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিলুম। তখন গৌরীর বয়স পাঁচ —আমার বারো। এর বছর দুই আগেই—গৌরীর মা মারা যাবার সময় আমার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা পাকা করে গিয়েছিলেন। পরের বছরে বিয়েও হয়ে যেত, কিন্তু সেই সময় মুর্শিদাবাদের কুঠী নিয়ে জমীদারের সঙ্গে সেই ভয়ানক ফৌজদারী বাধে, তিন বছর ধরে কেবলই মার পিট—দাঙ্গা হাঙ্গাম—মোকর্দ্দমা চলে, তারপর বাবা জখম হয়ে মারা যান, মা পাগল হয়ে যান—এই সব কারণে বিবাহে ক্রমাগত বাধা পড়তে থাকে। শেষে বছর ছয়েক পরে আমি যে বার আই-এ পরীক্ষা দিলুম তখন শশীবাবু শয্যাগত হয়ে পড়েন এবং আমাকে জামাই করে বিষয় কর্ম্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হন। আমি কাশী গিয়ে গৌরীকে

নিয়ে আসি। এবং আগেও শশীবাবুর, সঙ্গে. বার দুই জগৎ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম, তখন তাঁদের পোষ্যপুত্র নেবার কথা শুনিনি। কিন্তু শেষ বারে যখন গৌরীকে আনতে যাই—তখন গুরুদয়ালকে সেইখানে দেখি। শুনলুম গৌরীর বিয়ে হলে আর তো তারা কাছে রাখতে পারবে না, তাঁদের শূন্য ঘরে একলা থাকতে হবে, তাই পোষ্যপুত্র নিয়েছেন।"

সত্যব্রত এতক্ষণের পর যেন একটা পথ দেখিতে পাইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—"বুঝেছি আর বলতে হবে না, তারপর শত্রুর ছলে পড়ে তুমি অন্তরণে গেলে, বিয়ে বন্ধ রইলো জগৎবাবুকে সপরিবারে আনিয়ে উইল করে শশীবাবু মারা গেলেন। তাঁরা একবার কাশী একবার মুর্শিদাবাদ যাওয়া আসা করতে করতে বছর দুয়ের ভিতরেই নৌকাডুবি হলেন, গুরুদয়াল সর্ব্বস্বের মালিক হয়ে কাপ্তেন হয়ে উঠ্‌লো। তারপর তুমি অন্তরিণ থেকে ফিরে এসে দেখলে সব ঝোপ ঝাপ সাপ হয়ে মাঠ একেবারে ফাঁকা ধূ ধূ করছে, অমনি বৈরাগ্যের ধমকে একেবারে ভেক নিয়ে সংসার ছাড়লে—ব্যস।"

গোরা ও রমেশ উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। সেই সময়ে কালো ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—এক সাহেব-মেম দেখা করতে এয়েছেন।"

সত্যব্রত তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই

তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া উপরের লইয়া আসিয়া কহিলেন—"মিষ্টার ও মিসেস গুসের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়নি রমেশ, এঁরা আমাদের পরম বন্ধু এঁদের দয়াতেই গুরুদয়ালের বাগানের হদিস করতে পেরেছি।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আয়োজন

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন্ হইতে বড় জাগুলী যাইবার পথে 'পলাশীর বাগান' নামক একটা প্রকাণ্ড উদ্যান বহুকাল হইতে পতিত থাকিয়া এমন জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল যে দিবাভাগেও দস্যুভীতির জন্য লোকে একাকী সে পথে যাইতে সাহস করিত না। তাহার চতুঃপার্শ্বের ছোট বড় গ্রামগুলিও ম্যালেরিয়ায় এবং বিশেষ করিয়া উপর্য্যুপরি দুই বারের মহামারীতে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হাজার হাঁকাহাঁকি চীৎকারেও দশজন পুরুষ একসঙ্গে জড় করা যাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

নরকের পথে

সেই পলাশীর বাগানের মধ্যবর্ত্তী সরকারী রাস্তা হইতে একটা পথ নিবিড় বনভূমির ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গিয়াছিল। প্রবাদ যে সেই অঞ্চলে অতীত যুগের কোন বড় লোকের রেশমের কুঠী কালমাহাত্ম্যে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া শুধুই যে সাপ বাঘ ও দস্যুর আড্ডা করিয়া দিয়াছিল এমন নয়, প্রেতযোনিরও লীলাক্ষেত্র বিস্তার করিয়া দিতে ছাড়ে নাই। সুতরাং গ্রামের কেহই সে অঞ্চলের ছায়াও মাড়াইত না। এমন কি গঙ্গার উপর দিয়া যে সকল নৌকা যাতায়াত করিত, তাহারাও ঘেঁসিয়া যাইতে চাহিত না এবং ঘোষ পাড়ার মেলার সময়ে যখন সে অঞ্চল লোকে ভরিয়া যাইত, তখন অত্যন্ত সাহসী লোকেরা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মাঝে মাঝে দল বাঁধিয়া সেই ভগ্নস্তূপ দেখিতে গিয়াও নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যে সকল গল্প রটাইয়া দিত তাহাতে সে স্থানটা সম্বন্ধে লোকের মনে আশঙ্কা বাড়িত বই কমিত না।

সূর্য্যাস্ত হইবার বিলম্ব ছিল না, গাছের মাথাগুলি রক্তাভ নীচের দিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া উঠিতেছিল। পাখীর দল কলরবে দিক্ মুখরিত করিয়া অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল। তেমনি সময়ে সেই ঘন অরণ্যানী বেষ্টিত কথিত ভগ্নস্তূপের মধ্যবর্ত্তী একটা ছোট দোতালার খোলা বারান্দায় বসিয়া এক সুন্দরী এক বৈষ্ণবীর গান শুনিতেছিল।

চারিদিকেই পাহাড়ের মত অসমান উঁচুনিচু মৃত্তিকাস্তুপ গভীর জঙ্গলে আবৃত হইয়া বাড়ী খানিকে লোক চক্ষের অদৃশ্য করিয়া রাখিলেও তাহা যে হালে মেরামত করিয়া বাসোপোযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত এবং প্রাচীরে বেষ্টিত না থাকিলে ও নিতান্ত পরিচিত এবং অভ্যস্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই যে সেই ঘন-কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানী ভেদ করিয়া সেখানে যাতায়াত করিবার পথ পাইত না তাহাও বুঝিতে বাকি থাকিত না।

গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ মাঝখানে থামিয়া বৈষ্ণবী ঈষৎ অভিমান সূচক স্বরে কহিল—না,তুমি শুন্‌ছোনা আমি গাইব না।

"সত্য ভাই আজ আমার মন কিছুতেই ফেরাতে পারছিনি।"

"কেন, এত বলি শুধু শুধু ভেবনা—তবু—"

"তুমি বল কি ?"

বলিয়া সুন্দরী উত্তেজিত ভাবে কহিল—"আমার মত অবস্থায় যে মেয়েমানুষ পড়েছে তার কি ভাবনার সীমা আছে ? খালি আমি অত্যন্ত সাহসী আর ছেলেবেলা থেকে পুরুষের মত মানুষ হয়েছি বলে সহ্য করে আছি, কিন্তু—"

"কিন্তু, বাবুতো তোমার অজানা নয়—ছেলেবেলা থেকে ওঁর বাপ-মার কাছে মানুষ হয়েছে বলেছ, তবে আর—"

"সেই তো বেশী দুঃখ—বেশী ভয়। বরাবর গুরুবাবুকে

দাদা বলে মান্য করে এয়েছি—বিশ্বাস-ভক্তি যথেষ্ট ছিল। সকল দিক্ দিয়ে আমার কপাল ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে উনি যখন উচ্ছৃঙ্খল হলেন জ্যাঠা মশায়ের—ওঁর বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্য খোলাম কুচির মত দু'হাতে অপব্যয় করতে লাগলেন, কাশীর সব গুণ্ডার দলের সঙ্গে ভিড়ে ভদ্র ঘরের মেয়েদের উপরেও অত্যাচার সুরু করলেন, তখন থেকে আর আমাদের সাক্ষাৎ ছিল না—আমি তখন আমাদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে নানা বিপদে জড়িয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু তখনো মনে আমার ভরসা ছিল, তখনো ভাবতুম—উনি আমার দাদা আমার অভিভাবক। আমার এদিককার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ওঁর পায়ে ধরে ওঁকে কুপথ থেকে ফেরাবো—বিয়ে দিয়ে ওঁকে সংসারী করবো, উনি আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। সেই ভরসাতেই তো—ত্রিবেণীতে হঠাৎ ওঁকে দেখতে পেয়ে, সেই বোষ্টমদের হাত ছাড়িয়ে জোর করে ওঁর কাছে চলে এসেছিলুম। তা নিয়ে ওঁকে হাঙ্গামাও পোহাতে হয়েছিল কম নয়। উনিও হাসিমুখে সকল বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন ভরসা দিয়েছিলেন। তখন তো বুঝিনি ওঁর মনে মনে পাপ দুরভিসন্ধি ছিল, আমাকে এই নিবান্ধা জঙ্গলে এনে কারাগারে পুরে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করবেন। তা'হলে—আমার, যতই বিপদের সম্ভাবনা থাকুক সেই বোষ্টমের দল ছেড়ে, আত্মীয় ভেবে এঁর কাছে আসতুম না।"

বলিতে বলিতে দুঃখে ঘৃণায়, ক্ষোভে সুন্দরীর মুখ রাঙা হইয়া চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল। বৈষ্ণবী ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখ পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—

“যা হোক ধন্য সাহস বটে তোমার, সুন্দরী—যুবতী হয়ে—একা ঘর দোর ছেড়ে সেই সব অচেনা বোষ্টমদের সঙ্গে কি করে চলে এলে?”

“কে বল্লে অচেনা? তাদের যে সর্দ্দারণী তার বোনের বাড়ী ছিল যে আমাদেরই পাড়াতেই! তার ছেলে আমাদের রেশমের কুঠীতে কাজ করতো শেষ এক সদ্গোপের মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়ে দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে ওঠে। তাই নিয়ে গাঁয়ে ওদের জাতের ভিতরে কত ঘোঁট হল—মাগীকে নাস্তানাবুদ করে তুল্লে, সে দু'জন সরে পড়লো—মাগীও মরে জুড়ুলো। তখন ওই সর্দ্দারণী তার বোনের বাড়ী দখল করে বসলো। সে গাঁয়ের ঢের লোককে সঙ্গে নিয়ে কবার ঘোষপাড়ার মেলায় গেছে—সে তো আমাদের অচেনা নয়? তা ছাড়া স্বামীর জন্য হিন্দুর মেয়ে কি না করতে পারে? আমার মাথার উপর কেউ নেই—সম্পূর্ণ একা দেশের সবাই বাবার বিপক্ষ—ছিল, কেবল তাঁর তেজে আর পয়সার জোরে কিছু করতে পারতোনা বই তো নয়,তাদের কাছে থেকে কোন রকম সাহায্যের প্রত্যাশা ছিল না, কাজেই আমার কাজ আমি নিজে না করলে চলবে কেন?

আমার স্বামীর অমন বিপদ, মিছে অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে কোথায় যে কি ভাবে আছেন কিছুই জানি না। তাই বাবার যিনি 'মশাই' (গুরু) তিনি ছাড়া আর কার কাছে সাহায্য চাইতে যাব বল? তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ—পরম ক্ষমতাবান, কিন্তু কোথায় থাকেন জানতুম না, শুনেছিলুম ফি বছর মেলার সময় ঘোষপাড়ায় আসেন তাই আমার স্বামীর সন্ধানের জন্য তাঁর সাহায্য নেবার দরকার হয়ে ছিল।"

বৈষ্ণবী আবার মুচকি হাসিয়া বলিল—"তা সেন বুঝলুম, কিন্তু সোয়ামী সোয়ামী কচ্ছ যে, বিয়ে তো তোমাদের হয় নি—

সুন্দরী উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল—

"না হোক লোক-দেখানো বিয়ে, আসল বিয়ে বাবা-মা আমার ছেলেবেলাতেই বাকদান করে, দিয়ে গেছেন, যেখানে যে অবস্থায় থাকুন—তিনিই আমার স্বামী।"

বলিয়া, অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে উপসংহার করিল—"কিন্তু, আমাদের বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য প্রকাশ্যে বিয়ে আবশ্যক। বাবার উইলের বলে আমাদের বিয়ের পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী তিনি—"

বৈষ্ণবী আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল—"আর যদি তার সঙ্গে প্রকাশ্য বিয়ে না হয়—কিম্বা তোমার কুপথে গমনের প্রবৃত্তি—"

"তা'হলে উইলের সর্ত্তে, সামান্য একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভিন্ন

আর সমস্তই দেব-সেবায় যাবে আর তার একমাত্র অভিভাবক হবেন জগৎ বাবু। এতেই তাঁর মরণকালের শেষ ইচ্ছাও সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমার বাল্যকালে যাঁকে বাকদান করে গেছেন—সেই শ—শ—শ—মুকুজ্যে—তিনিই আমার স্বামী। এখন বোঝ আমাকে নিঃসহায়—অনাথা দেখে শত্রুরা দশজনে সেই বিষয়-সম্পত্তি লুটে নেবার চেষ্টা করেছে আর আমি কি আমার স্বামীর সন্ধানে এক মুহূর্ত্ত দেরী করতে পারি?"

সহসা অদূরে পদশব্দ উঠিয়া বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিল—উভয়েই সাবধানে উঠিয়া দাড়াইল, পরক্ষণে গুরুদয়াল ম্লানমুখে কাছে আসিয়া কহিল—দিন দুয়ের জন্যে তোমাদের এখানে একলা রেখে আমায় একটা বিশেষ কাজে যেতে হচ্ছে, গৌরি। আমার এ্যাটর্নীর একটা জরুরী তার পেয়েছি না গেলে মহা অনিষ্ট হবে, তাই এখনি চল্লুম, তোমাদের কোন ভয় নেই—সব সুবন্দোবস্ত করে গেলুম।"

গৌরি বিদ্যুতের বেগে দূরে সরিয়া গিয়া রক্ত চক্ষে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"খবরদার, কাছে এস না, কতদিন ক'বার করে মাপ চেয়ে আবার তা ভুলে যাবে, লজ্জা করে না তোমার কাপুরুষ! যাচ্ছ—যাও, আর কথা বাড়িওনা।"

বৈষ্ণবী গৌরীর অলক্ষ্যে গুরুদয়ালের পানে চাহিয়া চোখ টিপিয়া কি ইঙ্গিত করিল। গুরুদয়ালয় পুনরায় হাসিয়া কহিল—

"আচ্ছা উকীল বাড়ীর জরুরি কাজটা সেরে ফিরে আসি আগে, তারপরে বোঝা যাবে—কেমন দয়া মায়া না করে থাকতে পার।"

বলিয়া, বৈষ্ণবীকে একটু তফাতে ডাকিয়া লইয়া, চুপি চুপি কি বলিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু সেই মূহূর্ত্তে বৈষ্ণবীর মুখখানা যে সহসা উজ্জ্বল হইয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল তাহা গৌরী কিম্বা গুরুদয়াল কেহই জানিতে পারিল না। ব্যস্তভাবে গৌরীকে কহিল—"তুমি ঘরে গিয়ে একটু বোস দিদি এই জঙ্গলের ভিতরে দুটী মেয়ে মানুষে রাত কাটাতে হবে, রত্নাকে আর দরয়ানকে ভিতরের বারাণ্ডায় এসে থাকতে বলে আসি।"

বলিয়াই এমন ভাবে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল যে গৌরীর মনে একটুখানি সন্দেহের খটকা লাগিতে বাকী থাকিল না। গুরুদয়াল ও বৃন্দা বৈষ্ণবী সম্পর্কিত এই সন্দেহ গৌরীর মনে প্রথম হইতেই যে জাগে নাই—এমন নয়, কিন্তু এই নির্জ্জন কারাবাসে একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গ লোভে সে তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল, এখন আবার তাহা জাগিল এবং মনের আবেগে তাহার কাছে আপনার গুপ্ত কাহিণী প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অনুতাপও যে না হইতে লাগিল এমন নয়। নিজের কক্ষ মধ্যে গিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিল। কিন্তু ক্ষণ

বিলম্বেই যে আবার সেই বৃন্দা চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া নিঃশব্দে তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহার মুখের উপরে অত্যন্ত সাবধানে একখানা রুমাল সঞ্চালন করিতে লাগিল তাহা সে টের পাইবার পূর্ব্বেই গভীর নিদ্রায় চৈতন্য হারাইল।

বৃন্দা, দু' চার বার ডাকিল—তারপর গা ঠেলিল, কিন্তু গৌরী নড়িল না। সে তখন দ্রুত বাহিরে গিয়া বারাণ্ডার পার্শ্বে লুক্কায়িত খঞ্জ গুলা—ওরফে রত্নাকে চুপি চুপি কি বলিল। তারপর মিনিট পনেরো কাটিতে না কাটিতে বৃন্দা ও রত্নার সহিত দুইজন মুখাবৃত ভীমাকার পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া নিঃসংজ্ঞ গৌরীকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। গুরুদয়াল তখন তাহার টম্‌টমের বাতি নিবাইয়া প্রায় মাইল দুই রাস্তা অতিক্রম করিয়া একটা বাঁকের মুখে গিয়া পড়িয়াছিল।

নির্জ্জন রাস্তায় দ্রুত দৌড়িতে দৌড়িতে বাঁকের মুখে ঘোড়াটা হঠাৎ কিসে হোঁচট খাইয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পথিপার্শ্বে স্ত্রী-কণ্ঠের বেদনাসূচক ক্ষীণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া গুরুদয়ালকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সহিসকে বাতি জ্বালিতে বলিয়াই তাড়াতাড়ি টম্‌টম্‌ হইতে নামিয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই আলো লইয়া দু'চার পা যাইতে না যাইতে যে দৃশ্য চোখে পড়িল তাহাতে আর তাহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

পথিপার্শে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া শিক্ষিতা মহিলার পরিচ্ছদ-ধারিণী সুন্দরী যুবতী টম্‌টমের চাকায় বিষম আহত হইয়া পড়িয়া গিয়া ক্ষীণ-করুণ কণ্ঠে অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন, গুরু-দয়ালকে দেখিয়াই বলিলেন—

"টম্‌টম্ চাপা দিয়ে মেরে ফেল্লেন আমাকে। এখন শীঘ্র গাড়ীতে তুলে খানিক আগে বাঁয়ে বেঁকে আমাকে পান্‌সীতে নিয়ে চলুন ;—দেরী করলে সাংঘাতিক হবে।"

গুরুদয়াল কথার অবসর পাইল না, সসব্যস্তে যুবতীকে প্রায় বুকে করিয়াই টম্‌টমে তুলিয়া হাঁকাইয়া দিল। কিন্তু যুবতী একহাতে তাহার গলা জড়াইয়া এমন করিয়া গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল যে, সেই স্পর্শে এবং দেহের ঘ্রাণে একটা অত্যুগ্র মাদকতার প্রভাব সে কিছুতেই এড়াইতে পারিল না, অবশেষে গঙ্গার ধারে আবার যখন তাঁহাকে তেমনি ভাবে নামাইয়া নৌকাতে লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল—তখনো যুবতীর একহাত তাহার কণ্ঠে সংলগ্ন ছিল। যুবতী করুণ নেত্রে চাহিয়া মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"যাচ্ছিলেন কোথা ?"

গুরুদয়াল নত নেত্রে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া জবাব করিল—"কলকাতায়।"

"বেশ তো ভালই হয়েছে, রেলে গিয়ে কষ্ট করবার দরকার কি, আমার নৌকাতেই চলুন, খুব ভাঁটার টান আছে—হু হু

করে চলে যাব। বালিগঞ্জে আমার বাড়ী, সেখানে আমায় পৌঁছে দিয়ে, আহারাদি সেরে চলে যাবেন। নইলে, কলকাতায় পৌঁছে আবার গাড়ী করে যেতে যে হাঙ্গামা পোহাতে হয় তা আমি এই অ.হত অবস্থায় একা সাহস করি না।”

গুরুদয়াল মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মত হইল, এবং মাঝিরাও যুবতীর আদেশে তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বৈজু

পরদিন বিকাল বেলা আকাশ জোড়া ঘন মেঘে দিক আচ্ছন্ন করিয়া আসন্ন দুর্য্যোগের সম্ভাবনা জানাইয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেই ছয় জন পশ্চিম দেশীয় গো-ব্যবসায়ী দুইটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূলতানী গাই ও বাছুর সঙ্গে লইয়া রামচরণ চন্দ্রনিয়ার বাগান বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী বটবৃক্ষ তলে বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইল। বাগান বাড়ীর ঈষন্মুক্ত লৌহ ফটকের ভিতরে দেউড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া প্রধান দ্বারবান পাঁড়েজী ভাংয়ের আয়োজনে নিযুক্ত ছিল—গোরক্ষকদিগকে সেখানে

দাঁড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল—"আরে কাঁহা • তোমলোক যাতে হো রে ?"

"যায়েঙ্গে কলকাত্তা—বেলিয়াঘাটা আতেহেঁ—বাকিপুর সে।"

বলিতে বলিতে একজন বৃদ্ধ গোরক্ষক ফটকের নিকটে আসিয়া দীর্ঘ কুর্ণিস করিয়া মিনতির স্বরে কহিল—"লেকেন আভিতো জোর পানি আওয়েগি, চারোতরফ আঁধিয়ার হো গৈ ; যাঁয় কৈসে, উস্ লিয়ে উস্ পেড়কা নীচ গৌ রাখ্‌খা, এ্যায়সা বদ্‌বক্ত যে কুচ কহনেকা নেহি। ইস্ বেরকো দশ সের ত্নধ ভি বরদার হোগা ঔর—"

পাঁড়ে একবার গরুগুলির পানে আগ্রহভরে চাহিয়া, বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ইস্ বের এত্তি ত্নধ দেতা ?"

"হাঁ মহারাজ, বাল্‌তি উল্‌তি হোয় তো একঠো দিজিয়ে, বরবাদ তো হোয়ে গা—ব্রাহ্মণ কো ভোজন মে লাগ যায় তব ভি আচ্ছা হ্যায় ! ঘর কাঁহা মহারাজ আপকা ?"

পাঁড়ে, আশু প্রচুর পরিমাণ খাঁটী ত্নধের প্রত্যাশায় মনে মনে প্রসন্ন হইয়া কহিল—"আরে মুলুক তো হামারা গোরখপুর।"

গোরক্ষক দ্বিগুণ প্রফুল্লিত ভাবে উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল—

"হামলোক ভি তো হুঁয়িকা রহনেওলা ! তুরন্ত একঠো বাল্‌তি দিজিয়ে মহারাজ, আগ্ মুলুককা আদমী হৈ।"

বলিতে বলিতে ফটক ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া একেবারে দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল—"গোড় লাগে মহারাজ জী! দিজিয়ে জলদি বাল্‌তি, আবি পানি গিরে গি।"

পাঁড়ের সহকারী খুবলাল ঘরের ভিতরে চাপাটী প্রস্তুত করিতেছিল, পাঁড়ের আদেশ মত একটা ছোট বাল্‌তি দিয়া গেল। গোরক্ষক তাহা লইয়া পুনরায় কহিল—"হাম আভি আতা আপনে ও রাখ দিজিয়ে কাহেকো তকলিফ করতেঁহেঁ, হাম এ্যায়াসা বানায় দেঙ্গে—"

বলিতে বলিতে কথাটা শেষ না করিয়াই চলিয়া গেল এবং মিনিট দশেকের ভিতরে এক বাল্‌তি দুধ লইয়া আসিয়া কহিল—

"লিজিয়ে মহারাজ সেবা লাগাইয়ে, ঔর দেখিয়ে ক্যায়সা উমদা তাজা ভাং মূলুকসে লেয়ায়া—আবহি বানায় দেতা, আরে লছমন জলদি আরে।"

অনতি বিলম্বেই লছমন উপস্থিত হইল এবং বৃদ্ধের আদেশ মত সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল। পাঁড়ে আনন্দের আতিশয্যে বাল্‌তি সমেত দুগ্ধ ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া নিজে তাহার ব্যবস্থায় মন দিল। দ্বারের সম্মুখে বারাণ্ডায় বসিয়া বৃদ্ধ সবিনয়ে কহিল—

"বহুৎ জোর পানি আওয়ে গা, আপকো হুকুম হোনেসে হামলোক ছ' আদমী আজ রাতকো হিঁয়া—"

"আরে উতো বাত ঠিক হ্যায়, লেকেন হামারা মনিবকো এ্যায়সা হুকুম নেহি। কেয়া করে মুলুককা আদমী তোমলোক, আচ্ছা এক কাম কর—উও আস্তাবল ঘরমে ঠার সকো তো—"

"বহুৎ খোসীসে মহারাজ—মাম্‌লা তো একই রাত কো—"

"লেকেন—কোই কুচ হল্লা না কর—চুপ চাপ রহনে হোগা, মনিব আনেসে উনকা মালুম না হোয়।"

ঘণ্টা খানেক পরে যখন রামবাবুর গাড়ী আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল তখন খুবলালের চাপাটী যে পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছিল তা সে জানিতেই পারিল না এবং স্বয়ং পাঁড়েজীর মাথার ভিতরে যে কোথাকার দিব্য সঙ্গীত বাজিতেছিল তাহাতেই সে বিভোর হইয়া পড়িতেছিল। বাবুর ডাকে চমকাইয়া উঠিয়া অতি কষ্টে কোন রকমে গিয়া ফটক খুলিয়া দিল। রামবাবু প্রশ্ন করিলেন—

"কুল খবর আচ্ছা হ্যায়?"

"হাঁ বাবুসাব" জড়িত স্বরে বলিয়াই সে পড়িতে পড়িতে ফটকের কপাট ধরিয়া সাম্‌লাইল। বাবু আর কোন প্রশ্ন করিল না, গাড়ী ভিতরে চলিয়া গেল। কিন্তু সে বেচারা আর ফটকে তালা চাবি বন্ধ করিতে পারিল না, প্রাণপণে লৌহকপাট ঠেলিয়া দিয়া অতি কষ্টে স্খলিত পদে ঘরের ভিতরে গিয়া খাটিয়ার উপরে দেহ এলাইয়া দিল।

নরকের পথে

টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইয়াছিল অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ়। সেই অন্ধকারের আবরণে গা ঢাকিয়া পরক্ষণেই বৃদ্ধ গোরক্ষক একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইল এবং আসিয়া রাস্তায় গিয়া মৃদু মৃদু শীস দিল। তাহার প্রত্যুত্তরে আরও ছয় জন লোক সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দে ফটকের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ গো রক্ষক সন্তর্পণে ফটক বন্ধ করিয়া লঘু পদে দ্রুত—আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল।

বাগান বাড়ীর নীচের তলার হল ঘরের পাশের একটা সুসজ্জিত কক্ষে অবরুদ্ধ গৌরীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মেঘের অন্ধকার মিশিয়া প্রগাঢ় কালিমায় পৃথিবী একাকার হইয়া গিয়াছিল। কক্ষের উজ্জ্বল আলোক গৌরীর শুষ্ক মুখের উপর পড়িয়া ঠিক মড়ার মুখের মত শ্রীহীন পাণ্ডুর দেখাইতেছিল। তাহার মনে হইল কে যেন পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতেছে। ধড় মড়িয়া উঠিয়া বসিতে গেল, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ অবসন্ন এবং উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে যে জড়তাটুকু অনুভূত হইল তাহারও প্রভাব এত বেশী যে উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে একটুখানি নড়িয়া চড়িয়াই আবার তেমনি এলাইয়া পড়িয়া অবাক দৃষ্টিতে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, কেবল তাহার কাণে যেন বহুদূর হইতে আগত.

কাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—"ঘুম ভাঙ্গলো? উঃ এমন বেজ্রায় বিতিকিচ্ছি ঘুম—কিছু খেয়ে টেয়ে ছিলে নাকি, তোমায় তো আগে এমন দেখিনি।"

কথাটার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম না হইলেও তাহার ভিতরে শ্লেষের যে তীক্ষ্ণ খোঁচাটুকু ছিল, যে তেমন অবস্থাতেও গৌরীর অন্তরে বিঁধিতে ছাড়িল না এবং তাহার তীব্র বেদনা তার অবসন্ন দেহে বিদ্যুতের মত আঘাত জাগাইয়া যে মতি ফিরাইয়া আনিল, তাহারই বলে আবার সে কষ্টে উঠিয়া বসিতে বসিতে তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল—"কে তুই?" কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশেপাশে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাহার ক্রোধের ভাব বিলুপ্ত হইয়া পাংশু মুখের উপর ভয় বিস্ময় ও সংশয়ের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল পাগলের মত যেন আপনা আপনি মুখ হইতে জড়িত কণ্ঠস্বর বাহির হইয়া গেল—

"এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—এ—কোথা—য়—আ—মি?"

"সে কি? আমায় চিনতে পারছোনা মা? এমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইছ কেন? ভয় কি, তুমি ভাল জায়গায় আছ, মুখ হাত ধোও দেখি আগে, এই জল গামছা নেও, রোস রোস আমি ধরে নামিয়ে দিচ্ছি।"

গৌরীর মুখ-চোখ জিহ্বা এমন শুকাইয়া ভিতরের দিকে টানিতেছিল যে এক ফোঁটা শীতল জলের জন্য সে ভিতরে ভিতরে

চাতকের মত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কক্ষ মধ্যস্থিতা রহস্যময়ী অপরিচিতার এ সেবাটুকু উপেক্ষা করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পরে সেই যখন আবার একবাটি দুধ গরম করিয়া দিয়া খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, তখন গৌরী অনেকখানি সুস্থ বোধ করিয়া মনে এমন দৃঢ়তা সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল যে কিছুতেই তা স্পর্শ করিল না, বিস্ময় ও সংশয় পূর্ণ অথচ অকম্পিত দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ কোথায় আমি, কি ব্যাপার, তুমি কে ? কি চাও ? তোমার বৃন্দা কোথায় ?"

"সে কিগো মেয়ে—এখনো আমায় চিন্‌তে পারছ না—ভাল করে' চেয়ে দেখ দেখি গরীব কাঙ্গাল বলে কি এত শীগগির ভুলে যেতে হয় মা ?"

এবার কণ্ঠস্বর গৌরীর পরিচিত বোধ হইল, ভাল করিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া সভয় বিস্ময়ে সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল—"এঁ্যা পদ্ম—"

"হ্যাঁ মা, তোমাদের সেই পদুমাসী, তবু ভাল যে গরীব কাঙ্গাল বলে একেবারে ভুলে যাওনি, সেই তিরবেণীর ঘাটে—"

গৌরী অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে কহিল—"তুমি আবার কি করে এলে কোথায়—কার বাড়ী এ—কি সব কাণ্ড—গুরুদয়ালের—

পদ্ম মধুর স্বরে বাধা দিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের মত কহিল—মা, গুরুদয়ালের শয়তানি থেকে তোমাদের মোশাইয়ের লোকে

তোমাকে রক্ষে করে এনেছে, থির হয়ে সব শোন আগে তখন বুঝবে যে পদুমাসী তোমার জন্যে কত কেঁদে কেঁদে—"

বলিতে বলিতে পদ্মমণির কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া চোখের কোণ জলে ছল ছল করিয়া আসিল। 'মশাইয়ের' উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই গৌরীরও বিস্ময় এবং আতঙ্কের ভাব দূর হইয়া মনে মনে যেমন একটু আশা ও সাহসের ভাব সঞ্চিত হইল, পদ্মমণির প্রতিও তেমনি একটুখানি পরিচিত আত্মীয়ের ভাব জাগিয়া উঠিতে কসুর করিল না। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন করিয়া কুটেগাছটা পাইলেও জড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া পদ্মমণির দু'হাত ধরিয়া কহিল—

"মাপ কর মাসি, তোমাদের কাছ থেকে গুরুদয়ালের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বড় অন্যায় করেছিলুম তার ফলও হাতে হাতে পেয়েছি, আমি তাকে আমার মার পেটের ভাই বলেই ভাবতুম তাই—তাই—কিন্তু আমাদের মশায়ের সঙ্গে—"

"থির হও মা সব বলছি, এখানে তুমি আমার কোলে আছ অতি বড় শত্তুরেরও সাধ্য নেই যে তোমার মাথার কেশগাছটিও ছুঁতে পারে, তোমাদের মোশাইয়ের দয়ায় আমার হারানিধি শয়তানের হাত থেকে কেড়ে এনেছি আর তোমার কাকে ভয়? আগে এই দুধ টুকু খেয়ে থির হয়ে বোস মা, একে একে সব বলছি।"

বলিয়া মেয়ের মত আদর করিয়া দুধের বাটী তাহার মুখের

কাছে তুলিয়া ধরিল। এবার গৌরী আর আপত্তি করিল না, গরম দুধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া দেহে যেন নব জীবন ফিরিয়া পাইল, তারপরে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া পদ্মমণির কাছে বসিয়া কহিল—"এইবারে বল মাসি, আমি আর না শুনে স্থির থাকতে পাচ্ছিনি, এ কার বাড়ী কি করে এলুম ?"

পদ্ম মধুর হাসিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে আরম্ভ করিল—"সেই তিরবেণীর ঘাটে পয়সা আর লেঠেলের জোরে গুরুদয়াল তো তোমায় নিয়ে পালালো, আমার কিন্তু মন মানলো না। তোমাদের হিল্লেয় আমার বোন ঘর-দোর বেঁধে অতকাল বাস করেছে তোমার বাপের রেশমের কুঠীতে কাজ করে তোমাদের খেয়ে আমার হারাধন মানুষ, তাদের মা-বেটার যা কিছু সবই তোমাদের দৌলতে, তারপর সেই ঘর-দোর জায়গা-জমী আমি এতকাল ভোগ করে আসছি, ধরতে গেলে আমরা তোমাদের প্রজা, তোলাদের গোলাম—"

"যাক্ যাক্ মাসি ও সব কথা, তারপর ?"

"তারপর তোর উপর যে কি মায়া পড়েছিল—তোকে পেটের মেয়ে বই ভাবিনি মা, তোরা চলে গেলে, তিনদিন দিন রাত আমার চোখের জল শুকোয় নি, না খেয়ে কেঁদে মরি, সেইখান থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম—এরপর আবার সেখানে লোকের কাছে কি জবাব দেব ?"

"যাক মাসি, আর তো সে ভাবনা নেই, এখন আসল কথা বল।"

"শোন মা সব বলছি।"

বলিয়া, আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মুছিয়া পদ্মমণি পুনরায় আরম্ভ করিল—"তারপর তো মেলার সময় ঘোষ পাড়ায় গিয়ে উঠলুম। দেখি তোমাদের মোশায়ের চারদিকে লোক থৈ থৈ করছে—কাছে এগোয় কার সাধ্যি। তিনি সিদ্ধশেষ মানুষ ভূত ভবিষ্যিৎ সব জানেন, সতীমায়ের নাম করে হেমসাগরে ডুব দিতে বলছেন অমনি কানার চক্ষু হচ্ছে—বোবার বোল ফুটছে—এ স্বচক্ষে দেখা। তারপর তো রাতের বেলা ভিড় একটু কম দেখে তার কাছে গিয়ে সব বল্লুম। শুনে তিনি বল্লেন "সর্ব্বনাশ করেছ গৌরী মায়ের বিয়ে যদি না হয়, কি সে যদি নষ্ট হয় তা'হলে তার সব সম্পত্তি গুরুদয়ালের হাতে গিয়ে পড়বে, কর্ত্তা এই উইল করে গেছেন, গুরুদয়াল সেই সম্পত্তির লোভে, তাকে নষ্ট করবার জন্য নিয়ে গেছে।" শুনেই তো আমাদের গা কেঁপে উঠ্‌লো, বল্লুম "উপায় কি?" তিনি বল্লেন —"এখন যেমন করে হোক গৌরীকে তার হাত [illegible] উদ্ধার

নরকের পথে

"দু'দিন পরে আবার গেলে মাসি ?"

"না গিয়ে কি থাকতে পারি মা ? সেদিন মেলা ভেঙ্গে গেছে, লোকজন সব চলে যাচ্ছে, গিয়ে দেখি তেনার কাছে ষণ্ডা গুণ্ডো মত একজন খুব বড় মানুষ হিন্দুস্থানী বসে আছে এই মোটা সোনার চেন গলায়—হাতে পাঁচটা হীরের আংটী তাকে দেখিয়ে মোশাইবাবা বল্লেন—এ গৌরীকে চিনে গৌরীও একে চিনে। একাশীর একজন মস্ত সর্দ্দার ছিল গৌরী যাকে জ্যাঠা বলে সেই জগৎবাবু—গুরুদয়ালের বাপ তেনার খুব বিশ্বাসী লোক—ঢের বড় বড় দাঙ্গায় লাঠিবাজী করে জিতিয়ে দেছে, তার পর গৌরীর বাপের সঙ্গে জমীদারদের যখন দাঙ্গা বাধে তখন কাশী থেকে জগৎবাবু একে পাঠিয়েছিল, এর লাঠির জোরে গৌরীর বাপও দাঙ্গায় জিতেছিল। তারপর তিনি মারা গেলে গৌরীকে আর তাদের ঘরবাড়ীর খবরদারি করবার জন্যে জগৎবাবু এই চন্‌চনিয়াকে রেখে দিয়েছিল, সে নাকি তিন-চার মাস তোমাদের বাড়ীতে ছিল তুমি তাকে চেন না ?"

"খুব চিনি, সে কত আমায় ভালবাসতো, তার ভয়ে শত্রুরা কেউ [illegible] করতে পারতো না। তারপর একদিন হঠাৎ কোথায় চলে গেল। তারপর জ্যাঠামশাইরা আবার থেকে এলে শুনলুম যে—কোথাকার জমীদারের তাকে

করতে গিয়ে নাকি পুলিশে ধরা পড়ে চালান হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো ঢন্‌ঢনিয়া নয়—তার নাম যে বৈজু।"

"তা হবে মা, দেখলেই চিনতে পারবে'খন।"

"সে কি এখানে আছে নাকি?"

"এই তো তার বাড়ী; সে এখন কলকাতার মস্ত লোক, মোশাইবাবার চেনা-কিনা, তাই তেনার হুকুমে ফন্দী করে তোমাকে গুরুবাবুর বাগান থেকে তুলে এনেছে। শুনলুম গুরুদয়াল নাকি মিছিমিছি কলকাতায় যাবার নাম করে কোথায় লুকিয়েছিল, তারপর তুমি ঘুমুলে তোমায় ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে সর্ব্বনাশের মতলবে ছিল, তেমন সময় এনারা গিয়ে পড়ে তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন।"

গৌরীর সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং নিজের অবসন্ন দেহ ও মস্তিষ্কের অবস্থা স্মরণ করিয়া পদ্মের কথায় আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না, আগ্রহভরে কহিল—

"তবে আর আমার কোন ভয় নেই—কোথায় বৈজু?"

"এঁ্যা—এঁ্যা—সত্যি বৈজু যে।"

বলিতে বলিতে গৌরী উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে ধড় মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, উৎফুল্ল স্বরে কহিল—

"তবে আর আমার কোন ভয় নেই—"

"কিছু ভয় নেই গৌরী মায়ি, কিন্তু বদমাস গুরুদয়াল সিধা লোক নয় সহজে ছাড়বে না, তাই তোমাকে এক কাজ করতে হবে, একটা ঝুটমুঠ নকল সাদির খেলা করতে হবে তা'হলে আর সে কিছু করতে পারবে না।"

"বিয়ের আবার খেলা কি—আমার যিনি স্বামী—"

"হাঁ হাঁ, আমি তাঁরে হুগলীর জেলে দেখেছি সেই শঙ্কর বাবুকে চিনি আমি। সরকার বাহাদুর যে কবে তাঁকে ছাড়বে ঠিক নেই, ততদিন একটা লোক দেখানো মিছে বিয়ের তামাসা দেখিয়ে লোকের চোখে ধুলা দিয়ে রাখতে হবে। মোশাই বাবার হুকুম এতে দোষ নেই, এ খালি একটা ভেলকী। আমি একটা—পাগলাকে শঙ্করবাবু বলে রটিয়ে দিয়েছি—এই খেলা শেষ করে তারে পাগলা গারদে রেখে আসবো, আমি আছি এস-না পাশের ঘরে মজাটা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শেষ

হলঘরের অপর প্রান্তের ঘরে বৃন্দা বৈষ্ণবী বাঙ্গালীর বিবাহের মোটামুটী উপকরণ সাজাইতে সাজাইতে গুল্লার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"কেমন গো নাপ্‌তের পো সব ঠিক হচ্ছে তো?"

গুল্লা রহস্যের ভঙ্গিতে চোখ পাকাইয়া বলিল—"খবরদার গাল দিস্‌নি বল্‌ছি, তা'হলে তোকেও আমি কাওরার বেটী বলবো।"

"বল্‌না, মিছে তো নয় এখনই যেন বোষ্টম হয়েছি, নইলে আমার বাপ্‌তো কাওরাই ছিল আর তোর বাপ ছিল নাপিত নয়? যাক এখন আসল-কথা শোন্—দু'জনকার যে পাঁচশো রফা হয়েছে তা যেন চেকের কাগজ কি নম্বরি নোটে রাজি হস্‌নি, দশ টাকার নোট আর টাকা—এ ছাড়া আর কিছু নয়—খবরদার।"

"জানি জানি আমায় আর শেখাতে হবে না, এখন [illegible] [illegible] করে যা—ওই দেখ্ ওরা বোধ করি শুনছে।"

[illegible]ঘরের অপর প্রান্তে চেলি পরিহিত হারাধনকে

ঘিরিয়া তিনজন লোক একখানা নূতন ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত দলিল হাতে লইয়া ঘন ঘন ঘরের অন্য প্রান্তের দিকে চাহিতেছিল। তাহার মধ্য হইতে পুরোহিতবেশী এক ব্যক্তি নিম্ন স্বরে কহিল—"আপনার দলিল শুনানো হ'ল তো, এখন যে ওদিকের কাজে লাগতে হয়।"

"হ্যাঁ খালি হারুবাবু সই করে দিলেই ছুটী। কনে আনতে গেছে।"

হারাধন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে কহিল—"কনেই আন আর বিয়েই দাও, যাই কর বাবা, যতক্ষণ না এ জীবনটার মত নেশার ব্যবস্থার জন্যে পাঁচটি হাজার নগদ হাতে পাচ্ছি ততক্ষণ সই করছি না। এক অবলার সর্ব্বনাশ করেছি, আর একজনের করতে নারাজ। কিন্তু এত সম্পত্তির মালিক এই আইবুড়ো গৌরী মেয়েটা কে বলত বাবা, দলিলে তো তার বাপের নাম আর ঘরের ঠিকানা চেপে গেলে!"

"নেশা করতে চাও নেশা কর—অত খবরে কাজ কি, এলেই দেখতে পাবেখন।"

[illegible] সম্প্রদান স্থলে টানিয়া আনিয়া

[illegible] ঠিক

[illegible] তেমনি করে যাবে, খবরদার আর [illegible] বলোনা, বস্ বস্ ওই তারা আসছে।"

সেই মূহূর্ত্তে ঢন্‌ঢনিয়া সবলে দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়াই কহিল—"এস্ এস্ গৌরী মাসি, দেখ যা বলেছি ঠিকঠাক কিনা! আরে এই শালা নেশাখোর পাগলা দেখ কেমন করে এনেছি, তোর কুড়োর চাইতে ভাল কিনা?"

• গৌরী ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হারাধনের পানে চাহিয়া যে কি লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা ঢনঢনিয়া ফিরিয়া দেখে নাই। তাহার কথার জবাব না পাইয়া পুনরায় রুষ্ট ভাবে ধমকাইয়া কহিল—"এই শালা হারাধন তোর কনে কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর মুখ হইতে অত্যন্ত বিস্ময় সূচক তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বহির্গত হইল—"এঁ্যা—হারু—হারু—হারাধন!"

চকিতে কক্ষ মধ্যস্থ সকলেই চমকাইয়া গৌরীর পানে চাহিল, কিন্তু কাহারও মুখ দিয়া একটা শব্দ বাহির হইতে না হইতে চোখের পলকে হারাধন বিদ্যুৎ চালিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়াই সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"এঁ্যা—এ্যা—গৌরিদিদি তুমিও এই শালা খুনে ডাকাতের হাতে পড়েছ। সাবধান আমার [illegible] মাসী আর ওই শালা ডাকাতের সর্দার তোমার [illegible] করবার—"

[illegible] বিদ্যুতের মত চকিতে ঢন্‌ঢনিয়া বাঘের [illegible] তাহাকে নীচে ফেলিয়া এক হাতে গলা

টিপিয়া ধরিয়া. বজ্রস্বরে হাঁকিয়া কহিল—তবেরে হারামি শয়তানের বাচ্ছা—”

বলিয়াই নিজের কোমর বন্ধ হইতে তীক্ষ্ণধার ছোরা টানিয়া বাহির করিল। গৌরী আতঙ্কে তীক্ষ্ণ চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার চীৎকার বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে আচম্বিতে দ্বার দেশে পিস্তলের ভীমনাদ উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দশজন সশস্ত্র পুলিশ ঢুলিয়াই সকলকে ধরিয়া হাতকড়া লাগাইতে স্বরু করিয়াদিল।

আচম্বিতে ফাঁকা পিস্তলের শব্দে মুহূর্ত্তখানেকের জন্য স্তব্ধ ঢনঢনিয়ার ছোরা সমেত হস্ত শূন্যে উঠিয়া থামিয়া গিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তেই তাহা নামিতে না নামিতে বিষম প্রহারে ছোরাখানা ঠিক্‌রাইয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া মেঝেতে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গোরা গুস্ সাহেব ও রমেশের চঞ্চল হস্তগুলি এমন ভাবে তাহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল যে সিংহ বিক্রমে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ঢনঢনিয়া আপনাকে মুক্ত করিবার সুযোগ পাইল না। সেই

[illegible]নে নির্ণিমেষ চোখে চাহিতে

[illegible] মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল,

আনিয়া হাসিতে [illegible]

শঙ্কর বাবুকে গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দোষ জেনে [illegible]

গৌরীশঙ্করের মিলনের দিনে আমরা এই ভূতের দল ভাঁড়ার লুট করবার আশায় রইলুম।”

লজ্জায়, আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় গৌরীর রাঙা মুখখানি একেবারে জবাফুলের মত হইয়া চোখ দুটী নত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে সহসা পদ্মমণির উচ্চ ক্রন্দন রোল উঠিয়া সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বদ্ধহস্ত পদ্মমণি পুলিশ কনেষ্টবলের পায়ে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে কহিল—“দোহাই বাবা আমায় ছেড়ে দাও আমি কিছু জানিনি সব ওই ব্যাটা চন্‌চনের কাজ, ওই আমার গৌরীকে দেশ থেকে ভুলিয়ে আনতে বলেছিল, ওরই পরামর্শে কুড়োকে আর আমার বোনপোকে দেশ থেকে লুকিয়ে আনিয়ে আমার বাড়ীতে রেখেছিলুম, ওই আমার হারাধনকে একটু একটু করে নানা রকম নেশা খাইয়ে খাইয়ে তার মাথা বিগড়ে দেছে, ওই কুড়োকে নষ্ট করবার জন্যে নানা ফিকির করেছে—তবুতাকে নষ্ট করতে পারেনি, ওই আমাকে দিয়ে হারাধনের কাছে মিছে কথা বলিয়েছে যে কুড়ো নষ্ট—”

সহসা বিপরীত দিক হইতে [illegible] সকলে সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল,—[illegible] ভরিয়া [illegible] দুই হাত কপালে ঠেকাইতে [illegible] ন, কুড়ো আমার ভাল আছে—সতী সাধ্বী [illegible] পাগল নই—আর আমি নেশা করবো না—

আর কাহারও কথায় ভুলবো, সতী-গৌরিদিদির চরণ ধুলোর স্পর্শে আজ সব মেঘ কেটে গেল—ওই পায়ের তলায় আমাদের তুটোকে স্থান দিয়ে রেখ দিদি, আমরা তো তোমার বাপেরই খেয়ে মানুষ—আমরা তোমার চিরকেলে চাকর চাকরাণী।”

বলিতে বলিতে গৌরীর পায়ের তলায় গিয়া ঢিপ করিয়া মাথা ঠুকিল। তারপর আসামীদের পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া সত্যব্রত গুস্ সাহেবের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—“এইবার লিলিবিবির টম্‌টম্ চাপা দেওয়া আসামীকে—”

গুস্‌সাহেব হাসিয়া কহিলেন—“ভয় নেই বিবি নবীন নাগরকে যে রকম প্রেমে বেঁধে সেই রাতারাতি কাঁচড়াপাড়ার গঙ্গা থেকে বালিগঞ্জে এনে তুলেছেন তাতে আর তাঁর পালবার সম্ভাবনা মোটেই নেই।

“যাক ভাগ্যে চন্দনিয়া এ্যাটর্নীর নামে টেলিগ্রাফ করে, গুরুদয়ালকে কৌশলে সরিয়ে দিয়ে গৌরীকে আসনে করে তুলে এনে এখানে তার বিয়ে [illegible] টা সমস্ত লুটে নেবার জন্যে [illegible] একই সময়ে একই জায়গায় [illegible]

সমাপ্ত

গুপ্ত উপন্যাস

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

গুপ্ত-উপন্যাস

শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ
সঙ্কলিত

কলিকাতা,
৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর হইতে,
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

মূল্য ২৲ টাকা।

৫ নং রামধন মিত্রের লেন,
শ্যামপুকুর হইতে,
শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক—
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২৫।এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্,
নিউ সরস্বতী প্রেসে,
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

বেদ বলিয়াছেন,—আনন্দই আয়ুঃ ; আনন্দেই লোক বাঁচে। এ বেদোক্তির সারবত্তা অধুনাতন বিজ্ঞানও অস্বীকার করেন না। শুনিতে পাই, বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,---মানুষ যদি দিনের মধ্যে খানিকটা-কাল খোলা প্রাণে খুব খানিক হাসিতে পারে, তবে তাহার জীবনীশক্তি বাড়ে।

বুঝিলাম, বেদ-বিজ্ঞান এখানে অভিন্ন-মত। কারণ, ওরূপ—হাসিতে পারা, সে তো আনন্দেরই খেলা। সুতরাং যে আনন্দ-হাসির পরিণতি হইল—জীবনী শক্তি, সে তো মানব-জীবনের একটা মহালাভ। কারণ, মানুষকে বাঁচিতেই হয়, বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজন। নীতিশাস্ত্রেরও উপদেশ—'জীবন্ নরো ভদ্রশতানি পশ্যতি'।—বাঁচিয়া থাকিলেই লোক একদিন মঙ্গলের মুখ দেখে। তাই সবাই বাঁচিয়া থাকিতেই চায়—থাকাই তাহার উচিত।

কিন্তু যে আনন্দে মানুষ হাসিবে -বাঁচিয়া থাকিবে, সে আনন্দ—সে হাসি আজ কৈ ? অন্য দেশের কথা জানি না, বাঙ্গালা হইতে সে আনন্দ-হাসি বহুদিন মুছিয়া গিয়াছে। কাজেই সেদিন 'শিক্ষা'কমিশনের বড় কর্ত্তা স্যাডলার সাহেব বিলাত গিয়া যে বলিয়াছেন,—এ দেশের লোক হাসে না। এ কথা এ দিনের খাঁটি কথা।

এ দিনের বলিলাম এইজন্য যে, বাঙ্গালী বরাবরই এমন ছিল না। ছিল একদিন—বাঙ্গালীর গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-

ভরা মাছ, আর নিজায়ত্ত কাপড়। সুতরাং বাঙ্গালীও একদিন মানুষের মত খাইত, পরিত, আনন্দের চর্চ্চা করিত, আর প্রাণ খুলিয়া হাসিত। কাজেই আনন্দের হাসি হাসিয়া সে বাঁচিয়া থাকিতেও পারিত। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'।—সে দিন আর নাই। এখন 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'! তাই আনন্দের হাসিও তেমন আর ফোটে না।

কিন্তু উপায় কি? আনন্দ তো করিতেই হইবে, অপূর্ণোদরেও আনন্দ চাই,—নহিলে যে বাঁচিয়া থাকার যো নাই। কাজেই আনন্দের উপাদান প্রয়োজন।

জনসমাজে প্রাচীন গল্প-উপন্যাসও আনন্দের একটা উপাদান। তাই প্রাচীন-মুখে গল্পগুলি যখন শুনিয়াছিলাম, তখন কত আনন্দই পাইয়াছিলাম। সে আজ বহুদিন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে আনন্দস্মৃতি এখনও মুছে নাই; তাই সেই মধুর স্মৃতি লইয়াই আজ এই 'গুপ্ত উপন্যাসে'র মালা গাঁথিলাম—গল্প-পাঠক বাঙ্গালীর সম্মুখে ধরিলাম। রসজ্ঞ পাঠক ইহার রসাস্বাদে কিঞ্চিৎ মাত্র আনন্দানুভব করিলেও আমার এ প্রয়াস সফল হইল, বুঝিব। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

উৎসর্গ।

যিনি বিক্রমপুরের বিখ্যাত বৈদ্যবংশের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন; আবাল্য বিলাত-বাসে থাকিয়া,—ইংরেজী ভাষার—ইংরেজী সাহিত্যের—ইংরেজী ভাবের ভাবুক হইলেও, দেশের ভাষায়—দেশের কথায়—দেশের আদর্শে অনুরাগ যাঁহার অবিচল; যিনি কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গভীর আইন-ব্যবসায়ী হইয়াও বাঙ্গালা ও সংস্কৃতসাহিত্যের রস-ভাব-ভাবনায় সদা সরস-চিত্ত; যাঁহার সৌম্য শান্ত গম্ভীর মুখচ্ছবি রস-রচনা বা রসালাপে নিত্য স্মিত-সুন্দর; যিনি আদর্শ দরিদ্র-বন্ধু ও বন্ধুবৎসল হইলেও বন্ধুতার দুন্দুভিনাদ যাঁহার নাই; যিনি যোগ্যতা ও প্রতিভাগুণে অধুনা বঙ্গের 'ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলে'র কখন বা 'অ্যাডভোকেট জেনারালে'র উচ্চ পদে সমাসীন; যাঁহার উৎসাহে—যাঁহার সস্নেহ সবল আগ্রহে এই 'গুপ্ত-উপন্যাস' সাধারণ্যে আজ পরিব্যক্ত, সেই প্রথিতনামা ব্যারিষ্টারপ্রবর—সেই মহাপ্রাণ, মনীষী শ্রীমান্ সতীশরঞ্জন দাস মহোদয়ের করকমলে এই গ্রন্থ সাদরে সমর্পিত হইল। ইতি—

গ্রন্থকার।

গুপ্ত-উপন্যাস।

মজলিসে বাদসাহ।

প্রথম দিন।

এগার শ' এক সালের আশ্বিন মাস ; অবিরাম বারিবর্ষণ হইতেছে ; দিবা-বিভাবরী সমান বর্ষণ, সমান আঁধার।

আঁধার হইবার কারণ এই যে, আজ কয়েক দিন হইতেই ক্ষণেকের তরেও সৌরালোক-দর্শন হইতেছে না ; ঘন কৃষ্ণ ঘনঘটায় সর্ব্বদাই আকাশ আবৃত। রাত্রিতে আকাশের ক্বচিৎ কোথাও কখন কখন দুই চারিটী নক্ষত্র দেখা যায় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই তাহারও আবার অদর্শন।

বর্ষণ আর থামে না ; মেঘ আর কাটে না ; কখনও কাটিবে, এরূপও কেহই মনে করে না ; যেন সারা বৎসরের সমস্ত দিন সুদূর পথ যাতায়াত করিয়া দিবাকর এখন দীর্ঘ অবকাশ লইয়াছেন। সে দুর্দ্দিনে অনেকেরই এইরূপ মনে হইয়াছিল। অনেকে এরূপও ভাবিয়াছিলেন, বুঝি বা দিবাকর আর লোক-লোচনের গোচর হইবেন না। প্রলয়ের পূর্ব্বলক্ষণ বুঝি ইহাই।

বস্তুতঃ সে কয় দিনে প্রকৃতির যেরূপ ভাববৈষম্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে অনেক বড় বড় বিজ্ঞ লোকও পৃথিবীধ্বংসের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কেবল যে অবিরাম বারিবর্ষণেই তাঁহাদের ঐরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা

নহে। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য—এমন কি অনেক স্থানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ধনী লোকেরা বহু অর্থ দিয়া কোনরূপে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন; কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে সেই সকল দুর্দ্দিন প্রাণান্তকর হইয়াছিল। তাহারা আপন আপন ভগ্ন কুটীরের জলার্দ্র অভ্যন্তরে বসিয়া কপালে কেবল করাঘাত করিতেছিল; আর অনবরত আর্ত্তনাদে বারিপাত-শব্দ বড়াইতেছিল। প্রথম দুই চারিদিনের দারুণ বর্ষণেই তাহাদের দুরবস্থার চরম হইয়াছিল; শেষে দুর্দ্দিন যতই বাড়িতে লাগিল, তাহারাও দলে দলে অনশনে প্রাণ হারাইতে লাগিল। পশু পক্ষী বর্ষা-বিহত হইয়া সেই কয় দিনে কত যে মরিল, তাহার আর হিসাব রহিল না। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়াই বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবী-ধ্বংসের আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, সে বারে যে পৃথিবী-ধ্বংস হয় নাই, ইহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। তবে অবিরাম বারিবর্ষণে অনেক জীব-জন্তু মরিয়াছিল; অনেক স্থান ধ্বসিয়া বসিয়া গিয়াছিল; অনেক বড় বড় বৃক্ষ ভগ্ন ও ভুগ্ন হইয়াছিল; অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়াছিল; অনেক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছিল; আর অনেকে অন্নাভাবে মৃত ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল; একথা নিশ্চিতই।

ফলে আশ্বিনের সেই দীর্ঘ দুর্যোগে সকল শ্রেণীর লোকেরই কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। দরিদ্রের তো কথাই নাই। যাঁহারা ধনাঢ্য, তাঁহাদিগকেও শেষে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি-সংগ্রহে অপারগ হইয়া নিজ নিজ অর্থরাশির গায়ে হাত বুলাইয়াই দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

পাঠক-পাঠিকা! এতক্ষণ আপনারা দুর্দ্দিনের দুঃখকাহিনীই শুনিলেন। এখন একবার এ দিনের সুখের বার্ত্তা শুনিবেন কি? যদি

শুনিতে চাহেন, তবে আসুন,—আমরা সকল দেশ ছাড়িয়া একেবারে সেই সুদূরবর্ত্তী দিল্লীদুর্গে যাই; দেখি—এখানে এদিনে সুখের চর্চ্চা কিরূপ হইতেছে!

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি! এখানেও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! ঘন কৃষ্ণ ঘন-ঘটায় এখানেও আকাশ নিরবকাশ; তাই দিন যামিনী সমান আঁধার হইয়া আছে। প্রান্তবাহিনী যমুনা জলোচ্ছ্বাসে স্ফীত হইয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিয়াছে। দিল্লীর রাজপথে, মাঠে, ঘাটে, গোঠে কোথাও লোক-চলাচল নাই। গজ, অশ্ব, শকটসঞ্চার দেখা যায় না। এমন যে দিল্লীর জুম্মামসজিদ্—যেখানে শত শত মুসলমান প্রতিদিন উপসনা করিয়া থাকে, আজ কয়েক দিন হইতে সেখানেও জনপ্রাণী নাই। একমাত্র বারিপাত-শব্দই শুনা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই নীরবতার মহাপ্রতিষ্ঠা।

হউক সব নীরব,—হউক সব আঁধার,—হউক সকলের দুঃখ,—হউক সর্ব্বত্র প্রচুর বর্ষণ; কিন্তু এখানে দুর্গমধ্যে বাদসাহ-ভবনে সুখ-মজলিসের বিরাম নাই। বাদসাহের মনস্তুষ্টির জন্য নাচগান বাদ্য যথারীতি সমভাবেই চলিতেছে। আঁধার নিরাসের জন্য স্থানে স্থানে দিবসেও শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে। সময়োচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ-পরিহিত বাদসাহ সুকোমল আস্তরণাঞ্চিত দেওয়ানীখাসের রম্য কক্ষে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন, আর দূরস্থ স্বর্ণ গড়গড়া-সজ্জিত মহাসৌরভময় তামাকু মৃদু মন্দ টানে টানিতেছেন। পাত্র মিত্র পারিষদ্বর্গ দূরে নিকটে যে যাহার স্থানে বসিয়া আছেন। বর্ষার দিনে তামাকুর সেই মনোমদ সৌরভে 'তামাকু'সেবীদিগের মন প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।

অদ্য বারি-বর্ষণের বেগ কিঞ্চিৎ বেশী। নাচ গান আর বাদসাহের

ভাল লাগিতেছে না। কিঞ্চিৎ পরেই বাদসাহের হুকুমে নাচ গান, বন্ধ হইল। কিছুকাল সকলেই নীরবে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে বাদসাহ তাঁহার প্রধান পারিষদের মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—আচ্ছা বলুন দেখি, এদিনে ভাল কি?

প্রধান পারিষদ ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—জাঁহাপনা, এদিনে ক্রীড়া-কৌতুক মন্দ নহে। আমার মতে তাস, পাশা, দাবা, এই গুলিই এদিনের উপযোগী।

বাদসাহের এ কথা তত মনঃপূত হইল না। তিনি অন্য পারিষদের মত জানিতে চাহিলেন। সে পারিষদও ঐরূপই উত্তর প্রদান করিলেন।

তখন জিজ্ঞাসিত হইয়া তৃতীয় পারিষদ কহিলেন,—জাঁহাপনা! আমার মতে এ সময়ে নানাদেশের—নানারসের—নানাভাবের নানারূপ উপন্যাস বা গল্প গুজব শুনিয়া দিন পাত করা মন্দ নহে।

ক্রমে আর দুই তিন জন পারিষদও ঐ মতেই মত দিলেন। বাদসাহ বলিলেন,—বহুৎ আচ্ছা, আমারও মত উহাই। তবে কথা হইতেছে, আমার যিনি উপন্যাসবক্তা আছেন, যাঁহার নিকট আমি মধ্যে মধ্যে নানাদেশের উপন্যাসাদি শুনিয়া থাকি, তিনি অতি বৃদ্ধ—বিশেষতঃ তিনি আরব-পারস্যাদি দূর দেশেরই নানা উপন্যাস জানেন। আমি যখনই শুনিয়াছি, তখনই তিনি ঐ সকল দেশেরই উপন্যাস বলিয়াছেন। এ দেশসম্বন্ধে একটী গল্পও তিনি জানেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার ইচ্ছা, আমি যে দেশে জন্মিয়াছি—যে দেশের আমি রাজা হইয়াছি, আমার এই জন্মভূমির—এই সুন্দর ভারতভূমির নরনারী যে সকল প্রাচীন উপন্যাস বা গল্পগুজব শুনিয়া আনন্দানুভব করে,

আমি সেইরূপ উপন্যাসাদিই শুনি, কেমন পারিষদ্‌বর্গ!—আপনাদের মত কি?

পারিষদগণ। জাঁহাপনা! আপনার আনন্দেই আমাদের আনন্দ। আপনার মতেই আমাদের মত।

বাদসাহ তখন তাঁহার এক হিন্দু পারিষদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; বলিলেন,—আমি একজন বিজ্ঞ উপন্যাসবক্তা চাই। আপনার জানিত এরূপ কোন লোক নিকটে আছেন কি?

হিন্দু পারিষদ বলিলেন,—জাঁহাপনা, এরূপ লোক অনেকই আছেন। তবে তাঁহারা সকলেই এখান হইতে দূর দেশে। নিকটে—এখান হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটী মাত্র লোক আছেন জানি। তিনি বিজ্ঞ বটেন, কিন্তু দরিদ্র। না জানি, এ দুর্দ্দিনে কি অবস্থায় আছেন।

হিন্দু পারিষদের শেষ কথা শুনিবা মাত্র হঠাৎ বাদসাহ কেমন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার অন্তরে কি যেন কর্ত্তব্য-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। মন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র মন্ত্রী তদ্দণ্ডেই মজলিসে হাজির হইয়া বাদসাহকে বন্দনা করিলেন।

বাদশাহ মন্ত্রীকে দেখিবা মাত্র ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—শীঘ্র বলুন, এ দুর্দ্দিনে সাম্রাজ্যের সংবাদ কি?

মন্ত্রী বলিলেন,—জাঁহাপনা! এ দুর্য্যোগ অতি ভীষণ। এমন দীর্ঘদিনব্যাপী দুর্য্যোগের কথা আমি কখন শুনি নাই। যাহা হউক, আমি দুর্য্যোগের দ্বিতীয় দিন হইতেই রাজ্যের নানা স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেছি। একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাই সংবাদ পাইতে কিছু বিলম্ব হইতেছে। তথাচ

ইতিমধ্যে যেরূপ সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে নানা স্থান হইতেই লোকের যৎপরোনাস্তি কষ্টের সংবাদই পাইতেছি।

বাদসাহ। আপনি কি শুধু কষ্টের সংবাদই লইতেছেন, না—সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট-মোচনের কোন ব্যবস্থাও করিতে পারিয়াছেন?

মন্ত্রী। জাঁহাপনা! প্রজাপুঞ্জের প্রতি আপনার যে ঐকান্তিক শুভেচ্ছা আছে, আমি তাহারই বলে ইতিমধ্যেই অনেক স্থানে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অতি ক্ষিপ্রগামী কর্ম্মঠ দূত পাঠাইয়া প্রত্যেক বিভাগীয় শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়াছি—তাঁহারা যেন স্ব স্ব শাসনাধীন স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব লইয়া অতি তৎপরতার সহিত দুঃস্থ নরনারী-দিগকে সাহায্য করেন।

বাদসাহ। লোকের যেরূপ দুঃখ কষ্ট হইয়াছে, তাহার অনুরূপ সাহায্য হওয়া চাই। কেবল ভাসা ভাসা সাহায্য হইলে চলিবে না। এ দীর্ঘ দুর্য্যোগে নিশ্চয়ই বহু লোকের প্রাণহানি হইয়াছে। দৈব ঘটনায় যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার অবশ্য উপায় নাই; কিন্তু এখনও যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটী প্রাণীও যাহাতে অন্নাভাবে মারা না যায়, বা কেহ গৃহাভাবে কষ্ট না পায়, যাঁহারা সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা যাহাতে প্রাণের সহিত সদয়-হৃদয়ে সাহায্য করেন, ব্যবসায়ীরা যাহাতে এই সুযোগে অতি লোভে দ্রব্যাদি অত্যধিক দুর্ম্মূল্য করিয়া না তুলে, এই সকলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া প্রজারক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাই আমার হুকুম।

মন্ত্রী। জাঁহাপনার হুকুম মত সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হইবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

এই বলিয়া মন্ত্রী বিদায় হইলেন। বাদসাহের অন্তরের চিন্তার ভার

যেন অনেকটা কমিল। এইবার তিনি তাঁহার সেই হিন্দু পারিষদের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—আপনি যে বিজ্ঞ লোকটীর কথা কহিলেন, তাঁহার নাম কি?

পারিষদ। তাঁহার নাম পণ্ডিত হরিমিশ্র।

বাদসাহের হুকুম হইল, এখনই পণ্ডিত হরিমিশ্রকে আনিতে হইবে। পণ্ডিতজীর পরিবারবর্গ এ দুর্দ্দিনে যাহাতে কষ্ট না পায়, এজন্য হাজার রূপেয়া দিয়া আসিবে এবং পণ্ডিতজীর যাহাতে এখানে আসিতে পথক্লেশ না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিবে।

বাদসাহের হুকুমে যথাকালে পণ্ডিত হরিমিশ্র দিল্লীর সুরম্য দেওয়ানী-খাসে আনীত হইলেন। বিষম বর্ষার দিনে অর্থাভাবে পণ্ডিতজীর পরিবারে বিষম কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অনন্যোপায় হইয়া পণ্ডিতজী একান্তে কেবল ভগবান্‌কেই ডাকিতেছিলেন। পরদিনই বাদসাহের লোকজন গিয়া তাঁহাকে অর্থ ও পরিচ্ছদাদি দিয়া সসম্মানে লইয়া আসিল। পণ্ডিতজী ভগবানে অশেষ কৃতজ্ঞভাব দেখাইয়া মনে মনে তাঁহারই দয়ার বিষয় ভাবিয়া আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে বাদসাহ-মজলিসে আগমন করিলেন।

পণ্ডিতজী আসিবা মাত্র স্বয়ং বাদসাহ এবং তাঁহার পারিষদবৃন্দ সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইলেন। পণ্ডিতজীও দূরে থাকিতেই বাদসাহ এবং তাঁহার পারিষদবৃন্দকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অনন্তর পণ্ডিতজীর বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। পণ্ডিতজী তাহাতে স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিলেন। তখন বাদসাহের হিন্দুপারিষদ পণ্ডিতজীকে বাদসাহের অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। পণ্ডিতজী বাদসাহের হুকুম পাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পণ্ডিতজী বলিলেন,—জাঁহাপনা! আপনি কোন্ বিষয়ের কিরূপ গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন, জানিতে পারিলে, আমি অগ্রে সেই বিষয়েরই অবতারণা করি।

বাদসাহ বলিলেন,—পণ্ডিতজী, আপনি যত রকমের যত গল্প জানেন, পরপর সকলই আমি শুনিব। তবে অগ্রে কোন্ বিষয়ের কিরূপ গল্প বলিবেন, সে ভার আপনারই উপর রহিল।

পণ্ডিতজী আস্তিক লোক। তিনি বাদসাহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—জাঁহাপনা, যিনি রাজার রাজা—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লীলা—অগ্রে সেই বিধাতৃবিষয়েই একটা 'রহস্য'জনক গল্প বলি।

বাদসাহ বড়ই আস্তিক ছিলেন। তিনি পণ্ডিতজীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অগ্রে সেইরূপ গল্প বলিতেই অনুমতি দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিতজী গল্প আরম্ভ করিলেন। বাদসাহ এবং তাঁহার পারিষদবৃন্দ একান্তমনে শুনিতে লাগিলেন।

অদৃষ্ট-লিপি।

পণ্ডিত হরিমিশ্র কহিলেন,—জাঁহাপনা! পূর্ব্বকালে মদ্রদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ যথাকালে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রহ করেন; কিন্তু দারিদ্র্যবশে তাঁহার সংসারযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নানাহ্নিক করেন; পরে বেলা হ'লেই ভিক্ষার্থ গ্রামান্তরে যান; ভিক্ষায় যাহা কিছু পান, তাহা দ্বারাই কষ্টে-সৃষ্টে পতিপত্নী জীবনধারণ করেন। কিন্তু কাল, ক্রমে এমনই কঠোর হইল যে, একবেলা একমুষ্টি হবিষ্যান্নও তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ দরিদ্র; কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণ তাঁহার যথেষ্ট। তিনি জীবনে কখন অসত্যের আশ্রয় করেন নাই; সারল্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। নিজের দুঃখের পার নাই, কিন্তু পরদুঃখ-দর্শনে তিনি অতি কাতর। হিংসা দ্বেষের লেশ মাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ব্রাহ্মণ বহু শাস্ত্র জানিতেন; কিন্তু দম্ভ বা অভিমানের গন্ধ মাত্রও তাঁহাতে ছিল না। এইরূপ অনেক গুণেই তিনি গুণবান্ ছিলেন।

কেবল গুণ থাকিলে হইবে কি? গুণের আদর কোথায়? রাজা বা ধনী ব্যক্তিরাই তো গুণের আদর করিয়া গুণী জনকে ধন মান অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোন রাজা বা ধনীর নিকট যাইতে একান্তই নারাজ। ব্রাহ্মণের ধারণা ছিল—ঐশ্বর্য্যশালীরা প্রায়শই মূর্খ;—যেন এক একটী অহঙ্কার বা অভিমানের অবতার! গুণাগুণের বিচার তাহাদের বড় একটা নাই। যদি বা দুই এক জনের ব্যবহার কচিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন রকমের হউক, তথাচ ঐশ্বর্য্যশালী

নিজ ঐশ্বর্য্যমত্ততায় দরিদ্রকে গুণ সত্বেও অন্তরে ঘৃণা করিয়া থাকে। আবার এমনও অনেক ধনী আছেন, তিনি নিজে তো কিছুই দিবেনই না; যদি কোন সদাশয় পুরুষ দরিদ্রকে কিছু সাহায্য করিতে যান, অমনি তাঁহার মন মৎসরী হইয়া উঠে।

এই ধারণাব বশবর্ত্তী হইয়াই দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রাণান্তেও কোন ধনীর নিকট গিয়া মুখ ফুটিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার কথা, নিজের অভাবের কথা জানাইতে পারেন নাই; কাজেই ব্রাহ্মণদম্পতির দুরবস্থার এখন চরম সীমা উপস্থিত।

ক্রমে কষ্টের একশেষ হইল। ব্রাহ্মণ-পত্নী ব্রাহ্মণের স্বভাব জানিতেন, অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে পরম ভক্তি করিতেন; তাই কোন ধনীর নিকট গিয়া অর্থ প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে কখন পীড়াপীড়ি করেন নাই। কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি একদিন কৃতাঞ্জলিপুটে স্বামীর নিকট বলিলেন—ব্রহ্মন্! আপনার স্বভাব আমি জানি; তাই কিছুই এতদিন বলি নাই; যতই দুঃখ কষ্ট হউক, নীরবে সহ্য করিয়াছি। কিন্তু এখন তো আর দিন চলে না, দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় ভিক্ষা দানে গৃহস্থ এখন অপারগ হইয়াছে। আমাদের সন্তান-সন্ততি নাই, ক্ষুদ্র সংসার। এ সংসারও এখন আর চলে না। এ সময় আমার পরামর্শ মত আপনি একটা কাজ করুন। আমাদের এই প্রদেশের যিনি রাজা, শুনিয়াছি তিনি বড়ই সজ্জন; কোন ক্রমে তাঁহাকে জানাইতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদের এই দুর্দশার অবসান হইতে পারে। আপনি মূর্খ ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট যাইতে নারাজ, কিন্তু শুনিতে পাই, অধুনা এ দেশের যিনি রাজা হইয়াছেন, তিনি বড় বিদ্বান্ এবং গুণবান্। অনেক সুধী সজ্জনের সংসর্গে তাঁহার

বাস। বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট বিশেষরূপেই সমাদৃত হইয়া থাকেন। সুতরাং আমার মনে হয়, সেখানে গেলে ধন মান সকলই আপনি পাইতে পারিবেন। আপনি তাহাই করুন। আমাদের এ দুর্দ্দশার অবসান হউক।

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া প্রথমে খানিকটা হাসিলেন; পরে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ব্রাহ্মণি! তুমি অবোধ; তাই এমন কথা বলিতেছ, আর নিজেদের দুঃখ ঘুচিবার কল্পনা করিতেছ। কিন্তু জানিও—অদৃষ্ট সঞ্চয় না থাকিলে কিছুতেই কিছু হইবার নয়। তুমি যে রাজার কথা কহিলে, সেই রাজা যদি তাঁহার নিজের সিংহাসনেও বসাইয়া দেন, আর স্বয়ং তিনি ভৃত্য হইয়া সেবা করিতে থাকেন, তথাচ অদৃষ্ট সঞ্চয় বিনা যে দুঃখ, সেই দুঃখভোগই সার হইবে। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, আমার অদৃষ্টসঞ্চয় নাই। জন্মান্তরে নিশ্চয়ই কাহাকে কিছু দান করিতে পারি নাই; তাহারই জন্য এ জন্মে আমার এই অর্থকষ্ট উপস্থিত। সুতরাং এ কষ্ট আমার খণ্ডন করিবে কে? অথবা কালমহিমাই আমাকে এমন দশায় ফেলিয়াছে। নহিলে যে ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়া অর্থের সার্থকতা ও আত্মপ্রসন্নতা লাভের জন্য এক কালে অর্থবান্ লোকেরা অন্তরে কত আকিঞ্চন করিতেন; ধনাদি ইষ্ট বস্তু ব্রাহ্মণসাৎ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইতেন; আমি সেই ব্রাহ্মণ হইয়া আজ কিনা অর্থের কাঙ্গাল হইয়াছি! প্রিয়ে! পুরাণপ্রসঙ্গে শুন নাই কি, এক একটা যাগযজ্ঞ উপলক্ষ করিয়া রাজারা মনের সাধে ব্রাহ্মণকে ধন বিলাইতেন; দুর্ব্বহ ও অপ্রয়োজন বোধে ব্রাহ্মণেরা তাহা ফেলিয়াও যাইতেন। অহো, কালের কি কঠোর শাস্তি! সেই নিস্পৃহ নির্লোভ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া, আজ আমি এই আশ্রমেই হীন হেয় ভিখারী! ভিক্ষা

আমার চতুর্থাশ্রমের বৃত্তি। কিন্তু এই দ্বিতীয় আশ্রম হইতেই আমার তাহা অবলম্বন। যাউক, আর সে সব কথায় কাজ নাই। তুমি বারম্বার বলিতেছ, তাই আমি রাজার নিকট এখনই যাইতেছি বটে, কিন্তু মনে হয়, ইহাতে ফল কিছুই হইবে না, কেন না বিধি যাহার বাম, সকলেই তাহার বাম হইয়া থাকে।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ আর বিলম্ব করিলেন না; নিজের সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া সেই দিনই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের ছিন্ন মলিন বসন; পক্ক কেশ, রুক্ষ বেশ; ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে মৃণ্ময় তিলক; মস্তকোপরি নির্ম্মাল্য পুষ্প; হস্তে একটি যষ্টি;—এই অবস্থায় কখন দ্রুতপদে, কখন ধীরে ধীরে, কখন আশার ছলনায় উত্তেজিত, কখন বা নিরাশায় অবসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ক্রমে রাজধানীতে গিয়া পৌঁছিলেন।

রাজার আদেশ ছিল, রাজসাক্ষাৎকার প্রার্থী ব্রাহ্মণ মাত্রকেই অবাধে সসম্মানে তৎসমীপে লইয়া যাইতে হইবে। রাজপ্রহরীরা তাহাই করিল। তাহারা ব্রাহ্মণকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল।

রাজা ব্রাহ্মণ দেখিয়া সসম্ভ্রমে প্রণিপাত করিলেন। বসিবার আসন দিলেন; কুশল প্রশ্ন করিলেন। ব্রাহ্মণও যথাযথ উত্তর দিলেন। ক্রমে পরস্পর আলাপ পরিচয় হইল। রাজা বুঝিলেন—আগন্তুক ব্রাহ্মণ অসাধারণ পণ্ডিত। ব্রাহ্মণের বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য যথেষ্টই আছে। তবে একমাত্র দারিদ্র্যই ইহাঁকে অবসন্ন করিয়াছে। যাহা হউক, আমি ইহাঁর উপযুক্ত বৃত্তি ব্যবস্থা করিব। যাহাতে ইনি স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় দিনাতিপাত করিতে পারেন, তাহাই আমি করিব।

রাজা মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এদিকে বেলা

অধিক হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ একটু ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজা ব্রাহ্মণের সেই ভাব লক্ষ্য করিলেন; কহিলেন, আচ্ছা, আজ তবে বিদায় হউন, সময়ান্তরে আবার আসিবেন। আপনার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া তৃপ্ত হইব।

রাজা এই পর্য্যন্ত কহিয়াছেন। এদিকে ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন—তাইতো, রাজা বুঝি কেবল কথার আপ্যায়নই করিলেন; পয়সা কড়ি দেওয়ার তো নাম মাত্রও করিলেন না। বুঝিয়াছি, অদৃষ্ট আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন—আচ্ছা, মহারাজ! অদ্য তবে বিদায় হই।

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন বলিলেন,—ভাল কথা মনে পড়িয়াছে। আপনাকে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

নিজ অদৃষ্ট ভাবিয়া ব্রাহ্মণের মনে মনে অপ্রত্যয় আছে। তথাচ তিনি রাজার কথায় আশ্বস্ত হইলেন; বলিলেন—আপনার সাদর সংকার অবশ্যই আমি গ্রহণ করিব।

রাজা কোষাধ্যক্ষের প্রতি হুকুম দিলেন—এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপাততঃ দুই শত টাকা প্রণামী স্বরূপ প্রদান করিবে।

হঠাৎ দুইশত টাকা প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন; ভাবিলেন—আমার জীবনে দুইটী টাকা সংগ্রহ এক সঙ্গে আমি করিতে পারি নাই। তাহাতে আজ এককালে দুই শত টাকা প্রাপ্তি! ব্রাহ্মণী তো ঠিকই বলিয়াছিল! হয়তো বা এইবার আমার ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল।

রাজার লিখিত হুকুম-নামা লইয়া ব্রাহ্মণ সোৎসাহে কোষাধ্যক্ষের নিকট গেলেন; তাঁহাকে হুকুমনামা দেখাইলেন।

ব্রাহ্মণের হর্ষ আর অধিকক্ষণ থাকিল না; কোষাধ্যক্ষ মিষ্টবাক্যে ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া বলিলেন,—মহাশয়, রাজার দান দুইশত টাকাই আপনার প্রাপ্য বটে; তবে আমরা কর্ম্মচারীবর্গ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দস্তুরী পাইয়া থাকি। আমি কোষাধ্যক্ষ; রাজা যাহা দান করেন, নিয়মানুসারে তাহার অর্দ্ধেক আমার দস্তুরী; দস্তুরী কাটিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা আপনাকে দেওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ ঐ কথা শুনিয়া একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; শেষে ভাবিলেন—ঠিকই হইয়াছে, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, বিলম্বে আর ফল কি, সহজে যাহা মিলে, এখন তাহা লইয়াই গৃহে গমন করি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হউক, আপনাদের প্রাপ্য ভাগ আপনারা লউন, অবশিষ্ট আমায় দিয়া দিন।

কোষাধ্যক্ষ বলিলেন,—মহাশয়! আমার এখানে আপনি নগদ টাকা পাইবেন না। আমি আমার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে আপনারই হাতে চিঠী লিখিয়া দিব। এই টাকার জন্য আপনাকে তাহার নিকট যাইতে হইবে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, যেরূপ নিয়ম আছে করুন। কোষাধ্যক্ষ তাঁহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে তখন পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিয়া দিলেন,—এই পত্রবাহক ব্রাহ্মণকে একশত টাকা দিবে।

পত্র লইয়া ব্রাহ্মণ সেই কর্ম্মচারীর নিকট গিয়া পত্র দিলেন।

কর্ম্মচারী পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণামান্তে কহিলেন, মহাশয়! আমাদের নিয়ম এই যে, আমরা কর্ম্মচারীরা এ সম্বন্ধে কিছু কিছু পাইয়া থাকি। নিয়মানুসারে আপনার এই প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক আমার প্রাপ্য ; আর অবশিষ্ট টাকা আপনি পাইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—নেও বাপু—যা নিতে হয়। অবশিষ্ট টাকা কয়টা আমায় দাও, আমি চলিয়া যাই।

কর্ম্মচারী কহিলেন,—মহাশয়! আমার কাছে নগদ টাকা পাইবেন না ; আমিও আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর নিকট একখানি চিঠী দিব। আপনাকে সেই চিঠি লইয়া তাঁহার কাছে যাইতে হইবে।

দুঃখ-দারিদ্র্য-জর্জ্জরিত ব্রাহ্মণ এখনও যে কয়টী টাকা পাওনা হইল, তাহা পাইবার জন্য ব্যগ্র ; কিন্তু কর্ম্মচারীর মুখে তাহা পাইবার যেরূপ ব্যবস্থা শুনিলেন, তাহাতে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। অতি দুঃখে তাঁহার মুখে এবার শুষ্ক হাস্য দেখা দিল। অন্তরেও কেমন একটা কৌতূহল হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন—বাপু হে, এইরূপ ভাবে আমাকে কতজন কর্ম্মচারীর নিকট যাইতে হইবে? তোমাদের এ রাজবাড়ীর কর্ম্মচারী মহলে যে নিয়ম দেখিতেছি, তাহাতে এইরূপ ভাবে এক এক জনের কাছে যাইয়া যাইয়া শেষে আমার কিছু থাকিবে তো?—না, উল্টা দেনার দায়ে আমাকে এখানে কয়েদ থাকিতে হইবে?

কর্ম্মচারী মনে মনে কহিল, এ ব্রাহ্মণের ভাগ্যে যদিও শেষে গিয়া প্রায় ঐরূপই দাঁড়াইবে ; তবু আমি কেন অপ্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণের মনে কষ্ট দিব? ব্রাহ্মণ নিজেই ব্যাপার বুঝিয়াছে, পরে সবই বুঝিতে পারিবে। আহা! রাজা যদি এই ব্রাহ্মণকে সহস্র বা অর্দ্ধ সহস্র টাকা দানেরও হুকুম করিতেন, তাহ'লে আমাদের দস্তুরী গিয়াও

ব্রাহ্মণের কিছু থাকিত। সরল ব্রাহ্মণ তাহাতেও খুসী হইয়া যাইত। কিন্তু এ যা হ'বে, তাহাতে দেখিতেছি শেষে ব্রাহ্মণের একটা দীর্ঘশ্বাস, পরে সেই সঙ্গে দারুণ অভিশাপ! সে শাপে রাজারই অমঙ্গল, অথবা রাজার কি দোষ? তিনি তো আর জানেন না যে, আমরা এই ভাবে তাঁহার প্রদত্ত টাকার দস্তুরী কাটিয়া লই? কাজেই অস্থকার ব্রহ্মশাপের বোঝা আমাদের ঘাড়েই পড়িবে। সে শাপানলের অংশাংশে আমাকেও দগ্ধ হইতে হইবে। কি করি আমার একার তো আর সাধ্য নয় যে, ব্রাহ্মণের টাকা কয়টী দিয়া দেই? আমাকে এখানে অন্যান্য সকলের নিয়মে বাধ্য থাকিতে হইতেছে।

কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন—না মহাশয়! আপনাকে আর বেশী বেগ পাইতে হইবে না: আপনি এই চিঠিখানি লইয়া যাউন; সত্বরই প্রাপ্য টাকা পাইবেন।

ব্রাহ্মণ চিঠি লইয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইলেন; বাহির হইয়া তৃতীয় কর্ম্মচারীর নিকট যাইলেন। সেখানেও পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধ দস্তরী রাখিয়া তথা হইতে একখানি চিঠী লইয়া ব্রাহ্মণকে বাহির হইতে হইল।

ব্রাহ্মণের এখন আর তাপ উত্তাপ নাই। নিজ অদৃষ্টের চরম মজা দেখিবার জন্যই তাঁহার এখন কৌতূহল হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজকর্ম্মচারীর নিকট যাইয়া যাইয়া অবশেষে সপ্ততল রাজপ্রাসাদের সর্ব্ব নিম্নতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা এক্ষণে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন। এখানে যে কর্ম্মচারীটী আছেন, ইনি সর্ব্ব নিম্নপদস্থ। ইহার নিকট আসিয়া চিঠী দেখাইবা মাত্র ইনি ইহার যথাপ্রাপ্য দস্তরী কাটিয়া

রাখিলেন এবং শীঘ্র শীঘ্র একখানি চিঠী লিখিয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ এবার ঐ কর্ম্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দস্তুরী বাদে এখন তাঁহার মাত্র বারো আনা দুই পয়সা পাওনা আছে। তবে খুচরা দুই এক পয়সা বা তিন পয়সা পাওনা হইলে তাহা দেওয়ার নিয়ম নাই বলিয়া ব্রাহ্মণ আর তাহা পাইবেন না। পূরা বারো আনা তিনি পাইতে পারেন। এই বারো আনা কাহার নিকট পাওয়া যাইবে, সে আবার তাহার দস্তুরী লইবে কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর ঐ কর্ম্ম-চারী কহিল,—এই বারো আনা আমারই নিকট পাইতেন। কিন্তু আমার হাতে এখন পয়সা নাই। আমি যে চিঠি দিলাম, ইহা লইয়া আপনি এই স্থান হইতে খানিটা দূরে যে একখানা মুদীর দোকান আছে, সেইখানে যাউন। মুদী দস্তুরী লইবে না, তাহাকে চিঠী দেখাইলেই সে আপনাকে বারো আনা দিয়া দিবে।

কর্ম্মচারীর কথা মত ব্রাহ্মণ সেই মুদীর দোকানে গেলেন; মুদীকে গিয়া পত্র দেখাইলেন। মুদী ব্রাহ্মণকে এক দীর্ঘ প্রণাম করিয়া পত্র পড়িয়া বলিল,—ঠাকুর, আমার এখানে রাজবাড়ী হইতে সময় সময় এইরূপ চিঠী আসে বটে; কিন্তু নগদ টাকা পয়সা দিবার তো আমার নিয়ম নাই। আমার দোকানে চাউল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, আটা, ময়দা, ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী আছে। আপনার আবশ্যক হইলে আপনি বারো আনা মূল্যের জিনিষ পত্র লইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন—বুঝিয়াছি, নগদ অর্থ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। ঘরে চাউল ডাল নাই, অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া তাহা লইয়া যাইব। এক্ষণে দেখা যাউক, অনেক দিন হইতে আমার

একটা সাধ আছে, তাহা পূরে কিনা? আমার একখানি বৈ বস্ত্র নাই। তাহাও মলিন এবং ছিন্ন। সেইখানি পরিয়াই স্নান করি; সন্ধ্যাহ্নিক করি; সেইখানি পরিয়াই ভিক্ষার্থ গ্রামান্তরে যাই। সুতরাং এই মুদীর দোকানে যদি নূতন কাপড় থাকে, তবে বারো আনার পরিবর্ত্তে একখানি কাপড় লইয়া যাই।

এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ মুদীকে বলিলেন,—তোমার দোকানে কাপড় আছে কি?

মুদী বলিল—আজ্ঞে হাঁ, কাপড় আছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বারো আনায় একখানা কাপড় হইতে পারে?

মুদী বলিল,—তা' একরূপ একখানা পাইতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তবে আমায় একখানা বারো আনা মূল্যের কাপড়ই তুমি দাও।

মুদী বলিল—যে আজ্ঞে। এই বলিয়া মুদী ব্রাহ্মণকে একখানি থান-কাপড় দিল। ব্রাহ্মণ কাপড় খানি বগলে লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—আমার কি অদৃষ্ট! আমি দুই শত টাকা পাইতে গেলাম; সেই টাকার পরিবর্ত্তে এখন আমাকে একখানি মাত্র কাপড় লইয়া যাইতে হইল। অদৃষ্টের এমন বিড়ম্বনা তো আর কাহারও হইয়াছে বলিয়া আমি শুনি নাই, দেখিও নাই। আমার বিধাতা পুরুষ নিশ্চয়ই লোক-সাধারণের বিধাতা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। যা হউক, আমি আর গৃহে যাইব না। আমার বিধাতা পুরুষকে আমি একবার দেখিব, আমার অদৃষ্ট-রহস্য জানিয়া লইব।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আর গৃহে গেলেন না। নদ-নদী—পর্ব্বত-প্রান্তর

পার হইয়া তিনি তাঁহার বিধাতা পুরুষের উদ্দেশে চলিলেন। ব্রাহ্মণ বনের ফল মূল খান; রাত্রি হইলে বৃক্ষতলায় শুইয়া থাকেন; প্রভাতে আবার হাটিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ মাসাবধি কাল যাইতে যাইতে একদিন সম্মুখে এক সন্ন্যাসী দেখিলেন; সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধুবর! বিধাতা পুরুষের বাড়ী কোথায়, দয়া করিয়া আমায় বলিয়া দিন।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন,—ঐ যে—ঐ অট্টালিকা দেখা যায়, উহাই বিধাতা পুরুষের বাড়ী।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ মত চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে তিনি গিয়া সেই অট্টালিকার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে এক সুবেশ সুপুরুষ বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়! এই কি বিধাতা পুরুষের বাড়ী! এই স্থানেই কি তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?

সেই পুরুষ উত্তর করিলেন,—হাঁ মহাশয়! এইখানেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে সকলের ভাগ্যে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটে না।

ব্রাহ্মণ মনে মনে কহিলেন,—আমার যেরূপ ভাগ্য বরাত, তাহাতে বিধাতার দর্শনলাভ আমারও নিশ্চয়ই ঘটিবে না। যা হউক, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখি,—ইনি কে? এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,——আপনি মহাশয় কে?

পুরুষ। আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যমাত্র। তবে আমার কর্ম্ম দেখিয়া আমাকেও লোকে বিধাতা পুরুষ বলিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ। আপনার কর্ম্ম কি? আপনার উপর বিধাতার কোন্ কর্ম্মের ভার?

পুরুষ। আমি বিধাতার আদেশে মানব জাতির কর্ম্মফল লিখিয়া রাখি। মানবেরা কে কিরূপ কর্ম্ম করিয়া কি কিরূপ শুভাশুভ গতি লাভ করিবে, বিধাতার আদেশে তাহা লিখিয়া রাখাই আমার কাজ।

ব্রাহ্মণ। দেখিতেছি, আপনিই তা'হলে বিধাতার প্রতিনিধিস্বরূপ। আচ্ছা, আপনি একাই কি সমস্ত মর্ত্ত্যবাসীর কর্ম্মফল লিখিয়া রাখেন, না— আপনার ন্যায় বিধাতা অন্য আরও আছেন?

পুরুষ। এরূপ বিধাতা আরও অনেক আছেন। আমি একা এত কাজ পারি কি?

ব্রাহ্মণ। বেশ কথা, আপনি আপনার খাতায় দেখুন দেখি,—আমি অমুক গ্রামের অমুক ব্রাহ্মণ; আমার অদৃষ্টে আপনার খাতায় কিরূপ কর্ম্মফল লিখিত আছে?

পুরুষ। খাতার খানিকটা ওণ্টাইয়া কহিলেন,—না মহাশয়, আপনার অদৃষ্টলিপি এখানে নাই। আপনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হউন। সম্মুখেই আমার মত আর একজনকে পাইবেন।

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। সেখান হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখেই আর একটা প্রকাণ্ড ভবন দেখিলেন। সেই ভবনদ্বারেও পূর্ব্বের ন্যায় আর একজন পুরুষ দেখিতে পাইলেন। এই পুরুষের দেহশ্রী পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ম্লান; দেহের বর্ণও কিঞ্চিৎ অনুজ্জ্বল; তবে অন্যান্য অঙ্গসৌষ্ঠব ইঁহার বিলক্ষণ আছে। ব্রাহ্মণ এই পুরুষকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—মহাশয়, আপনি কি একজন বিধাতা পুরুষ?

সেই পুরুষ বলিলেন,—হাঁ, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বিধাতা পুরুষ।

ব্রাহ্মণ। আচ্ছা, আপনারা এইরূপ কয় শ্রেণীর কতজন বিধাতা পুরুষ আছেন?

পুরুষ। আপনি পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বিধাতা পুরুষ; আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর; এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ইত্যাদি করিয়া পঁচিশ শ্রেণীর পঁচিশ জন বিধাতা পুরুষ আছেন।

ব্রাহ্মণ। আমার ভাগ্যলিপি কোন্ বিধাতা পুরুষের হাতে পড়িয়াছে, আপনি বলিতে পারেন কি?

পুরুষ। আমার মধ্যে তো নাই-ই। তবে আমার বোধ হয়, সর্ব্বশেষে যে বিধাতা পুরুষ আছেন, তাঁহার খাতায় আপনার অদৃষ্ট ফলাফল লিখিত থাকিতে পারে।

ব্রাহ্মণ। আমার অদৃষ্টের ফলাফল এ যাবৎ যাহা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে ঐ শেষোক্ত নিম্নশ্রেণীর বিধাতা পুরুষই আমার বিধাতা পুরুষ হওয়া সম্ভবপর। আমি তবে এখন সেইস্থানেই যাই।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ সেস্থান হইতে চলিলেন। তিনি যাইতে যাইতে সপ্ততল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ষট্‌তল, পঞ্চতল, চতুস্তল, ত্রিতল, দ্বিতল ও একতল-গৃহবাসী বিধাতা পুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। ক্রমে খোলার ঘর দেখা দিল। এই না, খড়ের ঘর আসিল। তার পর পর্ণকুটীর বাহির হইল। বলা বাহুল্য, উক্ত সকল ঘরেই এক এক জন বিধাতা পুরুষের বাস। ঐ সমস্ত বিধাতা পুরুষ ক্রমান্বয়ে একে অন্য অপেক্ষা শ্রীহীন। ব্রাহ্মণ ক্রমাগত যাইতেছেন; কোথাও আর থামিতেছেন না। ক্রমে একে একে চব্বিশ জন বিধাতা পুরুষকে অতিক্রম করিলেন। এইবার ব্রাহ্মণের যিনি বিধাতা পুরুষ, তিনি দেখা দিলেন। ইনি দেখিতে কদাকার;

মাথায় জটার ভার; পরিধানে ছিন্ন বসন; মুখে দাঁত একটীও নাই; সুদীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রুরাশি আনাভি লম্বমান; সম্মুখে একটা মৃণ্ময় কমণ্ডলু; বসিবার আসন বৃক্ষপত্র। এই বিধাতার গৃহ নাই। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের মূলে ইনি উপবিষ্ট।

ব্রাহ্মণ দূর হইতে দেখিয়াই স্থির করিলেন,—হাঁ ইনিই বটে আমার বিধাতা পুরুষ। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন; ক্রমে নিকটে গেলেন। বিধাতার বক্রদৃষ্টি এইবার ব্রাহ্মণের উপর পড়িল। ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; প্রণামকালে তাঁহার বগলের সেই নূতন বস্ত্রখানি পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে উঠিয়া আবার সেই বস্ত্রখানি বগলে লইলেন। অনন্তর করযোড়ে কহিলেন,—হে আমার বিধাতা পুরুষ! আমি বহু কষ্ট করিয়া বহুদিন ধরিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার অদৃষ্টলিপি কিরূপ, তাহা আপনি দয়া করিয়া বলুন।

বিধাতা কহিলেন,—তোমার নাম ধাম কি? তুমি কোন্ জাতি?

ব্রাহ্মণ বিধাতা পুরুষের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। এইবার বিধাতা খাতা ওল্টাইতে লাগিলেন। তিনি এক একবার খাতা ওল্টান, আর ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া দেখেন। ব্রাহ্মণের বগলে একখানি নববস্ত্র ছিল; তাহাতেই বিধাতা পুরুষের লিপির সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে না; বিধাতা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইলেন; ক্রোধ-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কি আমি যার বিধাতা পুরুষ, তার আবার নূতন কাপড়! ফেল্ বেটা,—কাপড় ফেল্! ব্রাহ্মণ গতিক দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। বিধাতা পুরুষও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের সেই নূতন কাপড়খানি আর পরা হইল না।

আদর্শ মিতব্যয়ী।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! একসময় গঙ্গাতীরস্থ কোন সমৃদ্ধ নগরে এক ধনাঢ্য বৈশ্য বাস করিত। বৈশ্যের প্রচুর অর্থ ছিল। কিন্তু নিজে কিছুই ভোগ করিত না, বা কাহাকেও একটী পয়সাও দান করিত না। বহু অর্থ থাকিতেও সে দীন দুঃখীর ন্যায় জীবন যাপন করিত। বৈশ্যের নাম ছিল বসুভূতি। কিন্তু সে দিন দিন এতই কৃপণ হইয়াছিল যে, তাহার নাম গ্রহণ করাও লোকে পাপ বলিয়া মনে করিত। সাধারণের ধারণা হইয়াছিল, ঐ কৃপণের নাম লইলে সে দিন আর অন্ন জুটিবে না; তাই আহারের পূর্ব্বে কেহই তাহার নাম লইত না।

বৈশ্য বসুভূতি ধর্ম্ম করিত; কিন্তু যেরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থ ব্যয় আছে, তাহার ছায়াংশেও সে থাকিত না। কেবল কড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া—আর যথাকালে সমস্ত টাকা সুদে আসলে একটী পয়সাও বাদ না দিয়া আদায় করা,—এই দুইটী কার্য্যই বসুভূতির জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল।

বসুভূতির সংসারে স্ত্রী নাই, পুত্র নাই; আপনার বলিতে সংসারে তাহার একটী মাত্র কন্যা। কন্যাটীকে বসুভূতি বড়ই ভাল বাসে; কিন্তু ভালবাসে বলিয়া অর্থ-বিনিময়ে কন্যাকে কোন কিছু কিনিয়া আনিয়া দিতে বসুভূতি একান্তই নারাজ। সুতরাং কন্যার প্রতি তাহার স্নেহ ভাল-বাসা কেবল অন্তরে ও মুখে।

কন্যা ক্রমে বড় হইল; পিতার আর্থিক অবস্থার পরিচয় পাইল; ভাবগতিক বুঝিল। কিন্তু সমস্ত বুঝিয়াও পিতার কার্য্যের বা কথার

প্রতিবাদ সে কিছুই করিত না; কেবল একটী দিন মাত্র বলিয়াছিল—বাবা, আপনার এত অর্থ আপনি ভোগ না করিলে কে করিবে? কাহার জন্য নিজে না খাইয়া না পরিয়া এত অর্থ আপনি সঞ্চয় করিতেছেন? আপনার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, আর কত দিনই বা আপনি বাঁচিবেন? আর নিজে যদি নাই খান্, নাই ভোগ করেন তো, ধর্ম্মকর্ম্ম করুন, গরীব দুঃখী সদ্ব্রাহ্মণকে দান করুন; পরকালের পথ পরিষ্কার করুন।

কন্যার এই কথায় পিতা বসুভূতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, মা, আমায় অপব্যয়ের কথা বলিও না। জীবন থাকিতে আমি তাহা পারিব না। খাই বা না খাই, টাকা,—টাকা,—টাকাই আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। যাহাতে দুই চারিটী পয়সার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে, এমন খাওয়া আমি চাই না; কিম্বা যাহাতে একটী পয়সাও ব্যয় আছে, এমন ধর্ম্মকর্ম্মও আমি করিতে ইচ্ছা করি না। তোমায় আমি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি, তুমি আর কখনও আমায় এরূপ অপব্যয়ের কথা বলিও না। সংসারে মিতব্যয়ী হইতে হয়। আমি তাহাই হইয়াছি। এরূপ না হ'লে সংসার যে দু'দিন পরেই অচল হইয়া পড়িবে।

কন্যা সেই দিন হইতে পিতাকে আর অর্থব্যয় সম্বন্ধে কোন কথাই কহিতেন না; পিতার অভিপ্রায় অনুসারেই চলিতেন।

একদিন বসুভূতি বড়ই চিন্তিত। চিন্তার কারণ, কন্যার বয়স হইয়াছে; বিবাহ দিতে হইবে; বিবাহ দিতে হইলেই কিছু না কিছু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এখন উপায়? কন্যা সন্তান অধিক দিন অবিবাহিত অবস্থায় রাখা যাইবে না; সুতরাং কি করা যায়? বেশী

অর্থও লাগিবে না, অথচ কন্যাটীর বিবাহ হইয়া যাইবে, এরূপ পথ কি আছে?

বসুভূতি ভাবিলেন,—দেশে কন্যা বিবাহ দেওয়া হইবে না; কেননা, দেশের লোকে জানে,—আমার অনেক অর্থ আছে। সুতরাং দেশের মধ্যে যদি কোথাও কন্যার বিবাহসম্বন্ধ করিতে যাই, বরপক্ষ বলিবে—এত চাই, তত চাই; এ না হ'লে হ'বে না, তা না হ'লে চলিবে না; আমি তাহা পারিব না। আমার যাহারা জ্ঞাতি গোষ্ঠী আছে, তাহাদিগকেও এ সম্বন্ধে কিছুই জানান হইবে না। কেননা তাহাদিগকে জানাইলে, তাহারা বলিবে—তোমার পুত্র নাই, ক্ষেত্র নাই; যথেষ্ট অর্থ আছে। তুমি কন্যার বিবাহে হেন কর, তেন কর; এই সব বলিয়া আমায় ফকীর হইবার পরামর্শ দিবে। অতএব আমি কাহাকেও না বলিয়া নিজেই বিদেশে গিয়া কন্যার সম্বন্ধ করিয়া আসিব। নিজের দেখার আরও একটা গুণ এই যে, যাহার কাছে কন্যাটীকে সম্প্রদান করিব, সে, তাহার পিতা-মাতা ও তাহার ঘর সংসার কিরূপ, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমি স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিতে পারিব। মোট কথা, আমি দেখিব, সংসারটী অপ-ব্যয়ের সংসার না হয়। দু'পয়সা থাকে, অথচ খরচ করিয়া উড়াইয়া না দেয়, এমন একটী গৃহস্থ হইলেই আমার কন্যাটী সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে। আমি কুল চাই না, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জামাতা চাই না; চাই কেবল যে ঘরে অপব্যয় নাই; এমন একটী ঘর। তা' আমি নিজে না গেলে এরূপ ঘর দেখিয়া শুনিয়া স্থির করা অন্যের দ্বারা হইবে কি? বিশেষতঃ যদি চেষ্টা করিয়া এমন একটী ঘর মিলাইতে পারি, তবে আমিও অপব্যয় না করিয়া কন্যাদান করিতে পারিব; কেননা যাহারা নিজে অপব্যয়ী নয়, তাহারা পরের অপব্যয়ও পছন্দ করে না।

সুতরাং আমিই বা ব্যয় করিয়া বৈবাহিক পরিবারের অপছন্দের কাজ করিতে যাইব কেন? অতএব অদ্য রাত্রি প্রভাত হইলেই আমার কন্যার যোগ্য বর অন্বেষণ করিবার জন্য আমি নিজেই দেশান্তরে গমন করিব।

বসুভূতি যাহা ভাবিলেন, কার্য্যেও তাহাই হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বসুভূতি গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন। বসুভূতির অনুরোধে তাঁহার সগোত্রীয়া এক বৃদ্ধা বসুভূতির বাড়ীতে আসিয়া রহিলেন। বসুভূতি তাঁহার নিকট কন্যাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া এবং নিজের অর্থাদি খুব সাবধানে রাখিয়া দেশান্তরে চলিলেন।

বসুভূতি স্বগ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে গমন করিলেন। এতদূর আসিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এখন যে সকল গ্রাম দেখা যায়, এ সকল গ্রামের অধিবাসীরা আমার পরিচয় জানে না। অতএব এই স্থান হইতেই পাত্রের অনুসন্ধান করা যাউক। আমার মনোমত পাত্র আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। এই ভাবিয়া এক দুই তিন করিয়া প্রায় পঁচিশখানি গ্রাম অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনোমত পাত্র কুত্রাপি মিলিল না। এখন উপায় কি? যদি মনোমত পাত্র না মিলে, তবে তো ব্যয় করিয়া অপব্যয়ীর ঘরে কন্যাটীকে অর্পণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়াই বসুভূতি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

এ দিকে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। বসুভূতি অদ্য কিঞ্চিৎ ক্ষুধা বোধ করিতে লাগিলেন। বসুভূতি বাড়ী হইতে আসিবার সময় পাথেয়-স্বরূপ পাঁচটি পয়সা আনিয়াছিলেন। দুই দিন অপব্যয় না করিয়া উপবাসেই কাটাইয়া দিয়াছেন। আজ তৃতীয় দিন কিঞ্চিৎ জলযোগ না করিয়া পারেন না; তাই পথের ধারের একটী দোকান হইতে অর্দ্ধ

পয়সার বাতাসা কিনিয়া লইলেন এবং আরও কিছু দূর গিয়া গ্রামের প্রান্তস্থিত এক পুষ্করিণীর তীরে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময় সেই পুষ্করিণীর অপর পারে আর এক বৃদ্ধ আসিল। বৃদ্ধের হস্তে একটী যষ্টি; যষ্টি র মাথায় বাঁধা একটী পুঁটুলী। এই বৃদ্ধও সেই পুষ্করিণীতীরস্থ এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

বসুভূতি পূর্ব্বে আসিয়াছেন। তিনি কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামের পরই জলে নামিলেন; স্নান করিলেন। স্নানান্তে কিছুকাল জপতপের পর একটা কাগজের ঠোঙা হইতে সেই অর্দ্ধ পয়সার বাতাসা কয়খানি বাহির করিলেন। বাতাসা কয়খানি হাতে লইয়া প্রথমে তিনি ভাবিলেন, —সব কয়খানিই খাইবেন; কিন্তু কার্য্যকালে তাহা পারিয়া উঠিলেন না। তিনি তন্মধ্য হইতে মাত্র দুই তিন খানি বাতাসা লইয়া পুষ্করিণীর এক স্থানের জলে গুলিয়া দিলেন, আর অঞ্জলি পুরিয়া সেই স্থান হইতে তিন অঞ্জলি জল পান করিলেন। এইরূপ জল যোগেই তিনি তৃপ্তি বোধ করিয়া তীরে উঠিলেন এবং অবশিষ্ট বাতাসা কয়খানি কাপড়ে বাঁধিয়া-রাখিয়া পুষ্করিণীর তীরে আরও একটু কাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পুষ্করিণীর পরপারস্থিত বৃদ্ধ, বসুভূতির জলযোগপ্রণালী দেখিয়া ঈষৎ হাসিল এবং নিজেও স্নানাহ্নিক করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার জন্য জলে নামিল। বৃদ্ধের সেই পুঁটুলী-বাঁধা লাঠি গাছটী বৃদ্ধের নিজের পার্শ্বে পুতিয়া রাখিল। পরে বৃদ্ধ স্নানাহ্নিক সমাধা করিল। বৃদ্ধের লাঠি গাছটীর মাথার পুঁটলীতে দু'মুঠা খৈ বাঁধা ছিল। বৃদ্ধ তাহা খাইল

না। সেই থৈ-বাঁধা পুঁটুলীটীর ছায়া যেখানে জলের মধ্যে পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে দুইতিন অঞ্জলি জল বৃদ্ধ তুলিয়া খাইল।

পরপারস্থিত বসুভূতি ইহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—ইনি দেখিতেছি একজন পরম মিতব্যয়ী মহাপুরুষ। ইহাঁর পরিচয় আমার লইতে হইবে। ঈশ্বর যদি অনুকূল হইয়া থাকেন, তবে এইবার হয়তো আমার যোগ্য কুটুম্ব মিলিতে পারে। আমি বরং অপব্যয়ী; কিন্তু ঐ যে মহাত্মাকে দেখিলাম, উনি অপব্যয়ের লেশ মাত্রও জানেন না। যাহা হউক, একবার আলাপ পরিচয় করিয়া দেখি—এ বৃদ্ধ কোন্ জাতি, কোথায় বসতি? কি উদ্দেশ্যেই বা কোথায় যাইতেছেন?

বসুভূতি ইহা ভাবিয়া পুষ্করিণীর পরপারে সেই বৃদ্ধের নিকট গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন,—অগ্রে তোমার পরিচয় বল, পরে আমার পরিচয় জানাইব।

বৃদ্ধের কথানুসারে বসুভূতি আত্মপরিচয় যথাবৎ প্রদান করিলেন। তখন বৃদ্ধ বলিলেন,—শুন তবে আমার পরিচয়। আমি জাতিতে বৈশ্য; আমার নাম ধনমিত্র। আমার কিঞ্চিৎ অর্থসংস্থান আছে বটে; কিন্তু পরে থাকিবে কিনা জানি না। তবে আমি অবশ্য অপব্যয় করি না; আমার একটী মাত্র পুত্র। পুত্রটীও যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও মতি অপব্যয়ের দিকে নাই। এই যা ভরসা। এখন পুত্রটীর বয়স হইয়াছে। তাহার বিবাহ দিতে হইবে। একটী ভাল ঘরের কন্যা দেখে বিবাহ দিব, এই অভিপ্রায়েই নিজে এই বৃদ্ধ-বয়সে দেশে দেশে কন্যা সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি।

বসুভূতি বলিলেন, কিরূপ ভাল ঘর আপনি খুঁজিতেছেন?

বৃদ্ধ। ভালঘর কথার অর্থ এই যে, ঘরটী অপব্যয়ের ঘর না হয়।

নিজে যদি না দেখিয়া শুনিয়া হঠাৎ কোন অপব্যয়ীর কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া ফেলি, তবে সংসর্গগুণে কালে আমার পুত্রেরও মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পুত্র যদি একবার ব্যয়ের দিকে মন দেয়, তা হ'লে আমার যতই সঞ্চয় থাকুক, উহা লুটাইয়া ফেলিতে কতক্ষণ? এই আশঙ্কাতেই আমি একটী ভাল ঘরের কন্যা সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি।

বসুভূতি বলিলেন,—আমারও একটী মিতব্যয়ী পাত্রের দরকার। সেইজন্যই আমি দেশে দেশে পাত্রানুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি। মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তবে আমার কন্যাটীর সহিত আপনার পুত্রের বিবাহসম্বন্ধের প্রস্তাব আপনার নিকট আমি উত্থাপন করিতে পারি।

বৃদ্ধ। তোমার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে আমার আপত্তি কিছুই ছিল না। তবে তোমার জলযোগ করিবার প্রণালী দেখিয়া তোমাকে কিছু অপব্যয়ী বলিয়া আমার মনে হইতেছে এবং এইজন্যই তখন আমার একটু হাসিও পাইয়াছিল। যাহা হউক, সঞ্চয়ের দিকে তোমার দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তা'হ'লেও তুমি যে সেই তিন চারখানি বাতাসা জলে গুলিয়া নষ্ট করিলে, ইহা দেখিয়াই আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হয়—পাছে তোমার মেয়েটীও ঐরূপ প্রকৃতির হইয়া পড়ে।

বসুভূতি বলিলেন, তা' বটে, আমি যদি আপনার জলযোগ প্রণালীটা আগে দেখিতে পাইতাম, তবে এরূপ অপব্যয়ের কথা অমাকে শুনিতে হইত না। আমার যে তিন চারিখানি বাতাসা নষ্ট হইয়াছে, তাহাও হইত না। যা হউক, আমি একথা আপনাকে নিশ্চয় বলিতে পারি, যদিও আমার কন্যার একটু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকে, তা' আপনার সংসারে

পড়িলে, আপনাদের আদর্শে কন্যা আমার শোধরাইয়া যাইবে। আপনি সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না।

বৃদ্ধ বলিলেন—হাঁ, গড়িয়া পিটিয়া তৈয়ার করিতে হইবে। তা' হউক, ইহা অপেক্ষা মিতব্যয়ীর কন্যা সন্ধানে আর মিলিবে না, আর এ বয়সে চলিয়া চলিয়া খুঁজিয়া উঠিতেও পারি না। যা হউক, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ থাকিলে তোমার কন্যার সহিতই আমার পুত্রের বিবাহ দেওয়া যাইবে। ইহাই স্থির করিলাম।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর বসুভূতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর শুভদিনে বৃদ্ধ ধনমিত্রের পুত্রের সহিত বসুভূতির কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে উভয় পক্ষে মাত্র একটাকা চৌদ্দ আনা খরচ হইয়াছিল। শুনা যায়, এই ব্যয়াধিক্যের জন্যই শেষে বৈবাহিকদ্বয় বিবাহের পর অনেক দিন ধরিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর ধনমিত্র পুত্রবধূ লইয়া গৃহে আসিলেন। পুত্রবধূ শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—চমৎকার অট্টালিকা, চমৎকার উদ্যান-সরোবর! এমন অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় বাড়ী ঘর তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার পিতৃভবনও ইষ্টকময় বটে; কিন্তু তাহা এরূপ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরময় নয়। যাহা হউক, নববধূ শ্বশুরালয় দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন; ভাবিলেন—এ সংসার পিতৃসংসারের ন্যায় নিশ্চয়ই কার্পণ্যপূর্ণ হইবে না। কিন্তু এ ধারণা তাঁহার বেশীক্ষণ রহিল না। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয়ের খরচ পত্রের যেরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতার সংসার ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল ছিল, এইরূপই কেবল মনে হইতে লাগিল। ধনমিত্রের পুত্রবধূ একজন বিখ্যাত কৃপণের কন্যা হইলেও তাঁহার মাতামহবংশ-গুণে তিনি ততটা কৃপণ-

স্বভাব ছিলেন না। তাঁহার মন উচ্চ ছিল; কিন্তু করিবেন কি? যেমন পিতার সংসার, শ্বশুরের সংসার তাহা অপেক্ষাও কার্পণ্যপূর্ণ। দেখিয়া শুনিয়া তিনি নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

একদা বৈশাখ মাস। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়। শ্বশুর গৃহের নিয়মানুসারে বৈশ্যবধূ সন্ধ্যার ক্ষীণ দীপশিখা প্রজ্বালিত করিয়া পরক্ষণেই তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া আপন শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। হঠাৎ কি একটা দেখিয়া লইবার প্রয়োজন হইল; কিন্তু অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না; কারণ শ্বশুরের হুকুম ছিল, সন্ধ্যা হইলে ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়াই আলো নিবাইয়া রাখিতে হইবে। নহিলে তৈল অধিক খরচ হইবে। ঐরূপ অযথা খরচ এ সংসারে কেহ করিতে পারিবে না। এই হুকুম মনে করিয়াই তিনি আর প্রদীপ জ্বালিতে পারিলেন না। মনে বড়ই কষ্ট হইল। তিনি বসিয়া বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কি পাপের ভোগই না ভুগিতেছি! এতো আর সহ্য হয় না। কি করিব? আমার শ্বশুরকে আমি পারিয়া উঠিব না; কিন্তু আমার স্বামীকে আমি অবশ্যই কার্পণ্যমুক্ত করিব। এত অর্থ—এত ঐশ্বর্য্য, অথচ ইহার কিছুমাত্র তাঁহার ভোগে আসিবে না, ইহা আমি সহিতে পারিব না। আমার অদৃষ্টে তিরস্কার বা পুরস্কার যাহাই থাকুক, আমি আজ হইতেই স্বামীর মতিগতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিব।

বৈশ্যবধূ তাহাই করিলেন। তিনি সেই দিনই একান্তে স্বামীকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, দেখ—এই তোমার অপার ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে? তোমার এত অর্থ থাকিতেও তুমি যে দীন দুঃখীর ন্যায় দিনপাত কর, ইহা আমার প্রাণে একান্তই অসহনীয়। তুমি কি শাস্ত্রবাক্য শুন নাই? শাস্ত্রে বলে, কৃপণের ধন—অগ্নি, চোর ও রাজা,

এই তিনজনের কবলে পতিত হয়। আমার কেবল মনে হয়, তোমাদের এই প্রাণোপম অর্থরাশির দশাও অবশেষে সেইরূপই বা ঘটে।

ধনমিত্রের পুত্রও পিতার ন্যায় কৃপণস্বভাব। স্ত্রী অত করিয়া প্রবোধ দিলেও তাহার মনে তাহা স্থান পাইল না। তবে সে মুখে বলিল,—তা বৈ কি? ভোগের জন্যই তো ধন। ভোগ না করিতে পারিলে সে ধন দিয়া প্রয়োজন কি? আমি নিশ্চয়ই ধনের সদ্ব্যবহার করিব; কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে তাহা পারিতেছি না। পিতার কাল হইলে তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। এখন যদি তোমার কথামত কার্য্য করিতে যাই, তাহা হইলে আমার কৃপণ পিতার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। এমন কি তিনি তাহা করিতেই দিবেন না।

বৈশ্যবধূ আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন,—আমার স্বামীর তবে দোষ নাই। ইঁহার অন্তঃকরণ উচ্চ। ইনি পিতার তুষ্টির জন্যই কেবল একটা কৃপণের সাজ পরিয়া আছেন। যাহা হউক, এই বিপুল ধনরাশির সদ্ব্যবহারের জন্য সময়ের অপেক্ষা করা যাউক।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈশ্যবধূ কতকটা স্বস্তি বোধ করিলেন। তিনি স্বামীর কথার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ক্রমে একে একে অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন ধনমিত্র অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইলেন। দেহাভ্যন্তরে নিরন্তর প্রদাহই তাঁহার ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আর কিছুতেই স্বাস্থ্য বোধ করেন না। ক্রমে তাঁহার মরণকাল নিকটবর্ত্তী হইল। অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হইয়া ধনমিত্র একদিন পুত্রবধূর নিকট জল চাহিলেন। পুত্রবধূ কিঞ্চিৎ কর্পূর-বাসিত শীতল জল তাঁহাকে খাইতে দিলেন। ধনমিত্র স্বল্পমাত্র জল অধঃকরণ করিয়াই ক্রুদ্ধ হইলেন; অবশিষ্ট জল দূরে

ফেলিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার সংসার লুটাইবে! জলে এমন করিয়া কর্পূর দিতে তোমায় কে বলিয়াছে? ওঃ বুঝিয়াছি, আমার অবর্ত্তমানে আমার এত যত্নের টাকাগুলি তোমরা উড়াইয়া দিবে। কি করিব, আর শক্তি নাই, যা হয় তোমরা কর।

পুত্রবধূ অবাক্; ভাবিলেন,—বৃদ্ধ মরিতে বসিয়াছে, তবু কি পাপের ভোগ সে, একটু কর্পূরের জলও গলাধঃকরণ করিল না! ভাবিয়া চিন্তিয়া পুত্রবধূ সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন।

এদিকে দুই তিন দিনের মধ্যে বৃদ্ধ ধনমিত্র কালপ্রাপ্ত হইল। উপযুক্ত পুত্র ব্যয়ভয়ে শ্রাদ্ধশান্তি যৎপরোনাস্তি হীনভাবেই সমাধা করিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। এইবার একদিন বৈশ্যনন্দনের পত্নী পতিকে তাঁহার অর্থরাশির সদ্ব্যবহারের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। পতি এবার ফাঁফড়ে পড়িলেন; ভাবিলেন,—পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার অসন্তুষ্টির অছিলায় পত্নীকে আমি ব্যয়ের কথা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম। এখন পিতা আমার পরলোকে, পত্নীকে আমি কি বলিয়া বুঝাইব? সত্য কথা বলিতে কি, আমার এত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও উহা হইতে এক কপর্দ্দকও আমার ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না। পিতা যে ভাবে দিন কাটাইয়াছেন, আমারও সেই ভাবে দিনপাত করিবার ইচ্ছা, ভাবিয়া চিন্তিয়া বৈশ্যপুত্র প্রকাশ্যে পত্নীকে বলিলেন,—দেখ, আমার নিজের আর ভোগসুখে তত ইচ্ছা নাই। ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতেই আমার ইচ্ছা হইতেছে।

পত্নী বলিলেন,—সে তো উত্তম কথা! আপনি তাহাই করুন! দীন দুঃখীকে দান করুন, সৎপাত্রে—সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে থাকুন। ধর্ম্মকার্য্য করা অপেক্ষা সংসারে আর উত্তম কার্য্য কি আছে?

বৈশ্য-নন্দন এবার আর মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না;

বলিলেন,—দেখ তোমার নিকট আর গোপন করিয়া লাভ নাই। যাহাতে ব্যয়ভূষণ করিতে হইবে, এরূপ ধর্ম্মকার্য্য আমি করিতে পারিব না। তোমার কাছে চাপিয়া রাখিয়া ফল কি? অর্থ আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। উহা আমি ব্যয় করিয়া ফেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, গঙ্গাস্নান অতি পুণ্যকর্ম্ম; আমি কেবল তাহাই করিব।

পত্নী বলিলেন,—বেশ কথা, তাহাই করুন। বৈশ্যনন্দন সেই দিনই পত্নীকে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। কিন্তু যাহাতে একটী পয়সাও ব্যয় না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। শুধু একখানি গামছা লইয়া তিনি পত্নী সহ যথায় জনমানবের সমাগম নাই, এমন একটী স্থানে গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। গঙ্গার ঘাটে লোকজন থাকিলে পাছে কেহ একটী পয়সা চায়, কেহ বা পুরোহিত হইয়া স্নানের মন্ত্র পড়াইতে আইসে, তাহাকে আবার দক্ষিণা দিতে হয়, ইত্যাদি ব্যয়ের ভয়েই বৈশ্যনন্দন গঙ্গার নির্জ্জন তীরে স্নান করিতে আসিলেন। কিন্তু বৈশ্যের ব্যবহারে বিধাতার আসনও টলিল। তিনি বৈশ্যতনয়ের এইরূপ কার্পণ্যে গোড়া হইতেই বিরক্ত। তাঁহার কেমন একটা লীলা খেলিবারও কৌতূহল হইল। তিনি ভাবিলেন, এ ব্যাটা যেমন ব্যয়ভীরু, দেখি না,—ইহার নিকট হইতে কিছু আদায় করা যায় কিনা।

এই ভাবিয়া বিধাতা বৈশ্যনন্দনের গুরুর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; পরে বৈশ্য যখন স্নান করিয়া গঙ্গা হইতে উঠিবে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ তাহার কাছে গিয়া কহিলেন,--বাপু হে, আমি তোমার গুরু; তোমার ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়াছে শুনিয়া আমি বড়ই তুষ্ট হইয়াছি। যা হউক, অদ্য শুভ দিন; তুমিও গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিয়াছ। এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমাকে আমি দীক্ষিত করিয়া যাই।

বৈশ্যনন্দনের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভাবিল—আমি এত লুকাইয়া এত নির্জ্জন স্থানে স্নান করিতে আসিলাম, এ গুরু আবার এখানে কোথা হইতে আসিয়া হাজির হইলেন! প্রকাশ্যে বলিল—তা' দীক্ষা যদি বিনাব্যয়ে হয়, আমি রাজী আছি। নচেৎ অর্থব্যয় করিয়া আমি দীক্ষা লইতে অক্ষম।

গুরু বলিলেন,—ওরে হতভাগ্য, জানি আমি অর্থই তোর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। আর তোর কাছে যে অধিক বা উপযুক্ত দক্ষিণাও পাওয়া যাইবে না, তাহাও আমার জানা আছে। তবে দক্ষিণা বিনা দীক্ষা পণ্ড হয়। এই জন্যই বলি, তুই মাত্র আটগণ্ডা পয়সা আমায় দক্ষিণা-স্বরূপ দান কর, আমি তোকে দীক্ষিত করিয়া যাই।

বৈশ্যনন্দন বলিলেন,—ঠাকুর, আট আনাও তো আমার নিকট এখন নাই।

গুরু বলিলেন,—আচ্ছা তুই এই আট আনা আমাকে পরে দিস্!

বৈশ্য রাজী হইল। গুরু তাহাকে দীক্ষা দিলেন। বৈশ্য সপত্নীক দীক্ষিত হইয়া বাড়ী আসিল। কয়েক দিন যাইতে না যাইতেই বিধাতা আবার গুরুরূপ ধরিয়া বৈশ্যনন্দনের বাড়ী গিয়া দক্ষিণার জন্য তাগিদ করিলেন। বৈশ্যনন্দন ভাবিল,—কি বিপদেই না পড়া গেছে! এ ব্রাহ্মণ আট আনার পয়সা ভুলে নাই? প্রকাশ্যে বলিল,—গুরুদেব! আমি সে পয়সা এখনও যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই, আপনি অন্য একদিন আসিবেন।

গুরু চলিয়া গেলেন। দুই চারিদিন বাদে আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুর আগমন-সংবাদ পাইয়াই বৈশ্যনন্দন উদ্বিগ্ন হইলেন; ভাবিলেন,—ব্রাহ্মণ আবার আসিয়াছে। কি করি, আমি যে আট আনার

পয়সা একসঙ্গে দান করিব, তাহা তো প্রাণ থাকিতে পারিব না। যা হউক, আজ একটা মিথ্যা সংবাদ দিয়া এ ব্রাহ্মণকে একেবারে নিরাশ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া বৈশ্য মড়ার মত সটান শুইয়া পড়িল, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল,—তুমি ঐ ব্রাহ্মণকে বলিয়া দাও যে, তোমার শিষ্য সর্পদংশনে মরিয়াছে। এই কথা কহিলেই ঐ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার পয়সায় নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবে। স্ত্রী বলিল,—আমি এমন ডাহা মিথ্যা কথা ব্রাহ্মণের কাছে বলিতে পারিব না। তুমি আট আনার পয়সা দিয়াই দাও না! বৈশ্য বলিল,—তুমি যদি এ কথা না বল, তবে আমাকে ঐ আট আনার পয়সা এখনই দিতে হইবে। এক কালে আট আনা দান আমার প্রাণে সহিবে না। সুতরাং মরণ আমার নিশ্চয়ই। ইহা বুঝিয়া যা' বলিতে হয় বল।

বৈশ্যস্ত্রী কি করিবেন? তিনি সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যা কথাই কহিলেন। শিষ্যের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ব্রাহ্মণরূপী বিধাতা অন্তরে একটু হাসিয়া প্রকাশ্যে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—হাঁ বল কি? সর্পদংশনে মৃত্যু! তবে তাহার শব-দেহ কি করিলে? বৈশ্যপত্নী বলিলেন,—এই ঘরেই দেহ পড়িয়া আছে। সৎকারেব কিছুই করিতে পারি নাই!

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ওঃ এমন কথা! আচ্ছা আমিই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতর গেলেন; গিয়া সেই শবাকার শিষ্যকে বাঁধিয়া ছান্দিয়া শশ্মানের দিকে লইয়া চলিলেন। বৈশ্য-পত্নীও সেই সঙ্গে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্মশানে গিয়া শব রাখিলেন, পরে নিজেই চিতাকাষ্ঠ সংগ্রহার্থ পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন—বৈশ্যের পো, অতি কৃপণ,—অতি দুষ্ট; ব্যাটা পয়সা ব্যয় কিছুতেই করিবে

না; কিন্তু আমিও উহাকে সহজে ছাড়িব না। দেখি, ব্যাটা পয়সা না দিয়া যায় কোথায়?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বৈশ্যের স্ত্রী এই অবসরে শবরূপী স্বামীকে বলিলেন,—দেখ, এখনও পয়সা দাও, না দিলে এখনই যে জীয়ন্তে দগ্ধ হইতে হইবে। বৈশ্য বলিল,—দেখি না—কতদূর হয়, এখনই কি পয়সা দিব?

এদিকে ব্রাহ্মণ কাষ্ঠ আনিয়া ক্ষিপ্রহস্তে চিতা সাজাইলেন এবং শিষ্যকে চিতার উপর চড়াইয়া দিলেন। শিষ্য কিন্তু তখনও স্থির;—তখনও অটল, অচল!

এইবার ব্রাহ্মণরূপী বিধাতা চিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। অগ্নি মৃদুমন্দ ভাবে এক একটু জ্বলিতে আরম্ভ করিল। সেই সামান্য উত্তাপে বৈশ্য উদ্বিগ্ন না হইয়া বরং ভাবিল—দেখাই যাউক না, এইভাবে জ্বলিয়া চিতা নিভিয়াও তো যাইতে পারে, তবুও তো আটগণ্ডা পয়সা থাকিয়া যাইবে; না দিয়া পারিলে কেন আগে দিতে যাইব?

এদিকে ব্রাহ্মণ অধিক তেজে চিতা জ্বালাইবার ইচ্ছা একএকবার করেন; কিন্তু পারিয়া উঠেন না। দয়াময় কি না, তাই দয়ার আবেগ তাঁহাকে তেমন নৃশংস কার্য্য করিতে দেয় না। তিনি চিতাগ্নি ধরাইতে ধরাইতে দয়ার বশে ভাবিলেন, না, আর কষ্ট দিব না। এ ব্যাটা অর্থের জন্য প্রাণ দিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাকে আর ক্লেশ দিব না। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে বলিলেন,—ওরে বৈশ্য! তোর আর দক্ষিণা দিতে হইবে না, তুই ওঠ, আমি আমার আটগণ্ডা পয়সার দাবী ছাড়িয়া দিলাম।

ব্রাহ্মণ যেমন এই কথা বলিলেন, বৈশ্য অমনি তড়াক্ করিয়া চিতা

হইতে লাফাইয়া উঠিল। তখন ব্রাহ্মণরূপী বিধাতা তাহাকে বলিলেন,—বৈশ্য, তুই পাপের ফলে তোর অপার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেছিস্ না। তোর এই পত্নীর পুণ্যযোগ আছে, এইজন্য আমি তোকে বর দিতেছি—যে সকল ধনসম্পত্তি তোর আয়ত্ত আছে, তাহা ভোগ করিতে পারিবি। তোরা এখন নিজগৃহে গমন কর।

বিধাতৃবরে সহসা বৈশ্যের কার্পণ্য দোষ ঘুচিল। সুমতির উদয় হইল। বৈশ্য ব্রাহ্মণের পা-দুইটী জড়াইয়া ধরিতে গেলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিমেষ মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। সেই হইতে বৈশ্য এবং বৈশ্যপত্নী তাঁহাদের অপার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অর্থে কত দীন দুঃখী অনাথ অন্ন পাইয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিতে লাগিল।

রাজপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা।

পণ্ডিতজী কহিলেন, জাঁহাপনা! প্রাচীন কালে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এক রাজা ছিলেন। রাজা নানা গুণে মণ্ডিত। রাজার ধন-দৌলত, লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, রথ-সারথি সুপ্রচুর;—সুসজ্জিত সভাগৃহ বহু সুধী সজ্জনে সমলঙ্কৃত; বিশাল রাজ্য সুব্যবস্থায় সুশাসিত;—শত্রু-বিরহিত; প্রজাপুঞ্জ ভয়-ভক্তি ভরে নিয়তই রাজার বিধেয়; রাজমহিষী সুর-সুন্দরীর ন্যায় পরমা সুন্দরী। তিনিই রাজার একমাত্র প্রেয়সী। রাজ্যে অশান্তি উপদ্রব নাই। রোগ দুর্ভিক্ষ নাই। সকলেই স্বচ্ছন্দে সুখময় জীবন যাপন করিয়া নিয়ত রাজার জয়ঘোষণায় নিরত।

রাজা বহুদিন রাজ্য করিলেন, ক্রমে বৃদ্ধ হইলেন, অথচ এযাবৎ তাঁহার একটীও পুত্র সন্তান হইল না। ইহাতে রাজা ও রাজমহিষী অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। রাজার কোন সুসন্তান হইল না দেখিয়া রাজার প্রজা-সাধারণও দুঃখ করিতে লাগিল।

রাজার যিনি মন্ত্রী, তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারও কোনও সন্তান-সন্ততি নাই। সুতরাং সন্তান বিনা তিনিও বিশেষ দুঃখিত।

একদা রাজা মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ বন গমন করিলেন। রাজা স্বয়ং গজারোহণে চলিলেন। লোক-লস্কর, গজ, অশ্ব, অনেক চলিল। রাজা লোকালয় ছাড়িয়া ক্রমে বনপথে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া শুনিতে পাইলেন,—নিকটেই এক সাধুর আশ্রম আছে। সাধু বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। তিনি প্রসন্ন হইয়া যাহাকে যেরূপ আশীর্ব্বাদ করেন, তাহার তাহা অচিরেই ফলিয়া থাকে।

রাজা এই কথা শুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে ভূতলে নামিলেন এবং একজন মাত্র সহচর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে সাধুসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সাধু তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। রাজা দূরে থাকিয়া অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। রাজা করযোড়ে সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—মহাপুরুষ! হতভাগ্য মানবের প্রতি প্রসন্ন হউন। সাধু হস্ত উত্তোলন করিয়া রাজাকে অভয় দিলেন; কহিলেন,—রাজন্! তোমার মনের বাসনা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য সকলই তোমার আছে। এক মাত্র পুত্র বিনাই তুমি দুঃখিত। আচ্ছা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরেই তোমার পুত্রলাভ হইবে। এই লও, এই মহাবস্তুটুকু গ্রহণ কর। ইহা লইয়া গিয়া মহিষীর কণ্ঠে ধারণ করাও।

এই বলিয়া সাধু রাজার করে কি একটী গাছড়া দিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ ভক্তিভরে সাধুর প্রদত্ত সেই বস্তুটুকু গ্রহণ করিলেন; এবং পুনর্ব্বার সবিনয়ে বলিলেন,—মহাত্মন্! আমার তো বংশরক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। আমার বৃদ্ধ মন্ত্রীও সন্তান বিনা একান্ত দুঃখিত; অতএব প্রার্থনা—আপনি তাঁহার প্রতিও কৃপাকণা বিতরণ করুন।

সাধু কহিলেন,—তোমার মন্ত্রীর পুত্র সন্তান হইতে পারে, এরূপ সুকৃতিসঞ্চয় নাই। তবে তিনি নিঃসন্তান রহিবেন না; তাঁহার একটী কন্যা সন্তান হইবে।

এই মাত্র বলিয়া সাধু মৌনাবলম্বন করিলেন। রাজাও সাধুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সপুলকে তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। তিনি সে যাত্রায় আর মৃগয়ায় গমন করিলেন না; সানন্দে নানা তীর্থ পর্য্যটন

করিয়া নিজ রাজধানীতেই ফিরিয়া আসিলেন। রাজার আগমনে সকলেই আনন্দিত হইল। মন্ত্রী সমারোহের সহিত রাজাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন।

রাজা নিজালয়ে আসিয়া সেই সাধুর প্রদত্ত গাছড়াটুকু সযত্নে মহিষীর কণ্ঠে ধারণ করাইলেন। কিয়দ্দিন পরেই মহিষীর গর্ভসঞ্চার হইল। ক্রমে এক মাস দুই মাস করিয়া দশম মাস উপস্থিত হইল। শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে মহিষী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। রাজা পুত্র-লাভে আনন্দিত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় বহুবিধ দান ধ্যান করিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্রই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। রাজবাড়ীতে আনন্দের স্রোত বহিল।

রাজসভায় সকলেই সানন্দে সমবেত। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল,—মন্ত্রিপত্নী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এ সংবাদে আজ আনন্দের উপর আনন্দ! বৃদ্ধ মন্ত্রী সন্তানলাভে একেবারেই নিরাশ হইয়াছিলেন; সুতরাং কন্যালাভেও তাঁহার আনন্দের আজ সীমা নাই। নিঃসন্তান মন্ত্রী একটী সন্তান লাভ করিলেন, এ সংবাদে রাজারও খুব আনন্দ হইল। রাজা আজ আনন্দে গদগদ হইয়া আবেগভরে আপনা-দের সন্তানলাভের দৈব রহস্য প্রকাশ করিলেন। সভাস্থ সকলেই সে সংবাদে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দৈবশক্তির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন।

ক্রমে রাজপুত্রের বয়স হইল। রাজা তাহার বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন। মন্ত্রি-কন্যাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পিতার যত্নে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইতে লাগিলেন।

রাজবাড়ী ও মন্ত্রীর বাড়ীর মাঝখানে সুন্দর একটী সরোবর;

সরোবরের চারিধারে সুন্দর সুন্দর সোপান; আর সরোবর-তীরের চতুর্দ্দিকেই সুন্দর সুন্দর পুষ্পোদ্যান। রাজপুত্র প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় উদ্যান ভ্রমণ করিতেন। ওদিকে মন্ত্রিকন্যাও সহচরী সঙ্গে উদ্যানভ্রমণে আসিয়া কখন সরোবর-সোপানে, কখন বা উদ্যানমধ্যস্থ বিশ্রামাসনে উপবেশন করিতেন।

বয়সে রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যা হইতে তিন চার ঘণ্টার বড়; কিন্তু বিদ্যায় মন্ত্রিকন্যা ক্রমশঃ রাজপুত্র অপেক্ষা সুখ্যাতিভাজন; ইহাতে রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যার উপর মনে মনে একটু মৎসরী।

একদিন উদ্যানের একটী ফুলগাছে এক অপূর্ব্ব ফুল ফুটিয়াছে। এরূপ ফুল পূর্ব্বে কেহ এ উদ্যানে দেখে নাই। রাজপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা নিত্য নিত্য উদ্যান ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের চক্ষেও এ ফুল কখন পড়ে নাই। ফুলটীর যেমন মিষ্ট সৌরভ, উহা দেখিতেও সেইরূপ সুন্দর।

একদা রাজপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা উভয়েরই দৃষ্টি যুগপৎ সেই ফুলটীর উপর পড়িল। রাজপুত্র দেখিবা মাত্র ত্বরাত্বরি ফুলটী আনিতে গেলেন! মন্ত্রিকন্যার সহচরী দূর হইতে রাজপুত্রকে বলিল,—রাজপুত্র! আমার সখী পূর্ব্বেই ঐ ফুলটী দেখিয়া উহা লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; অতএব আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া যাউন।

রাজপুত্রের বয়স তখন বার বৎসর মাত্র; সুতরাং বাল্যস্বভাব তখনও তাঁহার ঘুচে নাই। তিনি উদ্ধতভাবে উত্তর করিলেন,—কে তোমার সখী, কাহার জন্য আমি ফুল রাখিয়া যাইব? সহচরী কহিল,—রাজপুত্র! আপনাদের মন্ত্রিকন্যাই আমাদের সখী। ঐ তিনি ওখানে বসিয়া আছেন।

রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যার নাম শুনিয়া একটু ঘৃণার সহিত বলিলেন,—

সখীই হউন, আর যিনিই হউন; আমার উদ্যানের ফুল আমি দিব না।

সহচরী রাজপুত্রের এই উত্তর শুনিয়া অদূরস্থিতা মন্ত্রিকন্যার নিকট গিয়া কহিল। মন্ত্রিকন্যা তৎশ্রবণে সহচরীকে কহিলেন,—সহচরি! তুই রাজপুত্রকে বল্ গিয়া যে, রাজপুত্র! আমার সখীর সহিত তোমার যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে তখনও কি তুমি তাঁহাকে ফুল দিবে না।

সখী রাজপুত্রকে আসিয়া সে কথা কহিল। রাজপুত্র বিরক্তির সহিত বলিলেন,—আমি তোমার সখীকে বিবাহ করিব না; আর ভবিতব্যতার ফলে যদিও তাহাকে বিবাহ করিতে হয়, তবে যে দিন বিবাহ হইবে, সেইদিন রাত্রেই আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইব।

মন্ত্রিকন্যা নিকটেই ছিলেন। তিনি রাজপুত্রের গর্ব্বোক্তি শুনিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিলেন; বলিলেন,—তুমি যদি আমায় বিবাহ করিলে বিবাহের রাত্রেই ফেলিয়া যাও, তাহা হইলে আমিও তোমাকে তোমার পুত্র দ্বারা দেশান্তর হইতে বন্দী করিয়া আনিব।

রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যার এই অসংলগ্ন কথার আর উত্তর দিলেন না; তিনি উদ্যান হইতে চলিয়া আসিলেন। এ দিকে মন্ত্রিকন্যাও সহচরী সঙ্গে নিজালয়ে গমন করিলেন।

ক্রমে রাজপুত্র ও মন্ত্রিকন্যা উভয়েরই বয়স হইল। রাজা পুত্রের বিবাহের জন্য উৎসুক হইলেন। মন্ত্রীও কন্যার বিবাহার্থ সৎপাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কন্যা পিতার বরান্বেষণে ব্যগ্রতা দেখিয়া ভাবিলেন, লজ্জা করিয়া আর কি করিব? পিতার নিকট আমার মনের সঙ্কল্প খুলিয়া বলাই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া কন্যা একদিন একান্তে পিতাকে

বলিলেন,—পিতঃ! রাজপুত্র আমার পাণি গ্রহণ করেন, ইহাই আমার চিরপোষিত ইচ্ছা; সে ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণ হয়, আপনি অন্য চেষ্টা না করিয়া তাহারই জন্য সচেষ্ট হউন। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে রাজপুত্র আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না। কিন্তু রাজপুত্র আমায় বিবাহ না করিলে আমিও অন্য কাহাকে আত্মসমর্পণ করিব না।

কন্যার কথা শুনিয়া মন্ত্রী কহিলেন,—মা, বড় কঠিন পণ করিয়াছ। রাজপুত্রের অসম্মতিতে এ বিবাহ কিরূপে হইবে, বুঝিতেছি না। যাহা হউক চেষ্টা আমি অবশ্যই করিব। এই বলিয়া মন্ত্রী মনে মনে ভাবিলেন,—আমার একটী মাত্র কন্যা; আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও যদি কন্যার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, তবে তাহাও আমি করিব।

এদিকে রাজাও পুত্রের বিবাহার্থ পাত্রী অন্বেষণ করাইতে লাগিলেন। মন্ত্রীরও কন্যা বিবাহ; সুতরাং মন্ত্রী একটু বিশেষ বিব্রত ও চিন্তিত! একদিন মন্ত্রীকে চিন্তিত দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—মন্ত্রিন্! তোমাকে আজ এত চিন্তিত দেখিতেছি কেন? মন্ত্রী বলিলেন,—মহারাজ! কন্যাটী বয়স্থা হইয়াছে; ইহাকে পাত্রসাৎ করিবার জন্যই আমি চিন্তিত হইয়াছি। কন্যাটী রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এর অনুরূপ বর মিলিতেছে না বলিয়াই আমি বিশেষ চিন্তিত।

রাজা বলিলেন,—অনুসন্ধানে সুপাত্র অবশ্যই মিলিবে। সে জন্য চিন্তা কি? আচ্ছা মন্ত্রী, বিবাহে কন্যা-জামাতাকে কিরূপ যৌতুক দিবার ব্যবস্থা করিয়াছ?

মন্ত্রী সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন,—কন্যা-জামাতাকে বিশেষ করিয়া আর কি দিব? আমার যথাসর্ব্বস্বই কন্যা জামাতার। আমার যখন সন্তান-

সন্ততি আর নাই, তখন যা কিছু আছে, সকলই কন্যা জামাতাকেই দিয়া যাইব।

রাজা। তবু কি দিবে স্থির করিয়াছ?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমারা পিতামহ ক্রমে তিন পুরুষ আপনার সরকারে মন্ত্রিত্ব করিতেছি। এই তিন পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থ যা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহার এক চতুর্থাংশ রাখিয়া আর সকলই আমি জামাতাকে অর্পণ করিব, আর অন্য যে কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে, সে সকলই আমার কন্যার হইবে। আমি অপুত্রক: কন্যাই আমার সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারিণী।

রাজা। জামাতাকে দেয় নগদ অর্থের পরিমাণ কত?

মন্ত্রী। সংখ্যা ঠিক বলিতে পারি না; অনুমান প্রায় দুই কোটী স্বর্ণ মুদ্রা।

রাজা বলিলেন,—দানের অভিপ্রায় ভালই করিয়াছ, অনুসন্ধান করিতে থাক, সৎপাত্র অমিল হইবে না।

এই সকল কথার পর মন্ত্রী সে-দিনকার মত রাজবাড়ী হইতে নিজ গৃহে আসিলেন। পরদিন রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—মন্ত্রী দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা জামাতাকে দিবে! এত অর্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় হয় তো কোন রাজপুত্রও মন্ত্রিকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। বিশেষতঃ মন্ত্রীর কন্যাটী বুদ্ধিমতী, বিদুষী এবং পরমা সুন্দরী। এত অর্থের সহিত এ কন্যা লইতে কে না চাহিবে? হয় তো আমার কোন শত্রুপক্ষীয় রাজার পুত্র আসিয়া অবশেষে আমারই কোষাগারের এই অর্থরাশি লইয়া যাইবে। মন্ত্রীর এই সকল অর্থই তো আমারই কোষাগারের।

অতএব আমিই কেন পুত্রকে বিবাহ দিয়া এই সকল ধনের অধিকারী হই না! এ প্রস্তাবে মন্ত্রীও হয় তো মহা খুসী হইবে।

রাজা এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে একজন অমাত্য আসিয়া রাজার নিকট করযোড়ে জানাইলেন, মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় বড়ই নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কন্যা নাকি পণ করিয়াছেন যে, আমাদের রাজপুত্র ব্যতীত আর কাহাকেও তিনি আত্মদান করিবেন না। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় মহারাজের নিকট এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী হইতেছেন না।

রাজা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ অমাত্যকে বলিলেন,—তুমি গিয়া মন্ত্রীকে নিশ্চিন্ত হইতে বল। আমার পুত্রের সহিতই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে। ইহাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

অমাত্য মন্ত্রীকে রাজার সম্মতি জানাইলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ পরম আহ্লাদিত হইয়া কন্যা-বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যথাকালে শুভদিনে রাজপুত্র ও মন্ত্রি-কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্র এই বিবাহে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু পিতা-মাতার সনির্ব্বন্ধ আদেশে অবশেষে সম্মত হইলেন। বিবাহ হইল বটে, কিন্তু রাজপুত্র বিবাহের রাত্রেই অদৃশ্য হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই একটা দ্রুতগামী অশ্ব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবাহ হইবার পর শেষ রাত্রে তিনি সেই অশ্বারোহণেই স্বরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তাঁহার এই পলায়নবার্ত্তা মন্ত্রিকন্যাও জানিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রত্যুষ হইতে না হইতেই খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজপুত্র কোথায় গেলেন, কি হইল, কেন এমন হইল, এই বলিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। রাজাদেশে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে বহুলোক বহু

পথে রাজপুত্রের অনুসন্ধানার্থ ছুটিল। রাজা ও মন্ত্রী উভয়েই ঘোষণা করিলেন—রাজপুত্রকে যে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপুত্রের অনুসন্ধানে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ফল কিছুই হইল না। তখন তাঁহারা স্ব স্ব অদৃষ্টের উপরই দোষারোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন।

এদিকে রাজপুত্র সেই বিবাহের রাত্রে সকলের অজ্ঞাতসারে একাকী অশ্বারোহণে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া নানা দেশ দেশান্তর অতিক্রম করিতে করিতে অন্য এক রাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই রাজার এক অমাত্যের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। অমাত্য তাঁহাকে সেখানকার রাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজা রাজপুত্রকে সুলক্ষণাক্রান্ত সুপুরুষ দর্শনে নিজ সভারই এক পারিষদ-রূপে রাখিলেন। কালে রাজপুত্র স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে ঐ রাজার নিকট বিশেষ মান্য গণ্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পলায়নের পর হইতে রাজপুত্র সেইখানেই আছেন। তিনি যে কোন রাজপুত্র, এ পরিচয় তিনি কাহাকেও দিলেন না।

ক্রমে তিন চারি বৎসর কাটিল। রাজপুত্রের আর কোনই সন্ধান নাই। একদিন অন্তঃপুরে অন্যের অগোচরে রাজার পুত্রবধূ—সেই মন্ত্রি-কন্যা লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বীয় শ্বশুর রাজার পদযুগল ধরিয়া কহিলেন,—বাবা, আমায় অভয় দিন, আমার একটী প্রস্তাব রক্ষা করুন। আমি নিজে স্বামীর সন্ধানে যাইব, আপনি আমায় অনুমোদন করুন।

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—মা, তুমি শুদ্ধান্তচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ; তুমি কিরূপে লোকলোচনের গোচরে দেশে বিদেশে ভ্রমণ

করিবে? এ অনুমতি আমি কেমন করিয়া দিব? পুত্রবধূ কহিলেন—বাবা! আমি লোকলোচনের গোচর হইব বটে, কিন্তু আমাকে রাজবধূ বলিয়া কেহই চিনিতে পারিবে না! আমি পুরুষবেশেই ভ্রমণ করিব এবং নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করিয়াই চলিব।

রাজা বলিলেন—মা, তোমার বুদ্ধি, বিদ্যা, পাতিব্রত্য ও মর্য্যাদা-জ্ঞানের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। তুমি যেমন ইচ্ছা করিয়াছ কর, তোমার সাহায্যের জন্য যদি কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহাও আমি পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত। পুত্র আমার, তোমার বুদ্ধিকৌশলে যদি ফিরিয়া আইসে, সে আমার মহা লাভ।

পুত্রবধূ রাজার আদেশে আহ্লাদিত হইলেন; বলিলেন, মহারাজ! তবে আমাকে দশটী তেজস্বী অশ্ব, অশ্বারোহণপটু নয়টী সহচরী, আর পাথেয়স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ অর্পণ করুন। ইহা ভিন্ন দশজন বিশ্বস্ত বলিষ্ঠ খোজা প্রহরী আমাদের সঙ্গে দিউন। আমি সহচরীগণ সহ রাত্রি সত্ত্বেই রাজপুরী পরিত্যাগ করিব; সুতরাং এ পুরীর কেহই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।

রাজা পুত্রবধূর কথা মত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিলেন। যথাকালে রাজবধূ সহচরীগণসহ অশ্বারোহণে পুরুষবেশে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। খোজা প্রহরীগণও অশ্বারোহণেই চলিল। রাজবধূ বা মন্ত্রিকন্যা সেই দলের প্রভুরূপে চলিলেন। খোজা ও সহচরীগণ তাঁহারই আদেশ মত গতিবিধি করিতে লাগিল।

মন্ত্রিকন্যা রাজপুত্রের অনুসন্ধানার্থ সদলে বহুদেশ পরিভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কোথাও রাজপুত্রের সন্ধান পাইলেন না। মন্ত্রিকন্যা যে দিন রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন, সেই দিনই দিবাবসানে এক নগর প্রান্তে বিশ্রাম

করিয়া অর্থবলে পাঁচ ছয়জন গুপ্তচর সংগ্রহ করেন। এই সকল গুপ্তচর মন্ত্রিকন্যার কাছে রাজপুত্রের আকার প্রকার ও বয়সাদির বিবরণ শুনিয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থ নানাদিকে ধাবিত হয়।

মন্ত্রিকন্যা গুপ্তচরদিগকে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রায় একমাস পরে তাহারা আসিয়া সেই স্থানে সম্মিলিত হইল। মন্ত্রিকন্যাও সদলে বহু দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন।

মন্ত্রিকন্যা আসিলে, গুপ্তচরেরা কে কোথায় অনুসন্ধান করিয়াছে, তাহার পরিচয় দিল। মন্ত্রিকন্যা তাহাদের কাছে রাজপুত্রের কোনই উদ্দেশ পাইলেন না। সর্ব্বশেষে অপর একজন গুপ্তচর যাহা বলিল, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। এই গুপ্তচর বলিল,—আমি নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে এক রাজার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। সেখানকার রাজসভায় এক সুন্দর যুবা পুরুষ আছেন। তাঁহাকে দেখিলে রাজপুত্র বলিয়াই বোধ হয়। সেখানকার রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। আপনি যেরূপ আকার প্রকার বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। আপনি যে নাসিকার উপর তিলচিহ্নের কথা কহিয়াছিলেন, নিপুণতার সহিত দেখিলাম, ইহার নাসিকায় তাহা সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

গুপ্তচর রাজপুত্রসম্বন্ধে এই সকল সংবাদ বলিয়া বিদায় হইল। মন্ত্রিকন্যা এই সংবাদে নির্ভর করিয়া সদলে সেই রাজার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দিব্য সুন্দর রাজধানী। রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বহু জনতায় পরিপূর্ণ। দিব্য দিব্য দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী। বহু বাড়ীর নীচে নীচে সুসজ্জিত বিপণি। রাজধানীর সংস্থান-সন্নিবেশ দর্শন করিয়া

মন্ত্রিকন্যা এবং তাঁহার সঙ্গিনীরা আনন্দিতা হইলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন,—সুন্দর সহর দেখিয়া আমাদের রাজকুমার এইখানেই নিশ্চয় অবস্থান করিতেছেন।

মন্ত্রিকন্যা নূতন সহরে প্রবেশ করিয়া একখানি সুন্দর বাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সহচরীগণ সঙ্গে সেই বাড়ীতে বাস করিয়া কিরূপে রাজপুত্রকে হস্তগত করিবেন, তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিন ধরিয়া পরামর্শ চলিল। শেষে স্থির হইল,—মন্ত্রিকন্যা এক নবাগত বিদুষী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। পরে অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ যাহা বলিতে হয় বলিবেন।

পরামর্শ মতই কাজ হইল। বিদুষী মন্ত্রিকন্যা রাজদর্শনের অনুমতি লইয়া রাজসভায় গমন করিলেন। রাজা পণ্ডিত জনকে বড়ই ভক্তি করিতেন। তাই বিদুষী মন্ত্রিকন্যা রাজসভায় যাইবা মাত্র রাজা সসম্ভ্রমে তাঁহার বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিলেন। মন্ত্রিকন্যা পণ্ডিতোচিত গাম্ভীর্য্য ও শিষ্টতার সহিত এক সুন্দর শ্লোকে রাজার প্রশস্তি কীর্ত্তন করিলেন। রাজা সেই রসভাবময় সুললিত শ্লোক শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীও এই এক শ্লোকেই বিদুষী মহিলার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। এইবার মন্ত্রিকন্যা রাজাকে সম্বোধন করিয়া সুমধুর সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার সভাস্থ সুধীজনের সহিত নানা শাস্ত্রের বিচার করিবার জন্যই আমি আসিয়াছি। আমি অর্থ চাহি না। আমার পণ এই যে, আমি যদি শাস্ত্র বিচারে পরাজিত হই, তবে বিজয়ীর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিব; আর যদি জয়লাভ করি, তবে পরাজিত ব্যক্তি আমার ভৃত্য হইয়া থাকিবে। মহারাজ! আমি গর্ব্ব করিতেছি না,

ভগবানের কৃপায় বিদ্যাবৈভবে এযাবৎ এইভাবে আমি নয়টী ভিন্ন ভিন্ন দেশের নয় জন ভিন্ন ভিন্ন রাজ-সভাপণ্ডিতকে ভৃত্য করিয়া আনিয়াছি। মহারাজের যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া আমার বাসভবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন,—এই নয় জন পণ্ডিত আমার ভৃত্যরূপে অবস্থান করিতেছেন কি না?

রাজা বলিলেন,—আপনার কথায় আমার অপ্রত্যয় নাই, আপনি অদ্য বিদায় হউন। আগামী কল্য আমার সভাস্থ কোন পণ্ডিতের সহিত আপনার বিচার হইবে। বিচারে জয়-পরাজয়ে আপনার কৃত পণই স্থির রহিবে।

রাজার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রিকন্যা সে দিনকার মত রাজসভা হইতে বিদায় লইলেন এবং আবাস-ভবনে ফিরিয়া আসিয়া সহচরীদিগের নিকট সকল কথা বলিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এ সময় রাজা এবং মন্ত্রিকন্যা উভয়েই স্ব স্ব আবাসে থাকিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। রাজার চিন্তা—কিরূপে রাজসভার গৌরব রক্ষা হইবে? মন্ত্রিকন্যার চিন্তা—কিরূপে রাজপুত্রই তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন?

মন্ত্রিকন্যা চিন্তিত হইয়া সহচরীদিগকে ডাকিলেন,—পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল—রাজ-দৈবজ্ঞকে অর্থ দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে, এবং সে যাহাতে রাজপুত্রকেই এ দিনের যোগ্য প্রতিপক্ষ বলিয়া গণনা করিয়া বলে, তাহাই করাইতে হইবে।

পরামর্শ হইবা মাত্র মন্ত্রিকন্যার কথায় একজন সহচরী পুরুষবেশে অশ্বারোহণে রাজ-দৈবজ্ঞের গৃহে গমন করিল এবং অর্থবলে তাহাকে বাধ্য করিয়া নিজেদের কার্য্যোদ্ধারের পথ করিয়া আসিল।

ওদিকে রাজভবনেও এক নৈশ পরামর্শ সভা বসিল। রাজা নিজ মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—একজন বিদেশিনী বিদুষী আসিয়া আমার সভাপণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া যাইবে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। অতএব যাহাতে সভার গৌরব রক্ষা হইতে পারে, পরামর্শ করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করুন। মন্ত্রী বলিলেন,—মহারাজ! জয়-পরাজয় দৈবাধীন, অতএব রাজ-দৈবজ্ঞকে সংবাদ দেওয়া হউক এবং তাহার নির্দ্দেশমতই বিচারার্থ পণ্ডিত নিযুক্ত করা যাউক। আমার বিবেচনায় এই উপায়েই শুভ ফল ফলিবে, রাজসভার গৌরব রক্ষা হইবে।

রাজা এবং অন্যান্য সকলে এই সিদ্ধান্তেই মত দিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। রাত্রি প্রভাতেই রাজা দৈবজ্ঞকে আনাইয়া যথাবৎ বৃত্তান্ত বলিলেন। দৈবজ্ঞ মন্ত্রিকন্যার অর্থে পূর্ব্বেই বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ গণনা করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! রাজসভার কোন পণ্ডিতই ইঁহার সহিত বিচারে জয়ী হইতে পারিবেন না। তবে একমাত্র উপায় আছে, আপনার আশ্রয়ে যে এক বিদেশী রাজপুত্রোপম সুন্দর যুবা পুরুষ আছেন, তাঁহাকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে, রাজসভার গৌরব রক্ষা হইবে। কেননা, বিচারে যে জাতীয় প্রশ্ন হইবে, তাহার উত্তর ঐ ব্যক্তিই উত্তম বলিতে পারিবেন। রাজা এ কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং নিজ সভার সভ্য সেই যুবা পুরুষকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলেন। যুবা প্রথমে নারীর সহিত বিচারে অসম্মত হইয়াছিলেন, শেষে রাজার একান্ত অনুরোধে রাজসভার গৌরব রক্ষার্থ সম্মত হইলেন।

যথাকালে পাত্র মিত্র, সুধী-সজ্জন সহ রাজা সভা করিয়া বসিলেন। বিদেশিনী বিদুষীকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনিও যথাকালে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন; প্রবেশ করিয়াই রাজপুত্রকে চিনিতে পারিলেন,—

চিনিয়াই অন্তরে আনন্দিত হইলেন। রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যাকে চিনিলেন না। কেন না, বাল্যকাল হইতেই মাৎসর্য্যবশে মন্ত্রিকন্যার দিকে তিনি ভাল করিয়া নজর দিতেন না। তাঁহার উপর একটা প্রবল প্রসক্তিও তাঁহার ছিল না। কাজেই মন্ত্রিকন্যাকে ভুলিতে তাঁহার একটুও সময় লাগে নাই। কিন্তু মন্ত্রিকন্যা বাল্য হইতেই রাজপুত্রের অনুরাগিণী; ধ্যানে জ্ঞানে সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতেন, রাজপুত্রের রূপ তিনি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই দেখিবামাত্রই রাজপুত্রকে মন্ত্রিকন্যা চিরপরিচিতের ন্যায় চিনিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই রাজার অভিপ্রায় মত বিচার আরম্ভ হইল। মন্ত্রিকন্যা রাজপুত্রের বিদ্যাবুদ্ধি জানিতেন; রাজপুত্র কোন্ বিষয়ে সুশিক্ষিত, তাহা তাঁহার বিলক্ষণই জানা ছিল। তিনি সেই অনুসারে যাহাতে সহজে উত্তর হইতে পারে, এমন কয়েকটী প্রশ্ন রাজপুত্রের নিকট করিলেন। সভাস্থ সকলেই রাজপুত্রের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। রাজপুত্র একে একে বিদেশিনীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সভায় আনন্দের স্রোত বহিল। বিদেশিনী পরাস্ত হইয়া রাজপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের অনুমতি চাহিলেন। রাজপুত্র এ প্রস্তাবে মৌনী হইয়া রহিলেন। শেষে রাজা এবং রাজসভাস্থ সকলেই আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে অনুমোদন করায় রাজপুত্রও অনুমতি দিলেন। বিদুষী মন্ত্রিকন্যা তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

অনন্তর রাজার অনুমোদন ক্রমে রাজপুত্র মন্ত্রিকন্যার আবাস-ভবনে গিয়া কিছুদিন বাস করিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইল। রাজপুত্রের সহবাসে মন্ত্রিকন্যা গর্ভধারণ করিলেন।

একদিন মন্ত্রিকন্যা রাজপুত্রকে বলিলেন,—রাজপুত্র! আমি তোমার

সংসর্গে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমাকে পিত্রালয়ে গিয়া বাস করাই উচিত। কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইতে পারিতেছি না। চল, তুমিও আমার সহিত গিয়া আমার পিত্রালয়ে বাস করিবে।

রাজপুত্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, কখন শ্বশুরালয়ে যাইবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিলেন না। তিনি বলিলেন—তুমি তোমার পিত্রালয়ে যাও, সময়ে আবার আমার সহিত মিলিত হইও। মন্ত্রিকন্যা বলিলেন,—তখন যদি তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান কর? রাজপুত্র বলিলেন,—এই লও, আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়;—এই আমার প্রণয়-পত্র। ইহা লইয়া তুমি সন্তুষ্ট থাক। কোন গূঢ় কারণে, আমি এ রাজবাড়ী ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তরে যাইতে ইচ্ছা করি না। তোমার সহিত একত্র বাসে এবং তোমার আকারে প্রকারে বুঝিয়াছি, তুমি অনুচ্চ বংশের কন্যা নহ, বা দারিদ্র্যের জ্বালাও তোমার সহনীয় নহে। তোমার পিতার জাতিকুল-পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার বিদ্যাবিজিত পত্নী, এই-টুকুই মাত্র যথেষ্ট।

এই সকল কথাবার্ত্তার পর মন্ত্রিকন্যা একদিন সহচরীগণসহ রাজপুত্রের নিকট বিদায় লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ সেখানকার রাজভবনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিকন্যা পুরুষবেশেই সহচরীগণ সহ অশ্বারোহণে স্বদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। পরে স্বীয় শ্বশুর রাজাকে সংবাদ দিয়া রাত্রিযোগে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা পুত্রবধূর প্রত্যাগমনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার আগমনে এবং তাঁহার মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। তিনি পরদিনই পুত্রকে আনিবার জন্য কতিপয় বিচক্ষণ লোক প্রেরণ করিলেন এবং সেই সকল লোকের

সঙ্গে রাজা স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। মন্ত্রিকন্যার নির্দ্দেশ মত ঐ সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই রাজ্যে গিয়া রাজপুত্রকে আনিবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন; কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই আসিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পিতার পত্রের উত্তরে জানাইলেন,—"পিতৃদেব! আপনার প্রতি আমার অশেষ ভক্তি জানিবেন। আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। আমি সময়ে শ্রীচরণ দর্শন করিব। এ স্থানে আমার কোনই কষ্ট নাই। আপনার অজ্ঞাতসারে আমি এখানে বিদ্যাবলে এক বিদেশিনী বিদুষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি। আপনার সম্মতি হইলে সময়ে তাহার সহিতই আসিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।"

রাজ-প্রেরিত বিচক্ষণ-গণ রাজার নিকট এই পত্র আনিয়া দিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া মনে মনে পুত্রবধূর বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া পুত্রকে দ্বিতীয় পত্রে জানাইলেন, তুমি তোমার নববিবাহিত পত্নী লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর। আমি তোমায় সাদরে গ্রহণ করিব। রাজপুত্র উত্তরে জানাইলেন,—পত্নী প্রসবার্থ পিত্রালয়ে গিয়াছেন, আসিলেই আপনার শ্রীচরণ দর্শনে যাইব।

রাজা পত্র পড়িয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিলেন, এবং মনে মনে পুত্রবধূরই বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজ্যের প্রজা সাধারণ সকলেই জানিল,—রাজপুত্র পত্নীর প্রতি বিরাগ বশতঃ বিবাহের রাত্রেই পলাইয়া গিয়া এক ভিন্ন রাজ্যে বাস করিতেছেন। রাজপুত্রবধূ—মন্ত্রিকন্যা নিজ বুদ্ধিবলে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সপ্রণয়ে বাস করিয়াছেন। রাজপুত্রের সহবাসে তাঁহার

গর্ভ হইয়াছে। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ধন্য রাজবধূ!—ধন্য তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি!

এদিকে মন্ত্রিকন্যা ভাবিলেন,—রাজপুত্র পিতার নিকট শেষ-পত্রে যাহা লিখিয়াছেন, সেরূপভাবে তিনি রাজপুরীতে ফিরিয়া আসিলে, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না। অতএব রাজপুত্রকে শীঘ্র শীঘ্র আনাইব না। দেখি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় কিনা?

কিছুদিন পরে রাজবধূ এক পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা পৌত্র-মুখ দর্শনে আনন্দিত হইলেন। এইবার রাজা পুত্রকে আনিবার জন্য পুত্র-বধূকে পুত্র সমীপে পাঠাইতে চাহিলেন। পুত্রবধূ এবার আর কিছুই গোপন রাখিলেন না। তিনি যে স্বামীকে পুত্র দ্বারা বন্দী করিয়া আনিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই গুপ্ত প্রতিজ্ঞা এবার রাজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রাজা শুনিয়া অন্তরে বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; বলিলেন,—মা, তোমার বুদ্ধি—অসাধারণ, বিদ্যা—অতুলনীয়! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাই কর।

পুত্রবধূ একথায় আনন্দিত হইলেন। এদিকে তাঁহার পুত্রও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। রাজার পৌত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সেই বিবিধ যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

রাজা পৌত্রের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিক্রম দেখিয়া বহু সৈন্য সহ তাহাকে দিগ্‌বিজয়ে প্রেরণ করিলেন। দিগ্‌বিজয়ে যাইবার সময় তাঁহার মাতা—সেই রাজ-পুত্রবধূ—মন্ত্রিকন্যা বলিয়া দিলেন, বৎস! তোমার পিতা অমুক রাজার রাজসভায় বাস করিতেছেন। তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াই দেশত্যাগী হইয়াছেন। আমার প্রতিজ্ঞা—তোমার দ্বারা তাঁহাকে

আমি বন্দী করিয়া আনিব, অতএব অগ্রে তুমি সেই রাজার রাজধানী ও রাজ্য-জয়েই যাত্রা কর। সেখানে গিয়া তোমার পিতাকে তোমার বন্দী করিয়া আনিতেই হইবে। এই বলিয়া মাতা পুত্রের নিকট স্বামীব প্রতিকৃতি দিলেন এবং মৌখিক সংবাদেও তাঁহার অনেক অভিজ্ঞানের কথা বলিলেন।

পুত্র মাতার আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। তিনি প্রভূত বল বাহন সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া অগ্রেই গিয়া সেই রাজার রাজধানী আক্রমণ করিলেন। ঘোর যুদ্ধ হইল। রাজপৌত্র যুদ্ধে জয়ী হইয়া অন্যান্য জয়লব্ধ সামগ্রীর সহিত রাজসভাস্থ স্বীয় পিতাকে বন্দী করিয়া আনিলেন। বৃদ্ধ রাজা বহুদিন পরে পুত্রদর্শনে আনন্দিত হইলেন। রাজ-পুত্রবধূ স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা রাজপুত্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তিনিই যে রাজপুত্রের বিদ্যা-বিজিত পত্নী—সেই মন্ত্রিকন্যা, একথা রাজপুত্রের নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন। রাজপুত্র বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া স্ত্রী-পুত্র সহ মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

শুকদেহে সত্যরাজ। ৭

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জঁাহাপনা! পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠানপুরে এক রাজা ছিলেন। তিনি সত্য কথা কহিতেন, সত্য বিচার করিতেন, সত্যবাদী ভৃত্য রাখিতেন, সত্য ধর্ম্মের সেবা করিতেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'সত্যরাজ' বলিয়া ডাকিত। মনে প্রাণে ব্যবহারে বাস্তবিকই তিনি সত্যরাজ ছিলেন।

সত্যরাজ বিচারে বসিলে অতি জটিল বিষয়েও সহজে সত্য নির্ণয় হইত। তাঁহার এমনই বিচারনৈপুণ্য ছিল, তাহাতে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই তুষ্ট হইত। তাঁহার নিজ রাজ্যে তো কথাই নাই; পররাজ্যেও তাঁহার সত্যনিষ্ঠার—সত্য বিচারের সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইয়াছিল। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'সত্যধর্ম্ম' বলিয়াই মনে করিত।

কিন্তু বিধির বিধান এমনই যে, এ হেন রাজাকেও সংসারে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বাদসাহ জিজ্ঞাসিলেন,—পণ্ডিতজী! এমন রাজা বিড়ম্বনা ভোগ করিলেন কেন? আর কিরূপ বিড়ম্বনাই বা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল?

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! সত্যরাজ সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে বাস করিতেন; সুধী সজ্জন লইয়াই থাকিতেন। কিন্তু সময় গুণে অসৎসঙ্গে পড়িয়া তাঁহারও দুঃখভোগ হইয়াছিল।

একদা রাজ-নাপিতের প্রতিনিধি হইয়া এক সুন্দরমূর্ত্তি নাপিত রাজাকে কামাইতে আসিল। রাজা নাপিতের আকৃতি দেখিয়াই তাহার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। নাপিতকে তিনি নিজ প্রাসাদেই রাখিয়া দিলেন। শেষে এমন হইল, ঐ নাপিত যাহা বলিত, যাহা করিত, তাহাই তাঁহার নিকট সত্য ও প্রিয় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সত্যরাজ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত নাপিত আদর পাইয়া রাজার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। নাপিত আর ক্ষৌর কার্য্য করিত না; সে শেষে সত্যরাজের প্রধান পার্শ্বচর হইয়া বসিল। সত্যরাজ অল্প বয়সেই পৈতৃক সিংহাসন পাইয়াছিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি পত্নী সংগ্রহ করেন।

সত্যরাজের রাজধানী হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দূরে এক দরিদ্র গৃহস্থ বাস করিত। এই গৃহস্থের একটী সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা ছিল। কন্যাটী রূপে লক্ষ্মী—গুণে সাক্ষাৎ সরস্বতী। সত্যরাজ লোকমুখে কন্যার রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। অমাত্যবর্গ রাজার আগ্রহ দেখিয়া সকলেই এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কেহই কোন আপত্তি করিলেন না।

যথাকালে কন্যার পিতাকে রাজ-দরবারের অভিপ্রায় জানান হইল। দরিদ্র কন্যাকর্ত্তা এ সংবাদে আনন্দিত হইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব এমন কি বসত বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া জামাতার সৎকারার্থ প্রস্তুত হইলেন।

সত্যরাজ এই সংবাদ পাইয়া লোক দ্বারা কন্যার পিতাকে জানাইলেন,—আমি রাজা বলিয়া আমার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আপনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি এ সংবাদে সুখী হইতে পারিলাম না। আপনার যেমন অবস্থা, সেই অনুসারেই আপনি

বিবাহের আয়োজন করিবেন; তাহাতেই আমার সন্তোষ হইবে। আমিও রাজার ন্যায় আড়ম্বরের সহিত আপনার গৃহে যাইব না; মাত্র একজন সহচর আমার সঙ্গে যাইবে। সুতরাং অত্যধিক ব্যয়ভূষণের আপনার কোনই প্রয়োজন নাই।

কন্যার পিতা এই সংবাদ পাইয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সত্য-রাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে কন্যা-বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

এদিকে সত্যরাজ একদিন তাঁহার প্রিয় পারিষদ নাপিতকে লইয়া নিজ বিবাহসম্বন্ধে একান্তে অনেক আলাপ করিলেন। স্থির হইল,—সত্যরাজ যাইবেন, আর তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয় বয়স্য নাপিত যাইবে। তদ্ভিন্ন রাজবাটী হইতে আর কেহই কন্যা-গৃহে যাইবেন না। অধিক লোক জন গেলে দরিদ্র কন্যা-কর্ত্তা পাছে বিব্রত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কাতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে সত্যরাজ অশ্বারোহণে প্রিয় বয়স্য নাপিতের সহিত ভাবী শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাপক্ষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের উভয়কে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যথাকলে বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

পরদিন রাজার আদেশে একখানি সুসজ্জিত শিবিকা আনীত হইল। রাজপত্নী তাহাতে আরোহণ করিলেন। সত্যরাজ শ্বশুরের অনুমতি লইয়া নিজ রাজধানীতে যাত্রা করিলেন। তিনি এবং বয়স্য নাপিত পূর্ব্ববৎ অশ্বারোহণে চলিলেন। চারিজন বাহক শিবিকা লইয়া চলিল।

বৈশাখ মাস। দিনকর প্রখর কর বিকিরণ করিয়া ক্রমে মধ্য-গগনে অভ্যুদিত। দারুণ আতপতাপে রাজা, রাজপত্নী এবং রাজসহচর নাপিত

সকলেই পিপাসাকুল হইয়া পড়িলেন। শিবিকা-বাহকেরা ক্ষুধিত ও পিপাসাক্রান্ত হইয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় শিবিকা রাখিল এবং নাতিদূরবর্ত্তী কোন দোকান হইতে কিছু কিছু খাবার কিনিয়া খাইয়া আসিবে বলিয়া রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা অনুমতি দিলেন। বাহকগণ সেই দোকানাভিমুখে গমন করিল।

এদিকে রাজসহচর নাপিত কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজাকে বলিল,—মহারাজ! আমার অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছে; বোধ হয় আপনি এবং রাজরাণীও পিপাসাকুল হইয়াছেন। নিকটে লোকালয় নাই। কোন জলাশয়ও দেখি না, বাহকেরাও শীঘ্র ফিরিবে বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে কি করি, বলুন দেখি!

সত্যরাজ বলিলেন,—বয়স্য! পিপাসায় সকলেরই প্রাণ অস্থির হইয়াছে। নিকটে জল পাইবার উপায় কিছুই দেখি না; তবে একমাত্র ভরসা এই যে, ঐ অদূরেই একটী ফলপূর্ণ নারিকেল বৃক্ষ আছে। বাহকেরা আসিলে তাহাদের দ্বারা যদি উহা হইতে কয়েকটা ডাব পাড়াইয়া লওয়া যায়, তা'হলে একরূপ পিপাসা শান্তি করা যাইতে পারে; নতুবা আর তো উপায় দেখি না।

নাপিত। বাহকেরা আসিতে বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে প্রাণ যে ওষ্ঠাগত। মহারাজ, আপনি নিজেই ইহার প্রতিবিধান করুন।

সত্যরাজ। আমি কি করিব, আমার এখানে সাধ্য কি?

নাপিত। কেন মহারাজ, আমি জানি আপনি তো পর-কায় প্রবেশের মন্ত্র জানেন। সেই মন্ত্রবলেই এক্ষণে কার্য্যোদ্ধার করুন।

সত্যরাজ। বয়স্য, ভালই মনে করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে কাহার কায়ে প্রবেশ করিয়া কিরূপে কার্য্যোদ্ধার করি?

নাপিত। মহারাজ! এখানে তো আর কাহারও শবদেহ দেখি না, তবে ঐ অদূরে একটা মৃত শুকদেহ দেখা যাইতেছে; আপনি নিজদেহ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রবলে ঐ শুক দেহেই প্রবেশ করুন। আপনি শুক হইয়া চঞ্চু দ্বারা বৃক্ষ হইতে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ফল পাড়িতে পারিবেন।

সত্যরাজ বলিলেন—তাহাই হউক।

এই বলিয়া তিনি মন্ত্রবলে নিজ কায় পরিত্যাগ করিয়া সেই মৃত শুকের কায়ে প্রবেশ করিলেন।

সত্যরাজ পরকায়ে প্রবেশ করিতে পারিতেন, নাপিত তাহা জানিত। কিন্তু নাপিত যে পর-কায়ে প্রবেশ করিতে পারিত, সত্যরাজ তাহা জানিতেন না। নাপিত গোপনে সত্যরাজের পর-কায়প্রবেশের মন্ত্র শিখিয়া লইয়াছিল, সত্যরাজ এ যাবৎ তাহা জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে সত্যরাজ যেইমাত্র মন্ত্রবলে স্বদেহ রাখিয়া শুকদেহে প্রবেশ করিলেন এবং উড়িয়া গিয়া চঞ্চু দ্বারা কতিপয় ফল বৃক্ষ হইতে ফেলিলেন, অমনি ধূর্ত্ত নাপিত মন্ত্রবলে নিজ দেহ ছাড়িয়া রাজার দেহে প্রবেশ করিল। শুকমূর্ত্তি-ধারী রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দুই এক ফোঁটা জলও ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। নব পরিণীতা রাজপত্নী আদ্যোপান্ত সকল কথাই শুনিয়াছিলেন এবং সকল ঘটনাই দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এ ব্যাপারে তাঁহার অন্তরে দারুণ দুঃখ হইল। একটা নাপিত-জাতীয় পরপুরুষ রাজদেহে প্রবেশ করিয়া রাজা হইয়া বসিল, সে তাঁহার স্বামী হইবে, ইহা তাঁহার একান্তই অসহ্য হইল। তিনি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না।

এদিকে নাপিত রাজদেহে প্রবেশ করিয়া রাজা হইল এবং নিজের

পরিত্যক্ত দেহটা নিকটস্থ কোন জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিল। এ সময় বাহকেরাও জলযোগ করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা রাজসহচরকে না দেখিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে চাহিল। রাজমূর্ত্তি নাপিত তাহাদিগকে বলিল,—আমার সহচরকে আমি বিশেষ কারণে অগ্রেই পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। তোমরা চল।

এই বলিয়া নাপিত-রাজ রাজধানী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। বাহকেরা শিবিকা স্কন্ধে লইল। নাপিত রাজা যাইবার পূর্ব্বে রাণীকে জলযোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। রাণী বলিলেন,—আমি একটা ব্রতের সঙ্কল্প পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছি, সে জন্য ব্রত সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাকে বিশেষ সংযমের সহিতই থাকিতে হইবে। সুতরাং আমি আর এরূপভাবে জলযোগ করিব না।

নাপিত-রাজা রাণীর কথার পর আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। শিবিকা রাজধানীর দিকে চলিল। যথাকালে নাপিত-রাজা রাণীর সহিত রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সত্যরাজ পত্নীসহ রাজধানীতে আসিয়াছেন, শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। রাজার দেহ-পরিবর্ত্তনের বিষয় তাহারা কিছুই জানিল না; নাপিত-রাজাকেই তাহারা 'সত্যরাজ' বলিয়া মনে করিল।

নাপিত-রাজের পক্ষ হইতে রাষ্ট্র করা হইল,—রাজসহচর নাপিত বিবাগী হইয়া তীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন।

এদিকে নবাগতা রাণী সকল ঘটনাই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কোন কথাই কাহারও কাছে কহিলেন না। তিনি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দুই তিনটী পরিচারিকা সহ শুদ্ধভাবে ব্রতরক্ষার্থ একান্তে পৃথক আবাসে

থাকিবার অনুমতি চাহিলেন। নাপিত-রাজা তাহাতে আপত্তি করিলেন না; ভাবিলেন,—ধর্ম্মকার্য্যে বাধা দিলে লোকে আমায় সত্যরাজ বলিয়া মনে করিবে না। বিশেষতঃ সত্যরাজ যে শুকদেহে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই শুক এখনও জীবিত আছে। তাহার প্রাণসংহার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে সত্যরাজের ন্যায় ধার্ম্মিক ও সত্যনিষ্ঠ হইয়াই থাকিতে হইবে। ক্রমে শুকবংশ ধ্বংস করিয়া আমার নিজ প্রকৃতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিব।

নাপিত-রাজ যাহা ভাবিল, কার্য্যেও তাহাই পরিণত হইল। নাপিত রাজা পরদিনই রাজ্যের সর্ব্বত্র হুকুম প্রচার করিল,—আমার রাজ্যের যেখানে যত শুক পক্ষী আছে, সমস্তই মারিয়া ফেলিতে হইবে। যাহারা মারিতে পারিবে, তাহাদের সকলকেই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

লোকে সত্যরাজের এই নৃশংস আদেশ শুনিয়া ভাবিল,—একি হইল! সত্যরাজের মুখ হইতে এরূপ নির্দ্দয় আদেশ বাহির হইল কেন? সহসা সত্যরাজের এরূপ মতি বিপর্য্যয় ঘটিবার কারণ কি হইল?

এদিকে রাণী রাজার অনুমোদনে ভিন্ন ভবনে বাস করিতেছিলেন। রাজার ঐরূপ আদেশ শুনিয়া তাঁহার অন্তর হাহাকার করিতে লাগিল। তিনি ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—এইবার বুঝি আমার শেষ আশাটুকুও নির্ম্মূল হইল। হা ভগবন্! আশা করিয়াছিলাম, বুদ্ধিমান্ সত্যরাজ শুকরূপে থাকিলে একদিন না একদিন তাঁহার সে দেহের তিনি পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবেন; কিন্তু এখন যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর কাহার ভরসায় থাকি? ক্রূরপ্রকৃতি নাপিতরাজ নিশ্চয়ই শুককুল নির্ম্মূল করিবে; তাহাতে আমার সেই পরমারাধ্য পতি সত্যরাজ যে শুকদেহে প্রবেশ করিয়াছেন, সে শুকেরও হয় তো বিপদ ঘটিবে।

রাণী এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে এক পরিচারিকা আসিয়া কহিল,—রাণী মা, আমি রাজবাড়ী গিয়াছিলাম; সেখানে বড় এক আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম!—এখান হইতে উত্তরে যে এক রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের রাজসভায় একটী শুকপক্ষী আনীত হইয়াছে। সেখানকার রাজা কোন জটিল বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সেই শুকপক্ষীর উপরই বিচার ভার অর্পণ করেন। রাজা তাহাকে বড়ই ভাল বাসেন। সকল প্রকার জটিল ব্যাপারেই তাহার মন্ত্রণা গ্রহণ করেন। সে রাজ্যে যেন শুকপক্ষীই প্রকৃত রাজা হইয়া আছে। আমাদের রাজা এই সংবাদ পাইয়া সেই শুক পক্ষীটিকে আনিবার জন্য নানা মূল্যবান্ উপহার সহ সে দেশের রাজার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু সে লোক রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে দেশের রাজা আমাদের রাজাকে শুকপক্ষী অর্পণ করিতে চাহেন নাই।

পরিচারিকার মুখে এ সংবাদ পাইয়া রাণী আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন,—যদি পরিচারিকার কথা সত্য হয়, তাহ'লে সত্যরাজ নিশ্চয়ই নিরাপদ স্থানে আছেন। তাঁহার শুভাশুভের জন্য আর ভাবিবার আবশ্যক নাই। এখন তাঁহাকে আনাইয়া কিরূপে অভীষ্ট সাধন করা যায়, তাহারই উপায় দেখিতে হইবে। তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন ঈশ্বর করিলে আমার আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

এদিকে নাপিত-রাজার আদেশে বহু শুক বিনষ্ট হইল। নাপিত-রাজ ভাবিয়াছিল,—শুকবংশ বিনাশ করিতে পারিলেই শুকদেহস্থ সত্যরাজের বিনাশ হইবে। তাহা হইলে আমি নিষ্কণ্টকে বিনা আশঙ্কায় রাজ্য করিতে পারিব। কিন্তু যখন নাপিত-রাজের কর্ণগোচর হইল যে, ভিন্ন রাজ্যের রাজসভায় এক শুক পক্ষী আনীত হইয়াছে। সেই পক্ষীর

সাহায্যেই তদ্দেশীয় রাজা নানা জটিল বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তখন নাপিতরাজ সেই শুক পক্ষীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিল। যখন সে চেষ্টা বিফল হইল, তখন ভাবিল,—বুদ্ধিমান্ সত্যরাজ যখন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাইয়াছেন, তখন বুদ্ধিবলে এক দিন না একদিন আবার নিজ দেহ ধরিয়া সত্যরাজরূপে এই রাজ্যেরই রাজা হইবেন। একথা নিশ্চিতই। যা হউক, আমি সতর্কতার সহিত যত দিন পারি, মনের সাধে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া লই।

নাপিত-রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঘোর যথেচ্ছচারের সহিত রাজ্য করিতে লাগিল। রাজ্যের প্রজা সাধারণ রাজার ব্যবহারে বিস্মিত ও বিরক্ত হইল। তাহাদের ধারণা জন্মিল,—নিশ্চয়ই সত্যরাজের মতিভ্রম হইয়াছে; নতুবা এমন ভাবে রাজকার্য্য তো তিনি পূর্ব্বে কখনই করেন নাই। হায় হায়! আমাদের এমন রাজা এরূপ হইলেন কেন?

এই ভাবে রাজ্যের সকল লোকই রাজার জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। একদিন কতিপয় বিচারার্থী রাজসভায় উপস্থিত হইল। তাহারা ভিন্ন রাজ্যের লোক। সত্যরাজের বিচারনৈপুণ্যের কথা তাহাদের বিশেষরূপেই শুনা ছিল। তাই তাহারা নিজের দেশের রাজার নিকট বিচারার্থী না হইয়া ভিন্ন রাজ্যের রাজা সত্যরাজের বিচারভবনে উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়া রাজসভায় করযোড়ে কহিল,—মহারাজ! আমরা ভিন্ন রাজ্যের প্রজা; তথাচ আপনার নিকটই আমরা আমাদের মনোমত সুবিচার প্রাপ্ত হইবার আশায় এ রাজ্যের বিচারালয়ে আসিয়াছি। আপনি সত্যরাজ, সত্য বিচার করিবেন; সকলেই আমরা আনন্দের সহিত আপনার জয়গান করিতে করিতে স্বদেশে প্রস্থান করিব।

রাজা কহিলেন,—তোমাদের অভিযোগ কি বল। বিচারপ্রার্থীরা

কহিল,—মহারাজ! আমরা তিন বন্ধু একত্র হইয়া নানা মণিরত্নাদির ব্যবসায় করিতাম। আজ কিছুদিন হইতে আমাদের একটী বহুমূল্য মণি অপহৃত হইয়াছে। যে স্থান হইতে মণি চুরি গিয়াছে, সেখানে আমরা মাত্র এই তিন বন্ধুই ছিলাম। তথায় অন্য কোন লোকের প্রবেশের অধিকার বা সম্ভাবনাও ছিল না। অতএব আমাদের প্রার্থনা,—বিচারটী এমন ভাবে করিবেন, যেন আমাদের অপহৃত দ্রব্য আমরা পাই এবং আমাদের কেহ যেন অপ্রতিভও না হয়।

নাপিতরাজা অভিযোগের বিবরণ শুনিয়াই চটিয়া গেলেন; বলিলেন,—দূর হ' বেটারা, এমন বিচার আমি করিতে পারিব না। তোদের মণি-হারাণোর কথা মিথ্যা। তোরা মিছামিছি আমার সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছিস্!

বিচারার্থীরা কহিল,—মহারাজ! সত্যই আমাদের মণি হারাইয়াছে। আপনি সত্যরাজ, বিচার করিয়া আমাদের নষ্ট দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিউন।

নাপিতরাজা বলিলেন,—তোরা ফের আমায় বিরক্ত করিস্ না, তোদের এ মনগড়া বিচার এখানে হইবে না। তোরা তিনজন বৈ ছিলি না; তোদের মণি হারাইল! বিচার করিয়া সেই মণি বাহির করিতে হইবে; অথচ তোদের কাহারও মনে কষ্ট হইবে না। এমন বিচার আমার দ্বারা হইবে না।

বিচারার্থীরা আবার কি বলিতে যাইতেছিল। নাপিতরাজ বাধা দিয়া কহিলেন,—তোদের কোন কথাই শুনিব না। তোরা এখনই এস্থান হইতে চলিয়া যা'।

রাজার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া বিচারার্থীরা তো বটেই, রাজার

সভাসদেরাও অবাক্ হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—সত্য সত্যই সত্যরাজের মতিভ্রম হইয়াছে; নতুবা এরূপ ব্যবহার তো পূর্ব্বে কখনই দেখি নাই! বিচার্য্য বিষয় যতই জটিল হউক, সত্যরাজ অতি আগ্রহের সহিত তাহার বিচার করিয়াছেন। কিন্তু এখন এ কি হইতে চলিল!

সভাসদেরা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। বিদেশী বিচারার্থীরাও দুঃখিতমনে রাজসভা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

এদিকে রাণীর কাণে এই সংবাদ পৌছিল। রাণী এক পরিচারিকা দ্বারা ঐ বিচারার্থীদিগের একজনকে গোপনে স্বীয় পৃথক্ ভবনে ডাকাইয়া আনিলেন এবং পরিচারিকার সাহায্যে তাহাকে বলিলেন,—দেখ, তোমরা বিদেশ হইতে বিচারার্থ আসিয়াছ; কিন্তু যাহাকে তোমরা সত্যরাজ মনে করিয়াছ; তিনি বাস্তবিক সত্যরাজ নহেন। সত্যরাজ এই রাজ্যের উত্তর দিক্‌স্থিত রাজ্যের রাজসভায় শুকদেহে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শুকরূপেই সেখানকার সমস্ত বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; তোমরা যদি সুবিচার চাও, সেই স্থানে যাও। আমি তোমাদের হস্তে একখানি পত্র দিতেছি। তোমরা সেই শুকের হস্তে ইহা অর্পণ করিও। শুক তোমাদের সুবিচার করিয়া দিবেন। পরন্তু তিনি যদি আসিতে চাহেন তবে তোমরা একটু যত্নের সহিত তাহাকে আনিয়া আমার নিকট প্রদান করিও।

বিচারার্থীরা এ সংবাদে আহ্লাদিত হইয়া রাণীর নিকট পত্র চাহিল। রাণী তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিয়া পরিচারিকার হাত দিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন।

বিচারার্থীরা পত্র লইয়া সত্যরাজের উদ্দেশে ভিন্ন রাজ্যে রওনা হইল। কয়দ্দিন পরেই তাহারা সেই রাজ্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নিজেদের

অভিযোগ উত্থাপন করিল। সে রাজ্যের রাজা আগন্তুকদিগের অভিযোগ শুনিয়া বলিলেন,—আমার সভায় এক বিজ্ঞ শুক পক্ষী আছেন, তোমাদের এ জটিল অভিযোগের মীমাংসা তিনিই করিয়া দিবেন। তাঁহার বিচারসভা ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আছে, তোমরা সেইখানে গিয়া তোমাদের অভিযোগ বর্ণন কর।

রাজাদেশে বিচারার্থীরা শুকের বিচার-প্রকোষ্ঠে নীত হইল। সেখানে গিয়া তাহারা দেখিল,—শুক এক বহুমূল্য উচ্চাসনে বসিয়া আছেন। বহু অর্থী প্রত্যর্থী সুবিচারার্থ তাঁহার বিচারসভায় অবস্থান করিতেছে।

আগন্তুক বিচারার্থীরা শুকের নিকট উপস্থিত হইয়াই রাণীর প্রদত্ত পত্রখানি তাঁহার সমক্ষে ধরিলেন। শুক দক্ষিণ চরণ উত্তোলন করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন; পরে পত্র পড়িয়া সকল বিষয় অবগত হইলেন। রাণী পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"হৃদয়দেব! আপনি শুকদেহে রহিয়াছেন। এ কষ্ট আমার একান্তই অসহ্য। তথাচ আপনি যে আশ্রয় পাইয়াছেন, ইহাই আমার সান্ত্বনা। যে দুর্বৃত্ত আপনার ঐ দশা ঘটাইয়াছে, তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আমি এক সম্বৎসর-ব্রত অবলম্বন করিয়া পৃথক্ ভবনে বাস করিতেছি। সম্বৎসর অতীত হইতে আর অল্প দিনই অবশিষ্ট আছে। অতএব আপনি যদি কৌশলে এই বিচারার্থীদিগের সহিত গোপনে আমার ভবনে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার শুকদেহ মোচনের একটা উপায় করিতে পারি। এই বিচারার্থীরা আপনাকেই উদ্দেশ করিয়া বিচারার্থ এই স্থানে আসিয়াছিল; কিন্তু বিতাড়িত হইয়া আমার নির্দ্দেশমত আপনার উদ্দেশে গমন করিল। আপনি বুদ্ধিমান্, বিবেচনাপূর্ব্বক যাহা ভাল হয়, করিবেন।"

পত্রপাঠের পর শুক নবাগত বিচারার্থীদিগের অভিযোগ-বিবরণ শুনিয়া কিছুকাল মৌনী হইয়া রহিলেন, পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হঁ তোমাদের মনোমত বিচার আমি করিব; তবে বিচারসময় তোমাদের তিন জনকে তিনটী পৃথক্ গৃহে থাকিতে হইবে।

তাহাই হইল। বিচারার্থী বণিক্‌ত্রয় তিনটী পৃথক্ ঘরে রক্ষিত হইল। পরদিন শুক বিচারে বসিলেন। প্রথমে একজন বিচারার্থীকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইল। সে আসিবা মাত্র শুক তাহাকে বলিলেন,—তোমাদের বিচার পরে করা হইবে; অগ্রে আমার একটী গল্প শুন। গল্পটি এই;—

"এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার একটী মাত্র কন্যা; রাজ কন্যাটীকে বড় ভাল বাসিতেন। কন্যাটীর লেখা পড়া শিক্ষার সময় হইল। রাজা তাহাকে বিদ্যালয়ে দিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক লেখাপড়া করিত। রাজকন্যার অল্প বয়স, ব্রাহ্মণ বালকও অল্পবয়স্ক, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে খুব ভালবাসা জন্মিল। ব্রাহ্মণ-বালক রাজকন্যাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না; রাজকন্যাও ব্রাহ্মণবালককে না দেখিলে অস্থির হইতেন।

ক্রমে উভয়েরই বয়স বাড়িল; পরস্পরের স্নেহ মমতাও বৃদ্ধি পাইল। একদিন ব্রাহ্মণ-বালক কথায় কথায় বলিলেন,—রাজকন্যা! এখন তুমি আমায় যেরূপ ভালবাস, বিবাহের পরও কি আমায় সেইরূপ ভালবাসিতে পারিবে? রাজকন্যা কহিলেন,—নিশ্চয়ই পারিব। ব্রাহ্মণবালক বলিলেন,—যদি তুমি বিবাহের রাত্রে তোমার সেই বহুমূল্য বসন ভূষণসহ আমার সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে পার, তবেই বুঝিব—আমার প্রতি তোমার ভালবাসা নিশ্চল আছে। রাজকন্যা কহিলেন,—আমি বিবাহের রাত্রে নিশ্চয়ই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

"কালক্রমে রাজকন্যার বিবাহ হইল। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজকন্যা বিবাহের শেষ রাত্রে একাকী ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে প্রথমে এক চোরের সহিত রাজকন্যার দেখা হইল। চোর রাজকন্যার বসন ভূষণ অপহরণের চেষ্টা করিল। রাজকন্যা কহিলেন,—চোর, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর. আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, এই দেশে আমি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আইসি, পরে আমার বসন ভূষণ গ্রহণ করিও। চোর রাজকন্যার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজকন্যা সেখান হইতে চলিলেন। কিছুদূর পরে এক দস্যুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দস্যু রাজকন্যাকে বধ করিতে চাহিলে, রাজকন্যা ঐ পূর্ব্ব কথাই কহিলেন। দস্যু রাজকন্যার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহার পর পথে এক ব্যাঘ্রের সহিত রাজকন্যার দেখা হইল। ব্যাঘ্র রাজকন্যাকে খাইতে চাহিলে, রাজকন্যা তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন। ব্যাঘ্র রাজকন্যার ফিরিয়া আসিবার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেইখানে হাঁ করিয়া রহিল। এখন হইতে রাজকন্যার সহিত আর কাহারও সাক্ষাৎ হইল না। রাজকন্যা বরাবর সেই ব্রাহ্মণপুত্রের কুটীরে গিয়া তাহাকে জাগাইলেন। ব্রাহ্মণপুত্র রাজকন্যাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—এ কি রাজকন্যা, অদ্য তোমার বিবাহরাত্রি, তুমি এ সময়ে এখানে কেন? যাও, শীঘ্র গৃহাভিমুখে প্রস্থান কর। রাজকন্যা কহিলেন—বন্ধু, বাল্যে তোমার নিকট আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই আমি আসিয়াছি। ব্রাহ্মণবালক বলিলেন,—আমার উপর তোমার স্নেহ মমতা—তোমার পরম সুখভোগের দিনেও স্থায়ী হইবে কি না, তাহারই পরীক্ষার জন্য আমি তোমায়

বিবাহের রাত্রে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলাম। তুমিও সাক্ষাৎ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে। এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি নিজবাসে ফিরিয়া যাও।

"রাজকন্যা বিদায় হইলেন। পথে আসিতে আসিতে এবার প্রথমে ব্যাঘ্রের সহিত দেখা হইল। রাজকন্যা কহিলেন,—ব্যাঘ্র, আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমায় ভক্ষণ কর। ব্যাঘ্র কহিল, তোমার সত্য রক্ষার অনুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি প্রস্থান কর, তোমায় আমি খাইব না। ব্যাঘ্র ছাড়িয়া দিল। রাজকন্যা আসিতে আসিতে পথে সেই দস্যুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দস্যুও রাজকন্যার সাধুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। রাজকন্যা এবার চোরের সমক্ষে আসিলেন এবং চোরকে তাঁহার অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে বলিলেন। চোর কিছুই লইল না। সে রাজকন্যার পদতলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। রাজকন্যা নিজাবাসে ফিরিয়া আসিলেন।"

শুক এই গল্পটী বলিয়া সেই বিচারার্থী বণিক্‌কে বলিলেন,—আচ্ছা, এই যে গল্পটী শুনিলে, ইহার মধ্যে চোর, দস্যু ও ব্যাঘ্র এই তিনের কাহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করা যায়, বল দেখি?

বণিক্ বলিল,—আমার মতে এ ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রেরই ধৈর্য্য প্রশংসার্হ; কেন না ব্যাঘ্র ঘোর হিংস্রস্বভাব জানোয়ার হইয়াও অবাধে যে রাজকন্যাকে ছাড়িয়া দিল, ইহা তাহার বড়ই ধৈর্য্যের পরিচয়।

শুক এই কথা শুনিয়া প্রথম বণিক্‌কে বিদায় দিলেন। এইবার দ্বিতীয় বণিক্ আনীত হইল। শুক ইহার নিকটেও উক্ত গল্প বর্ণন করিয়া কাহার ধৈর্য্য অধিক, সে বিষয়ে মত জানিতে চাহিলেন। এ বণিকের মতে

এইবার তৃতীয় বণিক্ আনীত হইল। শুক ইহার নিকটেও উক্ত গল্প বর্ণনা করিয়া কাহার ধৈর্য্য অধিক, সে সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তৃতীয় বণিক্ উত্তর করিল,—আমার মতে চোরের ধৈর্য্যই প্রশংসনীয়।

তখন শুক গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন,—দেখ বণিক্, আমার বিচারে তুমিই সেই মণিচোর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছ। সুতরাং মণিটী আমার নিকট অর্পণ কর। অন্য কেহই কিছু জানিতে পারিবে না। তোমাদের তিন জনেরও পূর্ব্বের ন্যায় সদ্ভাব বজায় থাকিবে।

শুকের মুখে এই কথা শুনিয়া বণিক্ বিস্মিত হইল এবং মনে মনে তাঁহার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গুপ্ত মণি শুকের হস্তে অর্পণ করিল।

সে দিন এই পর্য্যন্তই হইল। পরদিন শুক বিচারে বসিয়া তিন বণিক্‌কেই একসঙ্গে ডাকাইয়া আনিলেন। বণিক্‌ত্রয় উপস্থিত হইলে শুক তাহাদিগকে কহিলেন,—তোমাদের অপহৃত মণি আমি বিচার করিয়া বাহির করিয়াছি ; এই লও, সেই মণি। এই মণি লইয়া তোমরা তিন বন্ধু হৃষ্টচিত্তে বিদায় গ্রহণ কর। এই বলিয়া শুক সেই মণিটী অর্পণ করিলেন।

মণি পাইয়া বণিকেরা পরম হৃষ্ট হইল। তখন শুক তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন,—তোমরা কি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে ?

বণিকেরা বলিল,—নিশ্চয়ই পারিব। আমরা প্রাণপণ করিয়াও আপনাকে রাণীর নিকট পৌঁছাইয়া দিব।

এই কথার পর বণিকেরা শুকের ইঙ্গিতে সে স্থান হইতে নিজেদের বা[illegible] প্রস্থান করিল। শুক স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে [illegible]

বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বণিকেরা শেষ রাত্রে গোপনে শুককে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। শুকের উপদেশ মত পরিচালিত হওয়ায় নির্ব্বিঘ্নে তাহারা সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া সত্যরাজের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে রাজবাড়ীর যে অংশে রাণী ব্রতনিষ্ঠ হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন; বণিকেরা শুককে গোপনে সেইখানে লইয়া আসিল। শুক রাণীর বাস-স্থানের সন্ধান পাইয়া তখন নিজেই অতি সন্তর্পণে রাণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাণী শুক-সন্দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং অতি যত্নে নানা ভক্ষ্যপেয় দানে তাঁহাকে এক নিভৃত প্রদেশে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে সেই দিনই অপরাহ্নে সত্যরাজরূপী নাপিত রাণীর আবাসে আগমন করিয়া, এ কথা সে কথার পর, রাণীর ব্রতসমাপনের আর কতদিন অবশিষ্ট আছে, এবং তাহাতে কি কি দ্রব্যেরই বা প্রয়োজন, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—মহারাজ! আমার ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব নাই। অদ্য হইতে এক মাস পরেই আমার ব্রত শেষ হইবে। অতএব এ ব্রতে প্রধানতঃ একটী ছাগপশু লাগিবে। তদ্ভিন্ন অন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইবে, তাহা পরিচারিকা দ্বারা পরে জানাইব।

নাপিত-রাজ এই কথা শুনিয়া, শীঘ্রই রাণী তাহার অঙ্কশায়িনী হইবেন ভাবিয়া, হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল এবং রাণীর প্রার্থিত ছাগপশু লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিল।

রাণী পরিচারিকার হস্তে এক পত্র লিখিয়া নাপিতরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন,—মহারাজ! অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। এই ব্রতে ছাগপশু ব্যতীত আরও যে যে দ্রব্য আবশ্যক, তাহা

এই পরিচারিকার মুখে অবগত হইয়া উদ্‌যাপনের পূর্ব্বদিন পাঠাইবেন। ব্রত উদ্‌যাপন হইয়া গেলে কি করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অগ্রে আপনার সহিত আমার একটা গুপ্ত পরামর্শ আছে। সুতরাং উদ্‌যাপনের দিন পূর্ব্বাহ্নে আপনি আমার নিভৃত কক্ষে আসিয়া সেই পরামর্শে যোগদান করিবেন।

নাপিত-রাজা এই পত্র পাইয়া একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। ভাবিল,---আর সাতটা দিন কোন গতিকে কাটিয়া গেলেই হয়; ইহার পরইত আমার চিরবাঞ্ছিত বস্তু আমার আয়ত্ত হইবে; রাজমহিষী অঙ্কশায়িনী হইবেন! অহো! কত দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা এত দিনে আমার চরিতার্থ হইতে চলিল। নাপিতরাজ ইহা ভাবিয়াই আনন্দে ডগমগ!

এদিকে রাণী নাপিত-রাজের প্রেরিত ছাগপশুটীকে নিজের পালঙ্কের নীচে রাখিয়া দিলেন এবং প্রথম দুই তিন দিন উহাকে অতি অল্প পরিমাণ আহার প্রদান করিলেন; তারপর তিন দিন তাহার আহার একেবারেই কমাইয়া দিলেন। ছাগটী অনাহারে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সে অতিকষ্টে দাঁড়াইতে পারিত, কিন্তু পরক্ষণেই কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িত। এই অবস্থায় ছাগটী কেবল ভ্যা ভ্যা করিয়া চিৎকার করিত। কিন্তু সপ্তম দিনে তাহার সে চিৎকার চরমে উঠিল। ছাগটী এক একবার নীরব থাকে, আবার সে উচ্চ চিৎকার করিয়া উঠে। ছাগটীর যেন আসন্ন কাল উপস্থিত।

অদ্য রাণীর ব্রতোদ্‌যাপনের সেই সপ্তম দিন। নাপিত-রাজ যথাকালে রাণীর জন্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া, রাণীরই নির্দ্দেশমত ঐ দিন পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। নাপিত-রাজের আগমনের পূর্ব্বে

রাণী শুকপক্ষীটীকে আরও একটু গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলেন। শুক পালঙ্কের নীচে সেই ছাগ পশুটীরই অদূরে অবস্থান করিতেছিল। নাপিত-রাজা আসিবামাত্র রাণী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রাজাকে পালঙ্কের উপর বসিতে দিলেন। রাজার পায়ে দৃঢ়বন্ধন পাদুকা ছিল। তাই তিনি পালঙ্কোপরি পা ঝুলাইয়া বসিলেন। রাণী কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আপনার সহিত আমার এক বিশেষ পরামর্শ আছে। সেই নিমিত্তই আপনাকে এ সময় আসিতে বলিয়াছিলাম।

নাপিতরাজ বলিলেন,—বল, রাণী বল, তোমার কোন্ বিষয়ে কি পরামর্শ আছে; অসঙ্কোচে বল।

রাণী কি বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময় শুক তাহার দুই চঞ্চুপুট দ্বারা ছাগ পশুর পায়ে সজোরে দুইটা ঠোকর মারিল। ছাগ ভ্যা ভ্যা করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

রাণী বলিলেন,—না, এটার জন্য আর কারো কাছে কোন কথা কহিবার যো নাই।

ছাগ খানিক চেঁচাইয়া নীরব হইল। রাণী আবার নাপিত-রাজকে কি যেন বলিতে উদ্যত হইলেন। শুক আবার ঠোকর মারিল। ছাগ আবার ভ্যা ভ্যা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ছাগের সেই 'ভ্যা ভ্যা'—শব্দে কাণ ঝালাপালা হইতে লাগিল। রাণী আবার বিরক্ত হইলেন। নাপিতরাজের আর সহিল না। তিনি ক্রোধে সেই দৃঢ়-বন্ধন জুতা-পায়ে ছাগটাকে এক লাথি মারিলেন। অনাহার-কৃশ দুর্ব্বল ছাগ সেই এক লাথিতেই পঞ্চত্ব পাইল। রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার এই

মন্ত্রপূত ছাগ মারিয়া ফেলিয়া আপনি আমার ব্রত পণ্ড করিলেন। এখন উপায়?

নাপিতরাজ কহিলেন,—রাণী, সেজন্য চিন্তা কি? আমি এখনই অন্য ছাগ আনাইয়া দিতেছি। রাণী কহিলেন, না মহারাজ, নূতন ছাগে হইবে না, আমার এই মন্ত্রপূত ছাগেরই প্রয়োজন। নতুবা আরও এক বৎসর আমাকে এই ব্রত পালন করিতে হইবে। তা মহারাজ, আপনি তো পর-কায়ে প্রবেশের মন্ত্র জানেন; সুতরাং আপনি এই ছাগদেহে প্রবেশ করিয়া আমার ব্রত সমাপন করান। পরে আবার এই নিজদেহে আসিবেন। আপনি এরূপ না করিলে আমাকে দীর্ঘ আরও এক বৎসর কষ্টে এই ব্রত ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। আপনি কি আর আমার এই ভাবে থাকা ইচ্ছা করেন?

নাপিতরাজ কহিলেন,—না রাণী, তোমাকে আর কষ্টে রাখিতে ইচ্ছা করি না। এখনই ছাগদেহে প্রবেশ করিতেছি। এই বলিয়া নাপিত রাজদেহ ছাড়িয়া যেমন সেই ছাগদেহে প্রবেশ করিল, শুকদেহস্থ সত্যরাজ অমনি মন্ত্রবলে শুকদেহ ছাড়িয়া নিজদেহে প্রবেশ করিলেন। নাপিত ছাগপশু হইয়া 'ভ্যা ভ্যা' করিতে লাগিল। রাণী পরমানন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহার চিরাবাধ্য স্বামী সত্যরাজের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। নাপিত তাহার কর্ম্মফল ভোগ করিতে লাগিল।

মাতুল ও ভাগিনেয়।

পণ্ডিতজী বলিলেন,—জাঁহাপনা! চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণের কাল হিন্দু-শাস্ত্রে অতি পুণ্যকাল বলিয়া বর্ণিত। ঐ কালে দান-ধ্যান করিলে অনন্ত ফল হয়।

একদা দুইজন পতিত ব্রাহ্মণ 'গ্রহণ'দিনে প্রতিগ্রহ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাত্রা করিল। ব্রাহ্মণদ্বয় পরস্পরের সম্পর্কে মাতুল ও ভাগিনেয়। তাহারা একে পতিত,—তদুপরি বাল্যকাল হইতেই কুসঙ্গে মিলিত;—তাই অধঃপাতের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল—প্রবঞ্চনাই হউক, শঠতাই হউক, যে কোনরূপে স্বার্থ-সাধন করিতে পারিলেই হইল। স্বার্থে ধর্ম্মাধর্ম্মের কোনই সম্পর্ক নাই।

এইরূপ ধারণা লইয়া তাহারা সংসার ব্যবহার করিত বলিয়া অন্য যে কোন ব্রাহ্মণ সে কালে তাহাদের নাম শুনিলেও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিতেন। অনেকে তাহাদের ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতেন না।

কাজেই স্বগ্রামে তাহাদিগের দান প্রাপ্তির আশা নাই, ভাবিয়া তাহারা এক দূরবর্ত্তী ভিন্ন গ্রামে গেল। এই গ্রাম বহু বিস্তৃত; গ্রামের নীচ দিয়াই ভাগীরথী প্রবাহিত। গ্রামের নরনারী সকাল হইতেই গঙ্গা-স্নানে নিরত।—দেখিয়া ভাগ্না মামাকে বলিল,—এস মামা, আমরাও গঙ্গাস্নান করিয়া শুদ্ধ বেশ ধারণ করি। পরে গঙ্গার তীর দিয়া ভ্রমণ করিতে থাকি। তীর্থযাত্রীরা আমাদিগকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া অর্থদান করিবে।

এইরূপ পরামর্শের পর উভয়েই গঙ্গাস্নান করিল; তিলক পরিয়া—নামাবলী গায়ে দিয়া, গঙ্গার তীর ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। তীর্থসেবীরা স্নান দানাদি করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিধাতার এমন ইচ্ছা যে, ঐ দুই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ সেদিন কোন যাত্রীর নিকটই কিছুই দানীয় দ্রব্য পাইল না। তখন ভাগ্‌না' নিরাশ হইয়া মামাকে বলিল,—মামা, আমাদের এ যাত্রা ভাল নয়। এমন যোগের দিনটা গেল, কেহই কিছু দিল না! যা হউক—আইস, আমরা নিজেরাই এদিনে কিছু দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করি। এই যে আমাদের সঙ্গে একটা সিকি আছে, ইহা আমি একবার তোমায় দান করি, তুমি আবার আমায় দান কর; তা'হলেই আমাদের এ দিনে দানকার্য্য করা হইবে এবং দানের পুণ্যও আমরা পাইতে পারিব।

তাহাই হইল। মামা-ভাগনা' গ্রহণদিনে এইরূপ দানই করিল। হাটিয়া হাটিয়া মধ্যাহ্নে তাহাদের ক্ষুধা খুবই হইয়াছিল। তাই তাহারা আহারার্থ গঙ্গার পরপারস্থ এক মুদীর দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

মুদী বড় ভাল মানুষ। মুদীর মস্ত দোকান; দোকানে চাল, ডাল, ঘৃত, আটা, কাঠ, হাঁড়ি, তৈল, লবণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তুই আছে। দোকানের পিছন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি চালা ঘর। পথিক বা তীর্থযাত্রীরা প্রায়ই মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া মুদীর দোকান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া সেই দুইখানি ক্ষুদ্র ঘরে রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মুদী তাহাদের নিকট দ্রব্যাদির উচিত মূল্য এবং ঘর-ভাড়া-স্বরূপ লোক প্রতি দুইটী করিয়া পয়সা গ্রহণ করে।

ধূর্ত্ত মামা-ভাগ্‌না' পরামর্শ করিয়া আজ এই মুদীর দোকানেই গমনোদ্যত। কিছু দূর গিয়াই মামা-ভাগ্‌না'য় আবার কি পরামর্শ হইল।

মামা একাকীই মুদীর দোকানে গমন করিল। ভাগ্না' দোকান হইতে খানিকটা দূরে এক বৃক্ষতলায় বসিয়া রহিল।

দুষ্ট ব্রাহ্মণ বরাবর মুদীর দোকানে গেল। মুদী তখন আহারাদি করিয়া সবেমাত্র দোকানে উপবিষ্ট। ব্রাহ্মণ মুদীকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিল,—ওহে দোকানী, বেলা বড় অধিক হইয়াছে। তোমার এইখানেই আহারাদি সারিয়া যাইব স্থির করিয়াছি। তোমার দোকানে ভাল জিনিস পত্র আছে ত?

মুদী ব্রাহ্মণ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল,—আসুন, কর্তা আসুন; দোকানে সবই আছে; এখনই যোগাড় করিয়া দিতেছি।

ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ কি একটু চিন্তা করিয়া পরক্ষণেই মুদীকে বলিল,—হাঁ তবে শীঘ্র শীঘ্র কর; এই বলিয়া ব্রাহ্মণ একটা মাদুরীর উপর নিজের ব্যাগটী রাখিয়া বসিল এবং ব্যাগ হইতে একটী পয়সা বাহির করিয়া মুদীকে দিয়া বলিল,—শীগ্গির আমায় এক পয়সার বাতাসা এবং এক পাত্র জল আগে দাও। পরে তুমি রন্ধনের যোগাড় কর!

মুদী বলিল,—তা পয়সা এখন থাক্ না; একসঙ্গেই লওয়া যাইবে আপনি বাতাসা নিন। ব্রাহ্মণ বলিল,—না হে, শেষের কথা শেষে এখন তুমি এই পয়সাটা লও না।

মুদী পয়সা লইয়া রাখিয়া দিল। ব্রাহ্মণ বাতাসা খাইতে লাগিল ওদিকে মুদী রন্ধনের সমস্ত যোগাড় করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ রন্ধনে বসিল এবং ফরমাইস করিয়া মুদীর দ্বারা ভাল ভাল দ্রব্য আনাইতে লাগিল। মুদী আদেশমত সমস্তই যোগাড় করিয়া দিল।

কিছুকাল পরেই ব্রাহ্মণের রন্ধন শেষ হইল। ব্রাহ্মণ আহারে বসিয়া মনের সাধে আকণ্ঠ আহার করিল। আহারান্তে ব্রাহ্মণ মুদীর গদির

উপবিস্থিত সেই মাদুরীর উপর আবার আসিয়া বসিল এবং ব্যাগ খুলিয়া মুখশুদ্ধির জন্য দু'চারটী যোয়ান এবং একখণ্ড হরিতকী বাহির করিয়া চিবাইতে লাগিল। মুদী ব্রাহ্মণের জন্য তামাক সাজিয়া রাখিল।

ঠিক এমনই সময় আর একজন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণের ভাগ্‌না আসিয়া উপস্থিত। মুদী তাহাকে প্রণাম করিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নবাগত ব্রাহ্মণ বলিল,—আমার আহার হয় নাই বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইয়াছে। তোমার দোকানের ঐ চালা ঘরে এ বেলার মত দু'টী অন্ন বান্ধিয়া খাইব বলিয়াই আসিয়াছি। যদি সম্ভব হয়, তবে শীঘ্র শীঘ্র যোগাড় করিয়া দাও।

মুদী বলিল,—আর একটু পূর্ব্বে আসিলে এক সঙ্গেই দু'টী ব্রাহ্মণের যোগাড় করা যাইত। যা হউক, আমি এখনই ঘর সাপ্ করিয়া সব প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া মুদী ঘর সাপ্ করিতে গেল। এদিকে 'মামা-ভাগ্‌না'র মৃদুস্বরে আলাপ চলিতে লাগিল। মামা বলিল,—এ বেলা তো এখানে এরূপ হইল, ও-বেলার আবার কি করা যাইবে?

ভাগ্‌না'। ভাবনা কি, যা হয় একটা হইবেই।

মামা। আমি কি এখনই রওনা দিব?

ভাগ্‌না'। না, আমার খাওয়া শেষ হয়-হয়, এমন সময় যাইবে।

এইরূপ মৃদু মন্দ আলাপ চলিতেছে, ইতিমধ্যে মুদী হাঁকিয়া বলিল,—দেবতা, এ ঘরে আসুন। সব প্রস্তুত হইয়াছে।

নবাগত ব্রাহ্মণ ত্বরাত্বরি গামছা লইয়া রন্ধন ঘরে গেল। মুদী পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণকেও যেরূপ যাহা দিয়াছিল, এই ব্রাহ্মণকেও সেই সমস্তই দিল।

ব্রাহ্মণ রান্ধিয়া বাড়িয়া খাইতে বসিল। খাওয়া যখন বারোআনা আন্দাজ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বাগত ব্রাহ্মণ নিজের ব্যাগ ও ছাতি লাঠি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুদী বলিল,—দেবতা কি এখন যাইতে ইচ্ছা করেন? ব্রাহ্মণ বলিল, –হাঁ, বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এখন রওনা না হইলে আর কুলাইতে পারিব না। আচ্ছা, তবে আসি এখন আমি? এই বলিয়া ব্রাহ্মণ যাইবার উদ্‌যোগ করিল। মুদী বলিল,—আমার পাওনা আট আনা হইয়াছে, এইবার তবে দিন।

ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ বলিল,—সে কি, তোমায় তো পয়সা পূর্ব্বেই দিয়াছি।

মুদী। কৈ আমায় তো একটা পয়সা বৈ অন্য পয়সা আপনি দেন নাই! আমি তো সে পয়সাটা ফর্দ্দে ধরিই নাই।

ব্রাহ্মণ। আমি অত শত বুঝি না, তোমায় আমি আহারের পূর্ব্বে পয়সা দিয়াছি কি না বল?

মুদী। একটা পয়সা দিয়াছেন; তা কি আর আমি না বল্‌ছি?

ব্রাহ্মণ। বস্, তুমি পয়সা পাও নাই, একথা না বল্‌লেই হইল। ইহার পর মুদী আবার কি বলিতে যাইতেছিল; ইতি মধ্যে সেই রান্না ঘরের ভোজনাসক্ত ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—ওহে দোকানী, তুমি তো দেখ্‌ছি বড় ঠেঁঠা লোক; তুমি আবার আমার সঙ্গেও ঐরূপ কর্‌বে না কি? আমি কিন্তু তোমায় আগেই সব চুকাইয়া দিয়াছি।

মুদী গতিক দেখিয়া অবাক্ হইল; বলিল,—প্রণাম হই। আপনাদের কাহারও কাছে আমার কিছুই পাওনা নাই। আপনারা চলিয়া যাউন।

গমনোদ্যত ব্রাহ্মণ বলিল,—কি হে দোকানী, তুমি অসন্তুষ্ট হ'লে না কি? দেখ, এক দিনের তো কাজ নয়, আমরা কি তোমায় অসন্তুষ্ট করিয়া যাইতে পারি? বিশেষ আমরা ব্রাহ্মণ।

মুদী বলিল,—ব্রাহ্মণ তো কখনই নয়, আর হইলেও সে জাতের না'র।

ইতি মধ্যে সেই বান্নাঘরের ব্রাহ্মণ আহার শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া দোকানের মধ্যে আসিল এবং মুদীর ঐ শেষ কথা শুনিয়া যেন রাগিয়া গিয়া তরাতরি নিজের ব্যাগ লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাইবার সময় দুই ব্রাহ্মণই মুদীকে বলিয়া গেল,—কাল কলি কিনা! তাই কোন দোষের দোষী না হ'লেও তুই আমাদিগকে যা' না, তাই বল্‌লি!

মুদী একা; তাই সাহস করিয়া সে আর কোন কথাই কহিল না; সে কেবল সেই দুইটা লোকের ধূর্ত্ততার বিষয় ভাবিতে লাগিল।

এদিকে ঐ দুই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ বরাবর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইবে, এই স্থির করিয়া সে রাত্রে স্বগ্রামে আসিল না। দেশান্তরেই যাইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তাহারা অতিথি হইবার জন্য এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

পথে যাইতে যাইতে পরস্পর পরামর্শ হইয়াছিল,—আমরা যেখানেই যাইব, অকৃতকার্য্য হইয়া কিছুতেই ফেরা হইবে না। অকৃতকার্য্য হইলেই যাত্রা অশুভ হইবে। মধ্যাহ্নে নিঃসম্বল অবস্থায় মুদীর দোকানে একরূপ কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে। এখন এই রাত্রিটা যেখানেই হউক, চালাইতে হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা সেই গৃহস্থের বাড়ীর সাম্‌নে গিয়া ডাকিল—বাড়ীতে কে আছ গো! আমরা অতিথি, অদ্য রাত্রে আমাদিগকে একটু স্থান দিতে হইবে।

বাড়ীতে লোকজন বেশী ছিল না। একজন বৃদ্ধ, একটী অল্পবয়স্ক

বালক এবং বৃদ্ধের পত্নী বাড়ীতে বাস করিতেছিল। বৃদ্ধ হাঁপানি রোগ গ্রস্ত, বাহিরের ঘরে বসিয়া হাঁপাইতেছিল। সে অতি কষ্টে উত্তর দিল,—এখানে অতিথি থাকিবার স্থান হইবে না। তোমরা অন্য বাড়ীতে যাও।

ব্রাহ্মণদ্বয় ঐ কথা শুনিয়া কৃত্রিম আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিল,—কপালে ভোগ থাকিলে, সহজে তাহা ঘুচে না। এই যে বৃদ্ধ আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছে, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই হাঁপানি রোগ-গ্রস্ত; আমরা যে ওর কি উপকার করিতে পারিব, তা' ও বুঝিতে পারিল না!

বৃদ্ধ ঘরের মধ্য হইতে এই কথা শুনিয়া ত্বরাত্বরি বলিয়া উঠিল,—আপনারা হাঁপানি রোগের কিছু জানেন না কি?

ব্রাহ্মণদ্বয় বাহির হইতে উত্তর দিল,—তা জানিয়াই বা কি করিতেছি, তুমি তো আর আমাদের স্থান দিচ্ছ না!

বৃদ্ধ বলিল,—আসুন আপনারা, আমি চিনিতে পারি নাই। আমার এখানে আপনাদের কষ্ট হইবে বলিয়াই অন্যত্র যাইতে বলিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—তা কষ্টই হউক, আর সুখই হউক, রাত্রিট একরূপে কাটিয়া গেলেই হইল।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ অতিথি দুইজনকে বসিবার আসন দিয়া যষ্টি সাহায্যে বাড়ীর ভিতর গেল এবং কিঞ্চিৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—রাত্রিকাল, লোকজন বেশী নাই, পাকাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া বড়ই অসুবিধাজনক। আপনারা ব্রাহ্মণ, উপবাসী থাকিবেন, তাহাও ভাল বোধ হয় না। আমার বাড়ীতে দৈ আছে, চিনি আছে, আর কিঞ্চিৎ দুগ্ধও আছে, যদি ইহা দ্বারা কোনরূপে

রাত্রিটা যাপন করেন, তবে কল্য ঈশ্বরেচ্ছায় একরূপে আপনাদের পাকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিব।

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—না, না, আমাদের জন্য কষ্ট করিতে হইবে না। আমরা এই রাত্রিটা এখানে শুইয়া থাকিতে পারিলেই হইল।

বৃদ্ধ বলিল,—আপনারা একেবারে উপবাসী থাকিবেন, তাহাতে আমার অকল্যাণ হইবে। অতএব উপস্থিত যা' কিছু আমার আছে, তাহাই গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণদ্বয় অবশেষে বৃদ্ধের অনুরোধে খৈ, চিনি ও দুগ্ধ দ্বারাই উত্তম-রূপ আহার করিয়া সে রাত্রি সেখানে বাস করিল। শয়নের পূর্ব্বে বৃদ্ধ বলিয়া রাখিল,—হাঁপানি সম্বন্ধে আপনারা যা' কিছু জানেন, তা' কাল সকালেই আমায় বলিয়া দিবেন। আপনারা থাকিতে থাকিতেই আমি সেই ঔষধ কল্য ব্যবহার করিব।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণদ্বয় হাঁপানির কিছু জানে না; তথাচ বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল,—আচ্ছা কালই বলিয়া দিব! এই কথার পর বৃদ্ধ শয়ন করিতে গেল। ব্রাহ্মণদ্বয়ও শয়ন করিল।

যথাকালে রাত্রি প্রভাত হইল। বৃদ্ধের নেত্রে নিদ্রা নাই, হাঁপানির জন্য প্রায় রাত্রিই তাহাকে জাগিয়া থাকিতে হয়। অদ্য ঔষধ প্রাপ্তির আশায় বৃদ্ধ রাত্রি সত্ত্বেই শয্যা ত্যাগ করিল। ইতি মধ্যে ব্রাহ্মণদ্বয় উঠিয়া অতি প্রত্যূষেই নিজ নিজ ব্যাগ লইয়া বাড়ীর বাহির হইল।

বৃদ্ধ ডাকিয়া বলিল,—আপনারা অদ্য এখানে থাকুন, আহারান্তে যাইবেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—না, আমাদের প্রয়োজন আছে। এখনই যাইতে হইবে।

বৃদ্ধ বলিল—আমাকে যে ঔষধ দিবেন বলিয়াছিলেন?

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—ঠিক কথা, তুমি আমাদের সঙ্গে খানিকটা এস, পথে পথেই বলিয়া দিব।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা হাটিতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বৃদ্ধের বাড়ী হইতে কিছু দূরে আসিয়াই একজন অতিথি বৃদ্ধকে বলিল,—তোমার রোগ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, আপাততঃ একটা মুষ্টিযোগ বলিয়া দেই। ইহাতেই তোমার আরাম হইবে।

বৃদ্ধ বলিল,—যাহাতে আমার উপকার হয় বলুন, আমি তাহাই করিব।

তখন একজন অতিথি বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিল,—এক কাজ কর, ভাদ্র মাসের চারিটা বড় বড় তাল লইয়া একটা তে'মাথা পথে দাঁড়াইবে এবং তিনটা বড় তাল তিন দিকের পথে ছুঁড়িয়া দিবে; আর যে একটা তাল হাতে থাকিবে, তাহা হাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিবে। আর একজন বলিল,—দেখিও, দাঁতে যেন ঠেকে না, ঠেকিলে ফল হইবে না।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয় দ্রুতপদে হাটিল। বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাদসাহ জিজ্ঞাসিলেন,—পণ্ডিতজী! ঐ দুই-ধূর্ত্ত পয়সা রোজগারের জন্যই বাহির হইয়াছিল। একটা সম্ভব মত যা হয় কিছু বলিয়া মিষ্ট কথায় ঐ বৃদ্ধের নিকট হইতেও তো কতক পয়সা রোজগার করিতে পারিত, তবে কেন এরূপ করিল?

পণ্ডিতজী হাসিয়া বলিলেন, জাঁহাপনা! ঐ দুই ধূর্ত্তের রোজগারটাও প্রায়শঃ রঙ্গরসময় ছিল; নীরস বা রূক্ষ উপায়ে উহারা রোজগার করিত না। উহাদের রোজগারের মধ্যেও কেমন একটু রঙ্গ থাকিত। একটা

বিবরণ বলি; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কি ভাবে উহারা অর্থোপার্জ্জন করিত।

ঐ দুই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ পথে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইল,—নিকটস্থ এক ধনী কায়স্থের বাড়ী খুব ধূমধামের সহিত অদ্যই এক কন্যার বিবাহ হইবে। শুনিবা মাত্র তাহারা সেই দিকেই যাত্রা করিল। যাইয়া দেখিল,—ধনী তাহার ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-গণ কেহ কুড়ি, কেহ পঁচিশ টাকা করিয়া বিদায় পাইতেছেন। অনিমন্ত্রিত উপস্থিত ব্রাহ্মণেরাও পাঁচ টাকা ছয় টাকা করিয়া বিদায় পাইতেছেন।

এই দানব্যাপার দেখিয়া মামা-ভাগ্‌না'র খুব আশা হইল। পরস্পর বলাবলি করিল —এখান হইতে উপস্থিত ব্রাহ্মণের সমান বিদায় কিছুতেই নেওয়া হইবে না। যেরূপেই হউক, বেশী বিদায় লইতে হইবে। আজ বিদায়ের জন্য যাইব; কিন্তু বিদায় কম হইলে লইব না।

এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা বিদায় হইবার জন্য গমন করিল। কিন্তু কন্যাকর্ত্তা তাহাদিগকে উপস্থিত ব্রাহ্মণের বিদায়ের তালিকা অনুসারে পাঁচ পাঁচ দশ টাকা দিতে চাহিলেন। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণদ্বয় প্রথমে না, না, বলিল; শেষে কি ভাবিয়া দশ টাকাই গ্রহণ করিল। কিন্তু দশ টাকা লইয়াও তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তাহারা সেদিনকার মত বিদায় হইয়া গিয়া ঐ ধনীর বাড়ীর সন্নিকটেই একস্থানে বাসা করিয়া রহিল এবং নানা উপায়ে ঐ ধনী ব্যক্তির সংসারের নানা খবর লইতে লাগিল।

বিবাহের গোলমাল মিটিতে দশ বারো দিন কাটিল। ধনী ব্যক্তি নূতন কুটুম্বদিগকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। দুই তিন দিন পরে নূতন কুটুম্ব বাড়ী হইতেও তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল। স্থির হইল,—

কর্ত্তা নিজের সুসজ্জিত শিবিকায় চড়িয়াই বৈবাহিক গৃহে নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন তাঁহার শিবিকাবাহকগণের মধ্যে দুইজনই অসুস্থ ; কাজেই অন্য দুইজন বাহক সন্ধানের জন্য লোক প্রেরিত হইল। দুষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় এই সংবাদ পাইয়া নিজ নিজ পৈতা কোমরে লুকাইয়া রাখিয়া অবিকল বাহকবেশে ধনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং যথাকালে ধনী ব্যক্তিকে শিবিকায় চড়াইয়া অন্যান্য বাহকের সহিত তাহারা নূতন কুটুম্ব-বাড়ী লইয়া চলিল।

কুটুম্ব-বাড়ীর অল্প দূরেই একটা সরোবর। এই সরোবরের তীর দিয়াই পথ ; বাহকেরা এইখানে আসিয়া হঠাৎ পাল্কী নামাইল। দুষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় এবার পাগড়ী খুলিল, পৈতা বাহির করিল, পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণবেশ ধরিল।

ধনী এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন,—তোমরা ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—হাঁ মহাশয় !

ধনী। পাল্কী বহিতেছ কেন ?

ব্রাহ্মণদ্বয়। করি কি, আপনি তো আর আমাদের যোগ্য বিদায় দিলেন না ; কাজেই পাল্কী বহিতেছি।

ধনী ব্যক্তি জাতিতে কায়স্থ। দেব দ্বিজে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি। তিনি এ ঘটনায় নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করিয়া ভাবিলেন,—কি সর্ব্বনাশ ! আমি ব্রাহ্মণ দিয়া পাল্কী বহাইয়া আনিয়াছি ! আমার তো নরকেও স্থান হইবে না ! বিশেষতঃ আমার কুটুম্বগণ যদি এ ঘটনা জানিতে পারেন, তা হ'লেও লজ্জায় আমি মরিয়া যাইব। কি করি, এখনই

ইহাদিগকে প্রার্থিত অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দেই। পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব।

ধনী এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণদ্বয় পাল্কী লইবার উদ্‌যোগ করিল। ধনী বলিলেন,—না, না, তোমাদিগকে পাল্কী বহিতে হইবে না, তোমরা কি বিদায় পাইলে সন্তুষ্ট হও, বল?

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিল,—আমরা পূরা বিদায় পাইবার জন্য এখানে প্রায় কুড়ি দিন যাবৎ নিজ খরচে আছি; সুতরাং এক্ষেত্রে একশত টাকার কম বিদায় হইলে আমাদের যোগ্য বিদায় হয় না।

ধনী বলিলেন,—তোমাদিগকে তাহাই দিতেছি, তোমরা পাল্কী ছাড়িয়া আমায় পদধূলি দিয়া চলিয়া যাও। এই পাল্কী-বহনের সংবাদ তোমরা আর কোথাও ব্যক্ত করিও না।

দুষ্ট ব্রাহ্মণদ্বয় এইরূপে আকাঙ্ক্ষিত অর্থ আদায় করিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। ধনী সেখান হইতে পদব্রজেই বৈবাহিক-গৃহে গমন করিলেন।

বাদসাহ প্রথম দিন এই কয়েকটী উপন্যাস শুনিয়াই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছায় এদিনের মত মজলিস ভঙ্গ হইল। সভাসদেরা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

মিহির ও ইন্দুবালা।

দ্বিতীয় দিন।

এদিন যথাকালে নির্দ্দিষ্ট ভবনে বাদসাহের মজলিস বসিল। বাদসাহ এবং তাঁহার পরিষদ্‌বর্গ সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় সমাসীন। উপন্যাস-বক্তা পণ্ডিতজী যথাকালে মজলিসে যোগদান করিলেন। বাদসাহ বলিলেন,—পণ্ডিতজী! আজ অগ্রে দুই একটা বড় রকমের গল্প বলুন।

পণ্ডিতজী বাদসাহের অভিপ্রায় মত বলিতে লাগিলেন,—জাঁহাপনা! পূর্ব্বকালে কেকয়দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম বলবর্ম্মা। বলবর্ম্মা রাজোচিত সমুদয় সুখভোগের সহিত বহুদিন রাজত্ব করিলেন। একে একে তাঁহার পাঁচটী সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিল। পুত্রগণ সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

একদা রাজা বলবর্ম্মার কি এক খেয়াল হইল। তিনি পুত্রগণকে ডাকিয়া একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা কাহার ভাগ্যে খাইতেছ? রাজার সন্তোষের জন্য জ্যেষ্ঠ চারিটী পুত্র সমস্বরে বলিল,—পিতঃ! আপনি ভাগ্যবান্; আমরা আপনারই ভাগ্যে খাইতেছি।

রাজা একথায় সন্তুষ্ট হইয়া শেষে কনিষ্ঠ পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—বৎস! তুমি তো কিছুই বলিতেছ না, তুমি কাহার ভাগ্যে খাইতেছ? কনিষ্ঠ কহিল,—পিতঃ! কাহারও ভাগ্যেই কেহ খায় না; মানুষ নিজের ভাগ্যেই নিজে খাইয়া থাকে।

রাজা বলবর্ম্মা এ কথায় মনে মনে কনিষ্ঠের প্রতি খুব যে একটা অসন্তুষ্ট হইলেন, তাহা নহে; তবে তিনি কনিষ্ঠের কথা পরীক্ষার জন্য কৃত্রিম কোপের সহিত তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। রাজার এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মিহির। মিহির,—সবেমাত্র পঞ্চদশ বর্ষে উপনীত। রাজা এই সময়েই তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। মিহির যেন আপন ভাগ্যে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতেই বহির্গত হইলেন। রাজা তাঁহাকে ফিরাইলেন না, তাঁহার কোনই সংবাদ লইলেন না।

মিহির এক বস্ত্র ও একমাত্র উত্তরীয় লইয়া রাজধানী হইতে বাহির হইলেন। সমস্ত দিন গেল, সন্ধ্যার সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর মিহির এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঘোর অরণ্য, জনমানবশূন্য; মধ্যে মধ্যে নানা হিংস্র জন্তুর ভীষণ চিৎকার ও বৃহৎ বৃহৎ পক্ষীর বিকট রব শুনা যাইতে লাগিল। মিহির অন্তরে একটু শঙ্কিত হইলেন এবং অতিকষ্টে নিকটস্থ একটা বৃহৎ বৃক্ষের স্কন্ধে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

মিহির যে বৃক্ষের আশ্রয় লইলেন, ঐ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় দুইটা বিচিত্র-বর্ণ বৃহৎ পক্ষী বাস করিত। অদ্য রাত্রে পক্ষী দুইটা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—হায়, আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আজ এক বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছি, কোথাও একটু মনুষ্য-রক্ত পাইলাম না। না জানি, আমাদের আশা কবে মিটিবে!

মিহির পক্ষি-জাতির কথা বুঝিতে পারিতেন। তিনি বৃক্ষোপরিস্থিত পক্ষিদ্বয়ের কথা শুনিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন,—কি সর্ব্বনাশ! কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি। পক্ষী দুইটা মনুষ্য-রক্ত চায়? তবে কি উহাদের হাতেই প্রাণ যাইবে? উহাদের উদ্দেশ্য কি?

মিহির এইরূপ ভাবিতেছেন,—ইতিমধ্যে পক্ষিদ্বয় আবার বলিল,—বিধাতা আমাদের জন্য কি কঠিন নিয়মই করিয়াছেন! মনুষ্য-রক্ত না হইলে আমাদের চক্ষু ফোটে না, অথচ এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা মনুষ্য-রক্ত পাইলাম না। আমাদের শাবক দুইটী অন্ধ হইয়া রহিল। এই বলিয়া তাহারা নানা কথায় আপনাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই সকল কথা শুনিয়া মিহিরেরও মনে দয়া হইল। মিহির বলিলেন,—কে তোমরা মনুষ্য-রক্তের জন্য দুঃখ করিতেছ? আমি একজন মনুষ্য এই বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছি। আমার রক্তে তোমাদের যদি দুঃখ মোচন হয়, তবে আইস, আমার গাত্রের যে কোন স্থান হইতে তোমরা রক্ত লইয়া যাও।

পক্ষিদ্বয় এ কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মিহিরের যথাবৎ পরিচয় গ্রহণ করিল। পরে ভাবিল—বুঝি, বিধাতাই আজ আমাদিগকে এই বিজন বনে এরূপ একজন দয়ালু মনুষ্য মিলাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ইহার রক্ত আনিয়া আমাদের শাবক দুইটীর চক্ষু ফুটাইয়া লই।

এই ভাবিয়া তাহারা বৃক্ষের উপর হইতে নীচে আসিল। মিহির নিজ গাত্র বিদারণ করিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ রক্ত দিলেন। পক্ষিদ্বয় রক্ত লইয়া গিয়া তাহাদের শাবক দুইটীর চক্ষে লাগাইয়া দিল। চক্ষে মনুষ্যরক্ত লাগিবামাত্র শাবকদ্বয় চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ইহাতে পক্ষিদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়া মিহিরকে বলিল,—রাজকুমার! আজ তুমি আমাদের যেরূপ উপকার করিলে, এ উপকারের প্রত্যুপকার আর কি করিব? আমরা পক্ষিজাতি; আমাদের ক্ষমতাই বা কি? তবে আমাদের নিকট একখানি প্রস্তর আছে, এই প্রস্তর খানি তোমায় অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর।

মিহির বলিলেন,—তোমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছ ইহাতেই আমার সন্তোষ। আমি কোন প্রত্যুপকারের আশায় তোমাদিগকে রক্ত দান করি নাই। সুতরাং প্রস্তরে আমার প্রয়োজন নাই।

পক্ষিদ্বয় কহিল,—রাজপুত্র এ প্রস্তর আমাদের নিকট থাকায় ফল কিছুই নাই। মানব জাতিরই ইহাতে উপকার হইতে পারে। ইহার গুণ এই যে, ইহা তাম্র-লৌহাদি যে কোন ধাতু দ্রব্যে লাগাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা সুবর্ণ হইয়া যাইবে। অতএব তুমিই প্রস্তর গ্রহণের যোগ্য পাত্র; তোমাকেই আমরা অর্পণ করিলাম।

মিহির কৌতূহলী হইয়া প্রস্তরখানি গ্রহণ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—আমার অদৃষ্ট থাকিলে আমি ইহারই সাহায্যে রাজা হইয়া বসিব। কিন্তু এই প্রস্তরখানি সাবধানে রাখিতে হইবে। ইহা আমার নিকট আছে, অন্যে তাহা ঘুণাক্ষরেও না জানিতে পারে, এই ভাবেই আমার চলিতে হইবে। ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও রাখিব না; নিজের কাছে কাছেই সর্ব্বদা রাখিব। এই বলিয়া মিহির তাহা নিজের পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিলেন; উহা বরাবর তাঁহার পেট-কাপড়েই বাঁধা রহিল।

পরে রাত্রি ভোর হইল। মিহির বৃক্ষ হইতে নামিলেন এবং পক্ষীদিগের নিকট বিদায় লইয়া সেস্থান হইতে বরাবর পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন।

মিহির যাইতে যাইতে ক্রমে নিজের পিতার রাজ্য ছাড়াইলেন আর এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এ রাজ্যের রাজার নাম ভীমসিংহ। রাজা বড়ই সৎ লোক। এই রাজ্যের মধ্য দিয়া কিছুদূর গমনের পর মিহির সম্মুখে একটা নদী দেখিলেন। মস্ত নদী, নদীর পর পারেই ভীমসিংহ

রাজার রাজধানী! কিন্তু মিহির নদীর যে পারে উপস্থিত হইয়াছেন, সে পার গভীর জঙ্গলময়। মনুষ্য-সমাগমের চিহ্ন মাত্রও সেখানে নাই। মিহির ভাবিলেন,—রাজধানীর এত নিকটে এই বহু বিস্তৃত ভূভাগ অনর্থক পড়িয়া রহিয়াছে কেন? এ রাজ্যের রাজার বোধ হয়, এ দিকে তেমন খেয়াল নাই। যা হউক, আমি এই বিস্তৃত ভূখণ্ড রাজার নিকট হইতে যেমন করিয়াই হউক, কিছু কর নির্দ্ধারণ করিয়া গ্রহণ করিব; পরে এই স্থান আবাদ করাইয়া প্রজা-বিলি করিব। কালে ইহারই এক প্রান্তে আমার রাজধানী হইবে।

মিহির মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কোন ক্রমে নদী পার হইলেন। নদীর পরপার হইতেই সহরের ন্যায় সমৃদ্ধ স্থান। মিহির খানিক দূর অগ্রসর হইলেন। এক বৃদ্ধার সহিত মিহিরের আলাপ হইল। বৃদ্ধা মিহিরের রাজপুত্রবৎ আকৃতি দেখিয়া সস্নেহে নিজগৃহে লইয়া গেল। মিহির বৃদ্ধার নিকট সহরের সকল বিবরণ অবগত হইলেন।

মিহির কয়েক দিন সেই বৃদ্ধার আশ্রয়েই থাকিলেন। বৃদ্ধার পুত্র কন্যা নাই। স্বামীর সঞ্চিত সামান্য অর্থ ছিল। তাহার সাহায্যেই একরূপে বৃদ্ধার দিনপাত হয়। বৃদ্ধার বাড়ীতে তিন খানি ঘর। বৃদ্ধা মিহিরকে তাহার একখানি ঘর ছাড়িয়া দিলেন। মিহির সেই ঘরেই একাকী বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন গোপনে বৃদ্ধার একটী লৌহপাত্রে মিহির তাঁহার সেই প্রস্তর-খণ্ড স্পর্শ করাইলেন। দেখিলেন,—সত্য সত্যই তাহা সুবর্ণ হইয়া গেল। মিহির সেই পাত্রটী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গোপনে সহরের কোন স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া আসিলেন। নিজের কাছে এবার বহু অর্থ হইল। তিনি অর্থ দ্বারা নিজের কয়েকটী উত্তম পরিচ্ছদ ও আসবাব-

পত্রাদি কিনিয়া লইলেন এবং বৃদ্ধাকেও রীতিমত অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা ভাবিল,—এ রাজপুত্রই বটে ; নিশ্চয় কোন কারণে বিবাগী হইয়া বিদেশে আসিয়াছে। ইহার অর্থের অভাব হইতেই পারে না। এ ব্যক্তি যদি এই সহরেই বাড়ী ঘর করিয়া থাকে, তবে অন্তিমে আমার একটা সম্বল হয়। আমি উহাকে সেই পরামর্শ ই দিব।

বৃদ্ধা এই ভাবিয়া একদিন মিহিরকে বলিল,—দেখ মিহির, আকারে প্রকারে তোমাকে একজন রাজপুত্র বলিয়াই আমার অনুমান হয়। অনুমান কি, নিশ্চয়ই তুমি রাজপুত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এ অবস্থায় কষ্ট করিয়া থাকা তোমার শোভা পায় না। তুমি এক কাজ কর, যদি এ সহর তোমার পছন্দ হইয়া থাকে, তবে এইখানেই উপযুক্ত বাস-ভবনাদি প্রস্তুত করিয়া বাস কর।

মিহির বলিলেন,—আমি এই প্রদেশেই বাস করিব বটে ; কিন্তু এ সহরে নয়। ঐ যে নদীর পরপারে জঙ্গলময় বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, ঐখানে আমি নূতন সহর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিব। এইরূপই ইচ্ছা করিয়াছি।

বৃদ্ধা বলিল,—তোমার ভাগ্যের কথা বলিতে পারি না ; কিন্তু ঐ স্থান লইয়া কাহারও সুসার হয় নাই। রাজা নিজে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন, তবু ঐ স্থান আবাদ করাইয়া লোকের বাসোপযোগী করিতে পারেন নাই। কাজেই ঐ স্থান জন-মানব-বর্জ্জিত হইয়া পতিত আছে। বহু ধনীর বহুধন ওখানে নষ্ট হইয়াছে।

মিহির বলিলেন,—আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব। দেখি, সুফল লাভ হয় কিনা ?

বৃদ্ধা বলিল,—তুমি বসবাস করিবে বলিয়া চাহিলে রাজা হয়ত ঐস্থান তোমায় নিষ্করও দিতে পারেন। হয়ত রাজার লোক-জনেরও তুমি সাহায্য পাইতে পার।

সেই দিন গেল। পরদিন মিহির সুসজ্জিত-বেশে রাজদরবারে গমন করিলেন। মিহিরের আকৃতি দেখিয়া রাজার দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে মিহিরের উপর পতিত হইল।

মিহির রাজার ইঙ্গিতে নিকটে গেলেন এবং বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া আপনার মনোগত অভিপ্রায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন. বলিলেন,—রাজন্! আপনার এই রাজধানীর প্রান্তবাহিনী নদীর পরপারে যে জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড আছে, আমি উহা আবাদ করিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করি। আপনি কিঞ্চিৎ কর লইয়া আমাকে উহা অর্পণ করুন।

রাজা বলিলেন,—ঐ নদীর নাম ভীমা। ভীমা নদীর তীরস্থিত অমন দুর্গম স্থানে অত কষ্ট করিয়া বসবাস করিবার প্রয়োজন কি, তুমি আমার এই বিপুল রাজধানীরই কোন স্থানে বাস কর। আমি তোমার সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছি।

মিহির বলিলেন,—মহারাজ! ঐ স্থানটীই আমার পছন্দ হইয়াছে। অনুমতি করুন, আমি ঐখানেই গিয়া বাসভবনাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকি।

রাজা বলিলেন,—তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাই কর। আমি তোমার বাসের জন্য ঐ স্থান নিষ্কর করিয়া দিলাম।

মিহির রাজাদেশে উৎফুল্ল হইয়া পুনরায় সেই বৃদ্ধার আলয়ে আগমন করিলেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বাজার হইতে বহু তাম্র লৌহ ও পিত্তলাদি কিনিয়া সেই প্রস্তর-সাহায্যে রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন এবং

পর দিন ঢোল-সহরতে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন,—যাহারা ভীমা নদীর পরপারস্থ ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড আবাদ করিয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া দিতে পারিবে, তাঁহারা প্রত্যেকে দৈনিক এক এক ভরি সুবর্ণ পারিশ্রমিক পাইবে, আর তাহাদের দলপতিরা প্রত্যেকে দুইভরি করিয়া পাইবে।

এইরূপ ঢোল-সহরত হইবামাত্র স্বর্ণ প্রাপ্তির আশায় বহু সহস্র লোক কার্য্যার্থী হইয়া আসিল। মিহির তাহাদিগকে নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করি-লেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই স্থান পরিস্কৃত ও বাসযোগ্য হইল। মিহির প্রতিশ্রুত অর্থ দানে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া এইবার অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণের জন্য অন্যবিধ লোক নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মনোমত অট্টালিকা উপবন রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। মিহির কতিপয় পার্শ্বচর সংগ্রহ করিয়া এস্থান হইতে সেইখানেই গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে আরও নানাশ্রেণীর লোক আসিয়া মিহিরের সেই বিস্তৃত সম্পত্তি মধ্যে বাড়ী ঘর করিয়া বাস করিতে লাগিল। মিহির তাহাদের রাজা হইয়া রহিলেন। মিহিরের আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধাকে মিহির আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এরূপ অর্থ সংস্থান করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে সেই দেশের রাজা ভীমসিংহের একমাত্র পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত মিহিরের বিবাহ হইল। মিহির মহাসুখে পত্নীর সহিত নিজের নব-নির্ম্মিত রম্য ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। মিহিরের উদ্যান-উপবনাদি-শোভিত রমণীয় অন্তঃপুরে মাত্র তিন চারিটী পরিচারিকা স্থান পাইল। যুবতী মিহিরপত্নী সেই সকল সহচরীর সহিত মনের সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

মিহির পক্ষীদিগের নিকট সেই যে প্রস্তর পাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে ক্রমে তিনি কুবেরের ন্যায় অর্থশালী হইলেন। অর্থবলে বহুদেশ তাঁহার করায়ত্ত হইল। তিনি সেই সকল দেশের রাজা হইয়া বসিলেন। মিহিরের এখন আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। তিনি এখন রাজা। তাঁহার লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া, রথ-সারথি, সভা-দরবার সকলই হইল। অন্তঃপুর হইতে কিয়দ্দূরে তাঁহার রাজসভাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টাকাল তিনি রাজদরবারে বসিতেন; অবশিষ্ট সময় অন্তঃপুরে পত্নীর সহিত মহাসুখে কাটাইতেন।

মিহির রাজা হইয়াছিলেন; ইচ্ছা করিলে তিনি বহু পত্নী সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই। কারণ, মিহির যে রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিই তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। মিহিরপত্নীর নাম ছিল—ইন্দুবালা। ধ্যানে জ্ঞানে মনে ইন্দুবালাকেই মিহির পৃথিবীর সার বস্তু বুঝিয়াছিলেন। মিহিরের মনে হইয়াছিল,—ইন্দুবালার ন্যায় সুন্দরী,—ইন্দুবালার ন্যায় বিদুষী,—ইন্দুবালার ন্যায় গুণবতী, জগতে আর নাই। তাই সর্ব্বদাই তিনি তদেকপ্রাণ হইয়া তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

এদিকে ইন্দুবালাও পতিগত-প্রাণে পতিপাদ-পদ্মই সংসারের সার মনে করিয়াছিলেন। পতিধ্যান—পতিজ্ঞান,—পতি-মনোরথই তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখশান্তির চরম পথ হইয়াছিল। পতি মিহিরকে না দেখিয়া পত্নী ইন্দুবালা অধিকক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেন না; মিহিরও ইন্দুবালাকে না দেখিয়া অধিক সময় অন্যত্র থাকিতে অস্বস্তি বোধ করিতেন; তাই মিহির রাজদরবারে মাত্র দুই ঘণ্টাকাল কাটাইতেন। এই ভাবে পাঁচ্পাঁচায় তিনটী বৎসর মহাসুখে কাটিল। চতুর্থ বৎসরে

তাঁহাদের এই মিলনসুখে বিয়োগদুঃখ ঘটিল। সংসারে চিরসুখ কাহারও নাই, ইহাই সকলে বুঝিল।

একদিন বৈশাখ মাসের প্রাতঃকাল। ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একখানি সদাগরী জাহাজ ভীমা নদীর মধ্য দিয়া মিহির-নগরের নিকটে আসিয়া পৌছিল। যে সদাগর এই জাহাজের মালিক, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য অতুলনীয়; লোকে তাঁহাকে লক্ষপতি বলিয়া ডাকিত। লক্ষপতি বিদেশ হইতে বহুবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া নিজদেশে গমন করিতেছেন। অদ্য ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে এক নূতন নগর দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন; ভাবিলেন,—এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ছিল। আমি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই পথ দিয়াই বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম, তখনও এই স্থান ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। হঠাৎ কে আসিয়া এখানে রাজার ন্যায় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল? এখানকার জঙ্গল বহুদূরব্যাপী ছিল; সে সব এখন আর নাই দেখিতেছি। সর্ব্বত্রই লোক-জনের বসবাস হইয়াছে। যা' হউক, এ স্থানের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া দেশে যাইতেছি না।

এই ভাবিয়া সদাগর, নদীর একপার্শ্বে জাহাজ নঙ্গর করিবার হুকুম দিলেন। সদাগরের হুকুম মাত্র নাবিকেরা জাহাজ নঙ্গর করিল।

জাহাজ নঙ্গর করিবার পর সদাগর তীরে নামিলেন। নূতন সহরে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে দেখিলেন, একটী সুন্দর সাজানো-গোছান ঘরে বসিয়া এক বৃদ্ধ দর্জ্জী একান্তমনে সূচীশিল্প-কার্য্যে নিবিষ্ট আছে। দর্জ্জীর হস্তে এক রত্নখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ; সে পরিচ্ছদের চাক্‌চিক্য অতি চমকপ্রদ। সদাগর পরিচ্ছদটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্যই দর্জ্জীর অতি নিকটে গেলেন। দর্জ্জী সদাগরের আকৃতি-দর্শনে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ লোক

মনে করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একটী দীর্ঘ সেলাম করিয়া স্বীয় বিনীত ভাব জানাইল। সদাগর দর্জ্জীর নিকট পরিচ্ছদটীর মূল্য জানিতে চাহিলেন। দর্জ্জী বিনীত উত্তরে কহিল,—মহাশয়! ইহার কাজ কম্ম এখনও শেষ হয় নাই। সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে তখন উহার মূল্য অনেক হইয়া দাঁড়াইবে।

সদাগর জিজ্ঞাসিলেন,—এ পরিচ্ছদটী কি তুমি বিক্রয় করিবে?

দর্জ্জী। আজ্ঞে না, এটী রাজবাড়ীর ফরমাইস্।

এরূপ কথাবার্ত্তায় ক্রমে দর্জ্জীর সহিত সদাগরের বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় হইল। দর্জ্জী কথায় কথায় সদাগরের নিকট নূতন সহর সৃষ্টির আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল। সদাগর কৌতূহলের সহিত আগাগোড়া সকল ব্যাপারই শুনিতে লাগিলেন। দর্জ্জী কথাশেষে কহিল, —আমাদের রাজা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই রাজকন্যাকে লইয়াই তিনি প্রায় সময় অতিবাহিত করেন; রাজকার্য্য দিনের মধ্যে মাত্র দুই ঘণ্টাকাল করিয়া থাকেন।

সদাগর। আচ্ছা, এই রাজকন্যার পিতার নাম কি ভীমসিংহ?

দর্জ্জী। আজ্ঞে হাঁ। এই নদীর অপর পারেই তাঁহার রাজধানী।

সদাগর। তুমি সেই রাজকন্যাকে দেখিয়াছ কি? তাঁহার নাম কি, বলিতে পার?

দর্জ্জী। আমি দেখি নাই; তবে শুনিয়াছি যে, সেরূপ রূপসী নাকি দুনিয়ায় আর নাই! রাজকন্যার নাম ইন্দুবালা।

সদাগর। শোনা কথায় প্রত্যয় করা যায় কি? রাজকন্যা কি যথার্থই সুন্দরী?

দর্জ্জী। আমি কেবল মানুষের মুখে শুনি নাই। আমার এক সিদ্ধ

পরী আছে, আমি তাহার মুখেও শুনিয়াছি। পরী স্বচক্ষে দেখিয়া আমায় বলিয়াছে।

এই কথার পর সদাগর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার অন্তরে কি যেন এক পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। একটু কাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ দর্জ্জীর হাত দুইটী চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—বৃদ্ধ, এ সহরে তোমার সহিতই আমার প্রথম পরিচয়। এ বিদেশে তুমিই আমার বন্ধু। আমি একজন সদাগর বহু কোটী রত্নের মালিক; কিন্তু শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন-লাভ এখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তোমার নিকট আমি বন্ধুভাবেই নিজ দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিতেছি। তুমি সকল বিবরণ শুনিয়া যদি আমার কিছু সাহায্য কর, তা'হ'লেই এতদিনের বাসনা আমার পূর্ণ হইতে পারে।

দর্জ্জী। আমি বৃদ্ধ দরিদ্র, আপনার আমি কি সাহায্য করিব? আপনি ধনী লোক, ইচ্ছা করিলে, অনেক সুন্দরীরই পাণি পীড়ন করিতে পারেন। আপনার বয়স বোধ হয়, পঁচিশ পার হইয়াছে। আপনি এত দিন বিবাহ করেনই বা নাই কেন?

সদাগর। তুমি দরিদ্র, তোমার দারিদ্র্য অবশ্যই আমি ঘুচাইয়া দিব। কিন্তু আমার অনুরোধটী তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি এমন কিছু বলিব না, যাহা তোমার সাধ্যাতীত হইবে।

দর্জ্জী দরিদ্রতা ঘুচিবার কথা শুনিয়া আশান্বিত ও পুলকিত হইল। সে এবার আগ্রহের সহিত কহিল,—মহাশয়, আমাকে কি অনুরোধ করিতেছেন, আমার শক্তি থাকে, অবশ্যই আমি তাহা করিব।

সদাগর। দর্জ্জী শোনো, তোমার নিকট আমার মনের কথা বলি। আমার বয়স যখন পঞ্চদশ বর্ষ, তখন আমার বিবাহের আয়োজন হয়।

আমার পিতা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আমার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করেন। এক সুন্দরী পাত্রী নির্ব্বাচিত হয়। কিন্তু তখন একদিন রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় আমি এক রূপসী ললনারত্ন দেখিতে পাই। দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু পরক্ষণেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেই রূপসীও অন্তর্হিত হয়। সেই হইতে তারপর কত চেষ্টা করিলাম, কত দেশ ঘুরিলাম, তেমন সুন্দরী আর দেখিতে পাইলাম না। আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, সেরূপ রূপসী না হইলে আমি আর বিবাহ করিব না। আমার সহিত যে সুন্দরীর বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছিল, স্বপ্নদৃষ্ট সুন্দরীর তুলনায় তাহার সৌন্দর্য্য অকিঞ্চিৎকর; তাই আমি তাহাকে বিবাহ করিলাম না। সেই হইতে আমি অবিবাহিতই আছি। আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা—আমি যখন শেষ বারে এই ভীমা নদীর মধ্য দিয়াই আমার বাণিজ্য পোত লইয়া বিদেশ যাত্রা করি, তখন ইহারই অপর পারপারস্থিত বন্দরে বাণিজ্যপোত নঙ্গর করিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সেই সময় একদিন এক চিত্রকরের দোকানে আমি এক সুন্দরীর চিত্রপট দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদে জানিতে পারিলাম, সেই চিত্র— এই দেশেরই রাজকন্যার। রাজকন্যার নাম ইন্দুবালা। ইন্দুবালার চিত্র দেখিয়া আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট সুন্দরীর বহু সৌসাদৃশ্য মনে পড়িল। আমি একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তখনই মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম, —আমার এ ব্যাকুলতা বৃথা; কারণ আমার শত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও আমি বৈশ্য,—ক্ষত্রিয় রাজা আমার করে কিছুতেই কন্যাদান করিবে না। তবে যদি কোন অলৌকিক ঘটনায় ইহাকে আয়ত্ত করিতে পারি, তা হ'লেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে। এই ভাবিয়া আমি সে যাত্রা চলিয়া যাই।

এক্ষণে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। নূতন সহর দেখিয়া এখানে অবতরণ করিয়াছি; ভাগ্যে তোমার সহিত আলাপ হইল, আলাপে জানিতে পারিলাম,—সেই রাজকন্যা ইন্দুবালাই তোমাদের রাজপত্নী হইয়াছেন এবং একটা অলৌকিক সাধনায় তোমারও হাত আছে।

এই বলিয়া সদাগর দর্জ্জীর হাত ধরিয়া কহিল,—শুনিলে বন্ধু,—আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত? এক্ষণে তোমার নিকট আমার অনুরোধ—তুমি তোমার সিদ্ধ পরীর সাহায্যে এই রাজপত্নীকে আমার করায়ত্ত করিয়া দাও। এই কর্ম্মের জন্য তোমাকে আমি লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিব।

দর্জ্জী এই কথা শুনিয়া প্রথমে শিহরিয়া উঠিল, এমন কি স্পষ্ট অসম্মতিই জানাইল; কিন্তু শেষে সদাগরের অতি নির্ব্বন্ধে লক্ষ টাকার প্রলোভনে তাহাকে স্বীকার পাইতে হইল। দর্জ্জী বলিল,—আচ্ছা, আমি একবার পরীর নিকট জিজ্ঞাসা করি; পরী কি বলে, আগামী কল্য আপনাকে তাহা বলিব।

সদাগর এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন। দর্জ্জী রাত্রিকালে তাহার সিদ্ধ পরীকে আহ্বান করিল, এবং সদাগর-সম্বন্ধীয় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। পরী সে কথা শুনিয়া উত্তর করিল—তুমি বহুকাল হইতে আমার সাধনা করিয়া আসিতেছ, তোমার উপকারের জন্য আমি এ কাজ করিতে পারি বটে; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী কথা আছে।

দর্জ্জী। কি কথা?

পরী। কথা এই,—আমি তোমার অনুরোধে রাজপত্নী ইন্দুবালাকে সদাগরের শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিতে পারিব, কিন্তু সদাগর ইন্দুবালার অসম্মতিতে জোর করিয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিবে না।

সেরূপ করিবার উপক্রম করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লইয়া আসিব। এই বলিয়া পরী বিদায় হইল।

দর্জ্জী পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে পরীর নিকট যাহা শুনিয়া রাখিল, পরদিন সদাগর নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিলে, সে তাহা সদাগরকে বলিল। সদাগর ঐ কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন,—এ আর অসুবিধার কথা কি? আমার ঐশ্বর্য্য—আমার সৌন্দর্য্য একবার দেখিলে, যে রমণীই হউন, আমাতে অনুরক্ত হইতেই হইবে। তা' পরী যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাতেই স্বীকার পাই। এই ভাবিয়া সদাগর পরীর কথায় সম্মত হইয়া সে দিন সন্ধ্যাকালে জাহাজে ফিরিয়া আসিলেন।

সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে দর্জ্জীর অনুরোধে পরী ইন্দুবালাকে নিদ্রিতাবস্থায় সদাগরের জাহাজের নিভৃত কক্ষে রাখিয়া আসিল। দর্জ্জী যথাকালে জাহাজেই ছিল। সদাগরের কার্য্যোদ্ধার হইলে, সে লক্ষ টাকার স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া সদাগরের নিকট বিদায় লইল। কেহই কিছু জানিতে পারিল না; নীরবে নিভৃতে সদাগর কার্য্যোদ্ধার করিয়া সেই নিশীথেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজ এইবার বরাবর সদাগরের দেশাভিমুখে চলিল।

এদিকে নিশাবসানেই মিহিরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মিহির চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—গৃহে ইন্দুবালা নাই; ভাবিলেন,—ইন্দুবালা প্রত্যহ প্রত্যূষে আমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করেন, আজও বুঝি তাহাই করিয়াছেন।

কিন্তু এ ভাবনায় মিহির বেশীক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে সময় অতীত হইতে লাগিল, মিহিরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়িল।

সন্ধান করিলেন,—উদ্যানে,

অঙ্গনে, সরসীতীরে, ক্রীড়াগৃহে, দেবালয়ে, স্নানাগারে ও অন্য নানাস্থানে স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার দেখিলেন, কিন্তু কোথাও ইন্দুবালাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন পরিচারিকাগণ এবং আরও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর দ্বারা অপর অনেক স্থান সন্ধান করাইলেন; তাহাতেও কোনই ফল হইল না; ইন্দুবালা কোথায়, কেহই তাহার সংবাদ জানিতে পারিল না।

মিহির এইবার প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। ইন্দুবালার বিরহে তিনি পৃথিবী শূন্যময় দেখিলেন। তাঁহার রাজ্যৈশ্বর্য্য সমস্তই অকিঞ্চৎকর মনে হইতে লাগিল। কি করিবেন, কোথায় গেলে ইন্দুবালার দর্শন পাইবেন, ইহাই কেবল তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিলেন,—অন্য দ্বারা কাজ হইবে না, আমি নিজেই প্রিয়তমার সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। যদি ইন্দুবালার সাক্ষাৎ পাই, তবেই প্রাণ রাখিব;—নচেৎ রাজ্যে আর ফিরিব না; তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতেই প্রাণপাত করিব।

মিহির মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া রাজ-কার্য্যের যাবতীয় ভার অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ংই ইন্দুবালার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

মিহির বেশভূষা বা ধনরত্নাদি কিছুই সঙ্গে লইলেন না, মাত্র এক বস্ত্র ও এক উত্তরীয় লইয়া রাত্রিযোগে রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার সংসার-সুখৈশ্বর্য্যের মূল—সেই প্রস্তরখানির কথা মনে পড়িল। তিনি তাহা সাবধানে নিজের পেট-কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

রাজপুরী হইতে বাহির হইয়া মিহির ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখেই চলিলেন। তাঁহার মনে কেমন বিশ্বাস হইয়াছিল—নিশ্চয়ই কেহ ইন্দু-বালাকে ছলে কৌশলে অপহরণ করিয়াছে, আর সেই অপহর্ত্তা ব্যক্তি পশ্চিম দিকেই গিয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসের বলেই মিহির অনবরত পশ্চিম দিকেই যাইতে লাগিলেন। বনের ফলমূল ও নদীজলে মিহিরের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারিত হইতে লাগিল। মিহির নানারাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে ম্লেচ্ছদেশে উপনীত হইলেন।

মিহির এখন যে দেশে আসিলেন, সে দেশের লোক ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝে না। ছলে বলে কৌশলে পথিকের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আত্মোদর পূরণ করাই ইহাদের প্রধান কাজ। এ দেশে কেহ পাপ করিলেও তাহার শাসন নাই; অন্যায় অবিচার ব্যভিচার এদেশের নিত্য ঘটনা। এইজন্য এ দেশ অধর্ম্ম দেশ বা ম্লেচ্ছদেশ নামেই অভিহিত।

মিহির এই অধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইলেন। মিহিরের সঙ্গে যে বহুমূল্য বস্তু আছে, তাহা এ দেশের সাধারণ লোক তাঁহার আকার ও পরিচ্ছদাদি দেখিয়া স্থির করিতে পরিল না। মিহির বিনাবাধায় নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যা আগতপ্রায়; মিহির একটা নগরের মধ্যস্থ গলি পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় একটা অর্দ্ধ ভগ্ন দ্বিতল বাড়ীর বারান্দা হইতে কে এক বৃদ্ধ পরিচিত ব্যক্তির ন্যায় হঠাৎ পশ্চাৎদিক হইতে মিহিরকে ডাকিল,—রাজপুত্র, রাজপুত্র, মিহির, মিহির! ফেরো, ফেরো; এইখানে এস।

মিহির পশ্চাতে মস্তক ফিরাইয়া সবিস্ময়ে তাকাইলেন। বৃদ্ধ বারান্দা হইতে হস্ত সঙ্কেতে মিহিরকে ডাকিতে লাগিল। মিহির ভাবিলেন,—এ

দূর দেশে কে আমার পরিচিত? অথচ এ বৃদ্ধ আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে! যাহা হউক, নিকটে গিয়া সবিশেষ তথ্য অবগত হইয়া যাই। এই ভাবিয়া মিহির বৃদ্ধের নিকট গমন করিলেন।

পাঠক! এই স্থানে এই নগরের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইউন। অধর্ম্ম রাজ্য বা ম্লেচ্ছদেশের মধ্যে এই নগরই প্রধান। জাল, জুয়াচুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, অন্যায়, অনাচার, নানা উপায়ে পথিকের অর্থিক তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার প্রাণসংহার—এই সকল গর্হিত কার্য্যের এই নগরই শ্রেষ্ঠ স্থান। এখানে পথিকের প্রাণনাশের একটা প্রধান আড্ডা আছে। এক সুন্দরী বলিষ্ঠা যুবতী সেই আড্ডার কর্ত্রী। যুবতীর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। এ যুবতী নিজ কপালে হাত দিয়া অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানিতে পারিত। এই জন্য দেশের লোক ইহাকে 'কপালগন্তা' বলিয়া ডাকিত। 'কপালগন্তা' কপালে হাত দিয়া গণিয়া দেখিত, আর তাহার কতিপয় বলিষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিত। এই উপায়ে সে প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছিল। বিবাহে তাহার রুচি ছিল না; আজন্ম নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে করিতে সে এই ভাবেই জীবন কাটাইতে ভালবাসিয়াছিল। রৌদ্র রস ছাড়া আর কোন রসই তাহার অন্তরে স্থান পাইত না।

এই যে এক্ষণে একটা অর্দ্ধভগ্ন দ্বিতল বাড়ী হইতে এক বৃদ্ধ মিহিরকে ডাকিয়া আনিল। এই বৃদ্ধও ঐ 'কপালগন্তা'রই লোক। বৃদ্ধের একটা পাখী ছিল, পাখীটা বৃদ্ধের বাড়ীর নিকট দিয়া যত পথিক যাইত, তাহাদের নাম এবং তাহাদের কাছে গোপনে ধন-রত্নাদি থাকিলে তাহা বলিয়া দিতে পারিত। বৃদ্ধ পাখীর কথানুসারে পথিককে ডাকিয়া কলে, কৌশলে বা প্রলোভনে 'কপালগন্তা'র নিকট পাঠাইয়া দিত। সেখানে 'কপালগন্তা'

তাহার ভ্রাতৃগণের সাহায্যে পথিকের প্রাণ সংহার করিয়া গুপ্তরত্নাদি গ্রহণ করিত। বৃদ্ধ সামর্থ্যহীন বলিয়াই 'কপালগন্তা'র নিকট হইতে এই উপায়ে অপহৃত অর্থের অংশ গ্রহণ করিত। বৃদ্ধের আরও একটা গুণ ছিল, সে নানা ভাষায় কথা কহিতে পারিত। বৃদ্ধ মিহিরের বোধ্য ভাষাতেই মিহিরকে আহ্বান করিয়াছিল।

মিহির বৃদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ যেন কত পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিল,—আচ্ছা, মিহির! তুমি রাজপুত্র, আমি তোমার সমস্ত সংবাদই জানি। তুমি মনের কষ্টে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ। একটী কপর্দ্দকও তোমার সঙ্গে নাই। ইহা বড়ই কষ্টের কথা। যা' হউক, আমি তোমার পিতৃবন্ধু, এ দূর দেশে তোমার কিছু উপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব এ রাত্রি তুমি এইখানে থাক।

মিহিরের মন সর্ব্বদাই ইন্দুবালার জন্য উৎকণ্ঠিত; সুতরাং নিজেকে কেহ আদর করিল বা যত্ন করিল, সেদিকে তাঁহার মন নাই। তিনি নিজের সুখ বা অশন-শয়নের জন্যও লালায়িত নহেন। সুতরাং বৃদ্ধের আশ্বাসনায় মিহির বড় একটা আপ্যায়িত হইলেন না। তিনি ঔদাস্যের সহিত বলিলেন,—না এখানে আর থাকিয়া কি হইবে? আমি যাই, রাত্রিভ্রমণে আমার কোনই কষ্ট নাই।

বৃদ্ধ। সে কি রাজপুত্র,' এ রাত্রিকালে তুমি কোথায় যাইবে?

মিহির। আমি প্রিয়াবিরহে উৎকণ্ঠিত, আমার গমনে বাধা দিবেন না; ভ্রমণেই আমার শান্তি।

বৃদ্ধ। রাজপুত্র! একান্তই যদি যাইবে, তবে তোমার কিঞ্চিৎ আর্থিক উপকার করিতেছি। তুমি অর্থ সাহায্যে অনেক কাজ করিতে

পারিবে। আমি তোমায় একখানি পত্র দিতেছি, তুমি এই ঠিকানা গিয়া এই পত্র খানি দেখাইলেই পাঁচশত সুবর্ণ মুদ্রা পাইবে। পথভ্রমণে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। আমার অনুরোধ—তুমি এই অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা তোমার উপকার হইবে। তোমার উপকারেই আমার সুখ; কেননা, আমি তোমার পিতৃবন্ধু।

মিহির অন্যমনস্কের ন্যায় বলিলেন,—আচ্ছা, তবে পত্র দিন। মিহিরের কথায় আহ্লাদিত হইয়া বৃদ্ধ তাহার দেশের ভাষায় মিহিরের হস্তে একখানি পত্র লিখিয়া দিল। পত্রের মর্ম্ম এই যে, ভগিনী 'কপালগন্ধা' এই এক পথিককে পাঠাইলাম, ইহার নিকট এক বহুমূল্য প্রস্তর আছে, সুতরাং পথিক যাইবামাত্র ইহার প্রাণসংহার করিবে।

মিহির পত্র লইয়া বৃদ্ধের বাটী হইতে বাহির হইলেন। পত্রে কি লেখা আছে, তাহা তিনি খুলিয়া দেখিলেন না, আর যদিও দেখিতেন, তথাচ সে দুর্ব্বোধ্য ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। মিহির পত্রহস্তে অন্যমনস্কভাবে গলি পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ক্ষীণ সৌরালোক এখনও বৃক্ষাগ্রে দেখা যাইতেছিল। এই সময় এক লোলচর্ম্ম কম্পিতযষ্টি দরিদ্র বৃদ্ধ মিহিরের সম্মুখ দিক্ হইতে আসিল। সে মিহিরকে দেখিয়া হাত পাতিয়া একটী পয়সা ভিক্ষা করিল। মিহির দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সেই পত্রখানি প্রদান করিলেন; বলিয়া দিলেন,—এই পত্রলিখিত ঠিকানায় তুমি গিয়া পত্র দাও, এখনই পাঁচশত সুবর্ণমুদ্রা পাইয়া যাইবে। বৃদ্ধ আহ্লাদিত হইয়া মিহিরকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এদিকে মিহির সন্ধ্যা হইতে না হইতেই নগরের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষমূলে এক সাধুকে উপবিষ্ট দেখিলেন। সাধুর

বিভূতিভূষিত গাত্র, জটামণ্ডিত মস্তক, কৌপীনমাত্র পরিধান, সৌম্য শান্ত দেহশ্রী,—দেখিয়াই মিহিরের ভক্তির উদ্রেক হইল। মিহির যুক্তকরে সবিনয়ে তাঁহার শরণ লইলেন এবং নিজের মনোদুঃখ-নাশের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সাধু তাঁহাকে আশ্বাসনা দিয়া কহিলেন,—বৎস! তোমার দুঃখের প্রায় অবসান হইয়াছে। অচিরেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। এই অধর্ম্ম রাজ্যের সংস্রব কাটাইয়া পরবর্ত্তী রাজ্যে গমন করিলেই কিয়দ্দিন পরে তোমার প্রিয়জন লাভ হইবে। এক বণিক্ তোমার প্রিয়তমাকে কৌশলে হরণ করিয়াছে; কিন্তু সে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে নাই। পতিব্রতা নিজ চরিত্র ও বুদ্ধি বলেই আপন পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু অদ্যকার রাত্রি তোমার পক্ষে বড়ই ভীষণ। অদ্য তোমাকে ধরিয়া তোমার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তোমার গুপ্ত প্রস্তর খণ্ড লইবার জন্য 'কপালগন্তা'র ভ্রাতারা তোমার অনুসরণ করিবে। 'কপালগন্তা' এ দেশে নারীরূপে রাক্ষসী। তুমি সাবধানে এখনই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। এই লও, তোমায় চারিটী বটী প্রদান করিতেছি, তুমি প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ইহা মুখের ভিতর রাখিবে; তাহা হইলেই এক একবারে এক একরূপ ধারণ করিয়া—যাইতে যাইতে এ অধর্ম্ম রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে। আমি এখনই অন্তর্হিত হইব। তুমিও এখনই দ্রুতপদে প্রস্থান কর।

মিহির সাধুর কথা শেষ হইলেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শঙ্কিত অথচ সাধুর উপদিষ্ট উপায়ে নিশ্চিন্ত হইয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিলেন। এইবার সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি আসিল। বিশাল প্রান্তর পার হইতে হইবে, প্রায় সমস্ত রাত্রি পথ চলিলে, তবে প্রান্তর পার হইয়া নিরাপদ স্থানে

পৌঁছান যাইবে। মিহির অতি দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন, আর মনে মনে সাধুর করুণার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ভাবিলেন,—উনি সাধু নহেন,—দেবতা !

এদিকে সেই যে দরিদ্র বৃদ্ধ মিহিরের নিকট হইতে পত্র লইয়া গিয়াছিল, সে গিয়া সেই পত্রখানি 'কপালগন্তা'র এক ভ্রাতার নিকট দিল। ভ্রাতা পত্রখানি ভগ্নীর হস্তে অর্পণ করিল। পত্র পাঠান্তে ভগ্নীর আদেশে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বৃদ্ধ বধ্যভূমে নীত হইল। বৃদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া প্রাণভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে 'কপালগন্তা' ও তাহার অন্যান্য ভ্রাতা বধ্যভূমে আসিল। 'কপালগন্তা' আসিয়াই বধ্য ব্যক্তিকে দেখিয়া সহসা নিজ কপালে হস্তার্পণ করিল। কপালে হস্ত দিয়াই ব্যস্ত হইয়া ঘাতক ভ্রাতাকে নিবারণ করিল এবং কহিল,—এ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও ; প্রস্তর-খণ্ড ইহার কাছে নাই। সে মহামূল্য বস্তু যাহার কাছে আছে, সে ব্যক্তি নির্ভয়ে নগর প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছে ; সে এক রাজার পুত্র ; তোরা শীঘ্র গিয়া তাহাকে ধরিয়া আন।

বলিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ভগ্নীর আদেশে তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া অশ্বারোহণে দ্রুতগতি প্রান্তরের দিকে চলিল। মিহির দূরে অশ্বপদ শব্দ শ্রবণ করিয়া সাধুদত্ত একটী বটী মুখ মধ্যে অর্পণ করিলেন। বটীর গুণে তৎক্ষণাৎ তিনি এক জটাজূটধারী সন্ন্যাসী হইলেন। 'কপালগন্তা'র ভ্রাতাগণ আসিয়া দেখিল,—এক কৌপীনধারী সন্ন্যাসী যাইতেছে, তদ্দর্শনে তাহারা ফিরিয়া পুনরায় ভগ্নীর নিকট গেল এবং পথে রাজপুত্র নয়,—সন্ন্যাসী যাইতেছে, এই কথা গিয়া ভগ্নীকে বলিল।

ভগ্নী তৎক্ষণাৎ নিজ কপালে হস্ত দিয়া কহিল,—ওরে সেই সন্ন্যাসীই রাজপুত্র ; তোরা শীঘ্র গিয়া তাহাকে ধরিয়া আন।

ভ্রাতৃগণ আবার অশ্বারোহণে ছুটিল। এদিকে মিহিরও দুই ঘণ্টা পথ চলিয়া আর একটী বটী মুখে দিলেন। এবার তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিলেন।

'কপালগন্ডা'র ভ্রাতাগণ আবার আসিল, কিন্তু সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল না; দেখিল—এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছে। ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়া ভগ্নীর নিকট বলিল।

ভগ্নী কপালে হাত দিয়া কহিল,—ওরে সেই ব্রাহ্মণই রাজপুত্র, তোরা শীঘ্র গিয়া তাহাকেই ধরিয়া আন্।

ভ্রাতৃগণ আবার অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে চলিল। এদিকে মিহির যথাকালে আর একটী বটী মুখে দিলেন। বটীর গুণে এবার তিনি এক প্রচণ্ডাকৃতি চণ্ডাল হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। 'কপালগন্ডা'র ভ্রাতাগণ আসিয়া দেখিল—ব্রাহ্মণ নয়, এক বলিষ্ঠ চণ্ডাল যাইতেছে। চণ্ডাল দেখিয়া তাহারা ভগ্নীর নিকট ফিরিয়া গেল। 'কপালগন্ডা' এবার ভ্রাতৃগণকে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কপালে হাত দিয়া কহিল,—চল্ এবার আমি নিজেই অশ্বারোহণে যাইব।

এই বলিয়া 'কপালগন্ডা' নিজেই ভ্রাতৃগণ সহ অশ্বারোহণে ছুটিল। এদিকে মিহির এই শেষবার ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া শেষ বটীটি মুখে দিলেন। বটীর গুণে এবার তিনি নিজ রূপ ধারণ করিলেন এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দৌড়িয়া রাত্রি ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিশাল প্রান্তর পার হইলেন।

এদিকে 'কপালগন্ডা'ও ভ্রাতৃগণ সহ ছুটিয়া ছুটিয়া মিহিরের প্রায় পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রান্তর সীমায় পররাজ্যের রাজার এক প্রমোদ-বাটিকা ছিল। মিহির হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই বাটীর

দরজায় গিয়া পড়িলেন। 'কপালগন্তা'ও দলবল সহ পরমুহূর্ত্তেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মিহির চীৎকার করিয়া কহিলেন,—কে আছ হেথায়, আমায় রক্ষা কর।

মিহিরের চীৎকারে কতিপয় প্রহরী মিহিরের নিকটে আসিল এবং ভূপতিত মিহিরকে ধরিয়া বাটীর এক কক্ষমধ্যে লইয়া গেল।

প্রহরীরা মিহিরকে লইয়া যাইবার সময় 'কপালগন্তা' চীৎকার করিয়া বলিল,—দোহাই মহারাজ! সুবিচার করুন, আমার পতিকে ফিরাইয়া দিন।

ক্রমে এই আকস্মিক গোলযোগের কথা প্রমোদবাটিকার মধ্যস্থিত রাজার কাণে পৌঁছিল। রাজা স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন মিহির ও 'কপালগন্তা' উভয়েই উভয়ের কথা কহিলেন; 'কপালগন্তা' কহিল,—মহারাজ! ইনি আমার স্বামী, কোন সামান্য কারণে রুষ্ট হইয়া আমায় ইনি ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। এই জন্য ইহাঁকে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে আমার ভ্রাতৃগণ সহ আমি নিজেই ইহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছি। মহারাজ, আমার পতিকে আমার সঙ্গে আসিবার অনুমতি করুন।

মিহির কহিলেন,—না মহারাজ! ও আমার পত্নী নয়; ও দস্যু-বৃত্তিরতা ম্লেচ্ছনারী। আমার নিকট গুপ্তধন আছে, এই আশায় আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে উহার দস্যু ভ্রাতৃগণ সহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে। আপনি উহার হস্তে আমায় অর্পণ করিবেন না।

রাজা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি সেদিন মিহিরকে এবং

'কপালগন্তা' ও তাহার ভ্রাতাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিবার আদেশ দিলেন; বলিলেন,—রাত্রিকালে ইহার বিচার হইবে।

দিন গেল। রাত্রি আসিল। রাজা 'কপালগন্তা' ও মিহিরকে নিজ সমক্ষে আনাইয়া আদেশ করিলেন,—তোমরা উভয়ে অদ্য রাত্রি এক গৃহে যাপন করিবে। 'কপালগন্তা' কোন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শয়নাগারে যাইতে পারিবে না এবং ইহার ভ্রাতাগণও ইহার নিকট থাকিতে পারিবে না।

রাজা মিহির ও 'কপালগন্তা'কে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রহরীদিগকে গোপনে বলিয়া দিলেন,—তোমরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শয়নাগারের বাহিরে পাহারা দিবে, আর রাত্রিতে উভয়ের কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহা শুনিয়া প্রাতে আমার নিকট বলিবে।

মিহির এ ব্যবস্থায় প্রথমে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদেশ না মানিয়া উপায় নাই; কাজেই সম্মত হইলেন। 'কপালগন্তা' রাজাদেশ পাইবামাত্রই সম্মত হইয়াছিল।

অবিলম্বে মিহির ও যুবতী 'কপালগন্তা' এক নির্জ্জন শয়নাগারে নীত হইলেন। 'কপালগন্তা'র সশস্ত্র ভ্রাতৃগণ অন্য কক্ষে আবদ্ধ রহিল। বিশ্বস্ত রাজরক্ষিগণ গোপনে শয়নাগারের বাহিরে থাকিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

চতুরা 'কপালগন্তা' সমস্তই বুঝিয়াছিল; তাই সে প্রথমে চুপ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিল। মিহির কম্পিত-কায়ে ভগবানের নাম জপিতে জপিতে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। অবসন্ন দেহ, সহজেই নিদ্রাক্রান্ত হইল। 'কপালগন্তা' কপালে হাত দিয়া বুঝিল,—মিহির নিদ্রিত; তখন সে আপনা-আপনি একটুকু উচ্চস্বরে কহিল,—রাজপুত্র! কি অপরাধে আমায় ত্যাগ করিতেছ? আমি যে পতি বিনা অন্য জানি না। আমার যদি

কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা কর ; আমার সঙ্গে ফিরিয়া চল, তোমার পায়ে ধরি, ক্ষমা কর, চল।

'কপালগন্তা' এই বলিয়া একটু কাল চুপ করিয়া রহিল। মিহির নিদ্রিত ; তিনি এ কথার কিছুই শুনিতেছেন না। 'কপালগন্তা' কিছু পরে নিজ কণ্ঠস্বর পুরুষের ন্যায় পরুষ করিয়া কহিলেন,—"তুই হতভাগিনী, দূর হ' আমি তোকে আর গ্রহণ করিব না, তোর সংস্পর্শে আর থাকিব না। আমি যেখানে ইচ্ছা যাইব, তোকে আমি বিবাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন আর তোর প্রতি আমার তিলমাত্র ভালবাসা নাই। তুই আমার আশা ত্যাগ করিয়া তোর পিত্রালয়ে চলিয়া যা'।"

গৃহের বহিঃস্থিত প্রহরীরা এইরূপ কথা-বার্ত্তা শুনিয়া স্থির করিল,—উভয়ের পতিপত্নী-সম্বন্ধ নিশ্চিতই ; নতুবা পরস্পর এরূপ কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই স্থির করিয়া প্রহরীরা সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

'কপালগন্তা' কপালে হাত দিয়া বুঝিল,—গৃহের বাহিরে এখন আর কেহই নাই। অতএব এই আমার শুভ অবসর। এই অবসরেই আমি গলা টিপিয়া রাজপুত্রের হত্যাসাধন করিয়া গোপনে এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাই। এই ভাবিয়া 'কপালগন্তা' আবার কপালে হাত দিল ; দেখিল,—গৃহ দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ। কাজেই সে তখন রাজপুত্রের হত্যাসঙ্কল্প ত্যাগ করিল এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহার পেট-কাপড় হইতে সেই প্রস্তরখানি খুলিয়া লইবার আশায় ধীরে ধীরে রাজপুত্রের নাভি-নিম্নস্থ কোঁচার খুঁটটী ধরিয়া টানিতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার টান পড়িল ; তথাচ সে প্রস্তরযুক্ত বস্ত্রপ্রান্ত বাহিরে আসিল না। তখন 'কপালগন্তা' একটু জোরে টান দিল। যেমন জোরে টান পড়িল, অমনি

মিহির তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি 'কপালগন্তা'র হাত চাপিয়া ধরিলেন। 'কপালগন্তা' সজোরে হাত ছাড়াইয়া সরিয়া বসিল।

মিহির মুহূর্ত্তে স্বীয় শ্লথবন্ধন পরিধান দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া লইলেন। তখন 'কপালগন্তা' গম্ভীর ভাবে কহিল,—রাজপুত্র! বেশী বাড়াবাড়ি করিও না; প্রস্তর খানি স্ব-ইচ্ছায় অর্পণ কর, না দাও—জীবন হারাইবে। বাজাদেশে কলাই তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।

রাজপুত্র মিহির দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন,—তুই রাক্ষসী পাপিনী—আমার সহিত কথা কহিবারও অনধিকারিণী; নারী, তাই রক্ষা—নতুবা তোর আজন্মকৃত পাপের শাস্তি এখনই আমি প্রদান করিতে পারি। আমি নানা কারণে উদ্বিগ্ন অবসন্ন হইলেও ক্ষত্রিয়-সন্তান আমি, জগতে কাহার ভয় করি?

যুবতী 'কপালগন্তা' কিঞ্চিৎ কঠোর স্বরে কহিল,—রাজপুত্র, ভাবিয়াছ কি আমি অবলা নারী? সন্দেহ হয়, বল পরীক্ষা কর, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নই।

এই বলিয়া যুবতী সদন্তে মিহিরের অতি নিকটে বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। মিহির বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইলেন এবং যুবতীকে সরাইয়া দিবার জন্য দুই হস্তে এক ধাক্কা মারিলেন। ধাক্কাটী যুবতীর বক্ষঃ-স্থলের উন্নত উভয় প্রান্তে পড়িল। যুবতী ধাক্কার বেগে কিছু মাত্র হটিল না বটে; কিন্তু তড়িদ্‌বেগে কি যেন কি এক ভাবাবেশে তৎক্ষণাৎ বিবশ হইয়া পড়িল। যুবতীর চির রৌদ্র রসময় মানস মাঝে কি এক অবিজ্ঞাত-পূর্ব্ব রসভাব-লহরী উথলিয়া উঠিল। যুবতী লতার ন্যায় মিহিরের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

মিহির তাড়াতাড়ি পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যুবতী ছাড়িল না; সে সকাতরে বলিল,—মিহির! মিহির! রাজপুত্র! রাজপুত্র! অদ্য হইতে তুমিই আমার উপাস্য প্রভু, আমি তোমার দাসী। আমার অতীত কৃত অপরাধ ক্ষমা কর। আমি সে পাপের জন্য অনুতপ্ত; আমায় তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর। আমি এখন হইতে তোমারই চরণের ক্রীতদাসী। তুমি বল,—আমায় তুমি উপেক্ষা করিবে না।

মিহির বিষম সমস্যায় পড়িলেন! ভাবিলেন,—পাপিনী ম্লেচ্ছ-নারীর এ আবার কি কাপট্য! হয় তো এই উপায়েই এ আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত। অথবা ইহার এ ব্যবহার যদি কাপট্যহীনই হয়, অনন্ত-চিত্ত ক্ষত্রিয় সন্তান আমি, তাহাতেই বা কেমন করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হই?

মিহির অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেক ভাবিলেন। নানা প্রশ্নে নানা কথায় যুবতীর মনোভাব বুঝিলেন! মিহিরের ধারণা হইল,—'কপালগন্তা'র অনুরাগ-আনুগত্যে কাপট্য নাই। বিশেষতঃ ইহার সাহায্য পাইলে তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের পক্ষেও অনেক সুবিধা হইতে পারে। তাই তিনি 'কপালগন্তা'র প্রার্থনায় সম্মতি জানাইলেন, এবং নিজের আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা 'কপালগন্তা'র নিকট বর্ণন করিয়া স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাহার বুদ্ধি ও চেষ্টার সাহায্য চাহিলেন।

'কপালগন্তা' কহিল,—রাজপুত্র! তোমার কোনই চিন্তা নাই। এতদিন তোমার বুদ্ধি ও চেষ্টা বলে এতদূর তুমি আসিয়াছ; এখন তুমি নিশ্চিন্ত হও। এখন হইতে যাহা যাহা করিতে হয়, আমিই করিব।

এই কথার পর অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল। রাজরক্ষীরা মিহির ও 'কপালগন্তা'কে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা

রক্ষীদিগের মুখে পূর্ব্বেই উভয়ের পতিপত্নী-সম্বন্ধ শুনিয়াছিলেন ; 'কপালগন্তা'ও রাজার কাছে কথা রচনা করিয়া কহিল,—মহারাজ ! আমি ইতিপূর্ব্বে পতিকে নিজ পিত্রালয়ে রাখিবার জিদ ধরিয়া ইঁহার নানা ক্লেশের কারণ হইয়াছিলাম ; এক্ষণে আমার মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি পতির সহিত পতির ইচ্ছানুসারেই ভ্রমণ করিব, এইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনার নিকট প্রার্থনা,—আমাদের গমনের পর দুই দিন অতীত হইলে আপনি আমার ভ্রাতাগণকে ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পূর্ব্বে উহাদিগকে ছাড়িবেন না। কারণ, উহারা অবোধ, হঠাৎ অনর্থ ঘটাইতে পারে।

মিহির কোনই কথা কহিলেন না। রাজা মিহিরের মৌনই সম্মতি জানিয়া তাঁহাদিগকে যাইতে দিলেন। মিহির ও 'কপালগন্তা' অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দিকে চলিলেন।

দুইদিন পরে কপালগন্তার ভ্রাতৃগণ রুদ্ধ গৃহ হইতে মুক্ত হইল এবং সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া 'কপালগন্তা'কে ভৎসনা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিল।

এদিকে 'কপালগন্তা' মিহিরের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়াই নিজ সৌন্দর্য্যরাশি লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার সুগৌর স্নিগ্ধ বর্ণ—ভস্মাবৃত, সুচিক্কণ কেশকলাপ—রুক্ষীকৃত, এবং পরিধেয় বস্ত্র—মলিনীকৃত হইল। এইভাবে বেশ-বিন্যাস করিয়া 'কপালগন্তা' মিহিরকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

পাঠক! রাজপুত্র মিহির এক্ষণে 'কপালগন্তা'র সাহায্য পাইয়া একরূপ নিরাপদ হইলেন ; সুতরাং ইঁহার জন্য ভাবনা বিশেষ নাই। এক্ষণে চলুন, রাজপুত্রী ইন্দুবালা কি অবস্থায় আছেন, দেখা যাউক।

ইন্দুবালা সেই সেদিন—সেই রাত্রি-শেষে নিদ্রাভঙ্গের পর চক্ষু চাহিয়া দেখেন,—কে এক অপরিচিত পুরুষ তাঁহার অদূরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। সে সুরম্য হর্ম্যকক্ষ,—সে শয্যা—সে পতিদেবতা, কিছুই নাই; পরিবর্ত্তে কি এক অজানিত অপরিচিত শয্যাকক্ষ—তাহাতে কে এক পরপুরুষ নিদ্রিত! ভাবিলেন,—আমি কি দেখিতেছি, ইহা কি স্বপ্নের খেলা! না, না, ইহা স্বপ্ন নয়, সত্য সত্যই আমি অন্যত্র আনীত!

ভয়-ভাবনায় ইন্দুবালা চীৎকার করিলেন। চীৎকারে নিদ্রিত বণিক্-যুবক শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। ইন্দুবালা আরও ভীতা হইলেন। বণিক-যুবক তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিল,—ইন্দুবালা ভীত হইও না; আমিই তোমাকে দৈব উপায়ে এই বাণিজ্য-পোতে আনিয়াছি। ইহা স্থলভূমিস্থ প্রাসাদ-কক্ষ নহে।

ইন্দুবালা বলিলেন,—দুর্ব্বিনীত! কি জন্য আমায় আনিয়াছ? যদি কল্যাণ চাও, তবে এখনই আমায় রাখিয়া আইস।

বণিক্। ইন্দুবালা, কঠোর কথা কহিও না; তুমিই আমার চিরদিনের ধ্যেয় এবং আরাধ্য; তাই কঠোর সাধনায় তোমায় আমি আনাইয়াছি; তুমি রুষ্ট হইও না; শান্তভাবে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর।

ইন্দু। পাপাশয়, তোর কোন কথাই আমার শ্রব্য নয়; তুই আমায় ছাড়িয়া দে: নচেৎ এখনই ইহার প্রতিফল পাইবি।

বণিক্। তোমায় ছাড়িব?—কিছুতেই না। আর ছাড়িলেই কি তুমি যাইতে পারিবে? একরাত্র পূর্ণবেগে চলিয়া বাণিজ্যপোত এখন বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে তোমার সে রাজ্য বা রাজা কিছুই নাই। সুতরাং প্রতিফলের ভয়ই বা কি দেখাইতেছ?

ইন্দুবালা আর কথা কহিলেন না; মনের ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ, মনেই চাপিয়া রাখিলেন।

বণিক-যুবক অতঃপর শান্তভাবে অনেক কহিলেন, অনেক বুঝাইলেন, ইন্দুবালা সে কথায় আর কোনই উত্তর করিলেন না। বণিক-যুবক তখন আর অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি পূর্ণবেগে আপন বাণিজ্যপোত চালাইয়া নিজ নগরে আসিয়া নঙ্গর করিলেন এবং যথোচিত সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া ইন্দুবালাকে লইয়া আপন সুরম্য হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলেন। নিরুপায় ইন্দুবালা বণিক্-ভবনে গমনে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না।

বণিক্ নিজালয়ে আসিয়া আপন অপার ঐশ্বর্য্য—অসীম সুখোপকরণাদি প্রদর্শন করাইয়া ইন্দুবালাকে বশে আনিবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু ইন্দুবালার মন কিছুতেই টলিল না, তিনি বণিকের প্রস্তাব বরাবরই উপেক্ষার সহিত অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন।

বণিক্ নানা মৃদু উপায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বল প্রয়োগে মনন করিল; কিন্তু সেই পরীর কথা মনে করিয়া সে কার্য্যেও সাহসী হইল না।

একদিন বহু সাধ্য-সাধনার পর অবমানিত—ধিক্কৃত বণিক্, আত্মগ্লানি-বশে ইন্দুবালার সমক্ষেই আপন বক্ষে ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইল। তখন ইন্দুবালা শশব্যস্তে বণিকের হস্ত ধরিয়া, মৃদুবাক্যে এই মাত্র বলিলেন,—"আত্মহত্যা করিও না, মানস-ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এক বৎসর সময় ও পৃথক্ ভবনে বাস করিতে চাই।"

বণিক্ ইন্দুবালার এ কথায় আশ্বস্ত হইয়া আত্মহত্যায় নিবৃত্ত হইল এবং ইন্দুবালার ইচ্ছানুসারে তাহাকে সুরক্ষিত পৃথক্ ভবনেই রাখিল।

একমাস গেল, দুই মাস গেল, তিন মাস গেল। চতুর্থ মাসে

বাষ্ট্র হইল;—নগর প্রান্তে এক সন্ন্যাসিনী আসিয়াছেন। তিনি লোক দেখিবামাত্র তাহার মনের ভাব গণনা করিয়া বলিতে পারেন। তাঁহার দৈবী শক্তি বলে বহুলোকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে।

বণিক্-যুবক এ সংবাদে মনে মনে একান্ত আশ্বস্ত হইলেন এবং সেই দিনই অপরাহ্ণে সেই সন্ন্যাসিনীর আস্তানা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন,—সন্ন্যাসিনী কিঞ্চিৎ উচ্চাসনে সমাসীন;—শান্ত সুন্দর ধীর স্থির মূর্ত্তি; পার্শ্বে এক সিন্দূরলিপ্ত ত্রিশূল! অদূরে আস্তানার অভ্যন্তরে এক সৌম্যমূর্ত্তি তপস্বী; তিনি ধ্যানমগ্ন,—কাহারও সহিত কথা কহেন না। বহু নরনারী সন্ন্যাসিনীর নিকট উপবিষ্ট। সন্ন্যাসিনী গণনা দ্বারা অনেকের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতেছেন। অনেকে ভক্তিভরে তাঁহার আস্তানায় মাথা খুঁড়িতেছে।

তদ্দর্শনে বণিক্ যুবকের অত্যন্ত ভক্তি হইল। তিনি সবিনয়ে করযোড়ে তাঁহার নিজ বিষয়ে গণনা করিতে বলিলেন। সন্ন্যাসিনী বণিক-যুবককে অপেক্ষা করিবার ইঙ্গিত করিলেন। বণিক্ তদনুসারে এক প্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসিনীর গণনায় তুষ্ট এবং তাঁহার ঔষধলাভে কৃতার্থ হইয়া সমাগত নরনারী যখন একে একে বিদায় লইল, তখন সন্ন্যাসিনীর দৃষ্টি সেই বণিক্-যুবকের উপর পড়িল। বণিক-যুবক সাগ্রহে সন্ন্যাসিনীর নিকটে গিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসিনী বণিকের বিষয় বহুক্ষণ গণনা করিয়া, শেষে গম্ভীরভাবে বলিলেন,—তোমার দেখিতেছি, বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ ঘটিয়াছে। তোমার আশা পূর্ণ হইয়াও হইতেছে না।

বণিক্ সন্ন্যাসিনীর ঐ দুইটী কথায় একান্তই বিস্মিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া পড়িল। তাহার আগ্রহ, কৌতূহল ও ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ

বৃদ্ধি পাইল। বণিক্ সমস্ত ঘটনা গণিয়া বলিতে সন্ন্যাসিনীকে বিশেষ অনুরোধ করিল।

সন্ন্যাসিনী বলিলেন,—সন্ধ্যা আসিল, আজ থাক্। তুমি কল্য প্রত্যূষে এখানে আসিও, আমি তোমার সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় গণিয়া ঠিক করিয়া রাখিব। তুমি আসিবামাত্র সমস্তই জানিতে পারিবে।

বণিক্ সন্ন্যাসিনীর কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া ভক্তিভাবে ভূমিস্পর্শ করত প্রণামপূর্ব্বক বিদায় হইল।

পর দিবস ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বণিক্ পুনরায় সন্ন্যাসিনীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন; বণিক্ আসিবামাত্র তিনি তাহাকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। বণিক্ ভক্তিভরে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসিনী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বণিক্‌বর! তোমার কার্য্য অতি গুরুতর, আমি গত রাত্রে সমস্তই গণিয়া দেখিয়াছি। এ কার্য্যে বহু ব্যয়ের প্রয়োজন। তুমি সে ব্যয় ভার বহন করিতে পারিবে কি?

বণিক্ বলিলেন,—আপনি দেবতা, আপনার চেষ্টায় আমার কার্য্য যদি সফল হয়, তাহা হইলে আমার সাধ্যপক্ষে ব্যয়ভার-বহনে আমি কুণ্ঠিত হইব না।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—কার্য্য সফল হইবার পূর্ব্বেই বহু ব্যয় করিতে হইবে। আমি অবশ্য ইহার এক কপর্দ্দকও লইব না।

বণিক্ বলিলেন,—সে কার্য্য কিরূপ হইবে? তাহার আভাস আমি এখন জানিতে পারি কি?

সন্ন্যাসিনী। কেন পারিবে না? কার্য্যটী একটী মহামহোৎসবের ন্যায় হইবে। এ মহোৎসবে এ দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া কেকয় দেশ পর্য্যন্ত

নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। এই সকল দেশে যত রাজা, মহারাজা ও ধর্নী গুণী লোক আছেন, তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া সসম্ভ্রমে তোমার ভবনে আনয়ন করিতে হইবে। মস্ত জাঁক-জমকের সভা হইবে। সভা বসিবার পূর্ব্বেই আমি ইন্দুবালার ভবনে গিয়া কয়েকটী মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে ঝাড়িয়া আসিব। সভার এক প্রান্তে তুমি এবং অপর প্রান্তে ইন্দুবালা শুদ্ধবেশে থাকিবে। পরে সভাক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমি কয়েকটী কথা বলিলেই ইন্দুবালা অকপটে তোমাকে গ্রহণ করিবে।

বণিক্ সন্ন্যাসিনীকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিল; তাই তাহার কথাতেই সে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও অভীষ্ট সাধনে উদ্যত হইল। লক্ষ লক্ষ টাকা জলের ন্যায় ব্যয় করিয়া বণিক্ সন্ন্যাসিনীর আদেশমত বিরাট রাজ-সম্মিলন সভার আয়োজন করিল। রাজগণ বণিকের নিমন্ত্রণে যেন কোন একটা অপূর্ব্ব ঘটনা দেখিবার জন্যই কৌতূহলী হইয়া সদলবলে আগমন করিতে লাগিলেন। বণিক্ সন্ন্যাসিনীর উপদেশে নিমন্ত্রণপত্রে কোন একটা অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনেরই উল্লেখ করিয়াছিল। বণিকের ধন-দৌলত ও নামডাক ছিল; সুতরাং তাহার আলয়ে আসিতে কোন রাজাই দ্বিধা বোধ করিলেন না।

পাঠক! এইবার সন্ন্যাসিনী ও তাহার সঙ্গী সেই তাপসের পরিচয় লউন। সন্ন্যাসিনী আমাদের সেই 'কপালগন্তা' আর তাপস আমাদের সেই রাজপুত্র মিহির। 'কপালগন্তা'র বুদ্ধিতেই মিহির এইরূপ বেশ ধরিয়াছেন, আর 'কপালগন্তা' স্বয়ং সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। 'কপালগন্তা' নিজের কপালে হাত দিয়া অনেক গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন; তাই অল্পদিনেই তাঁহাদের পয়সার প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহারা নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই বণিক্‌নগরের নিকটে আসিয়া পসার জমাইয়া

বসিয়াছিলেন। ক্রমে যখন সন্ন্যাসিনীর ক্ষমতার কথা লোকের মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন বণিক্ আসিয়া সন্ন্যাসিনীর শরণ লইলেন। অতঃপর সন্ন্যাসিনী বণিক্‌কে তাহার কার্য্যোদ্ধারের যেরূপ পন্থা বলিয়া দেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে বণিক্‌ভবনে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে বিরাট রাজসভার অধিবেশন হইল। দুই একজন ব্যতীত নিমন্ত্রিত রাজগণ একে একে সকলেই আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। বণিক্‌যুবক বহুমূল্য পরিচ্ছেদ পরিয়া সভায় সকলের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মিহির তাপস-বেশেই সভার একপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সভার এক দিকে পর্দ্দার অন্তরালে ইন্দুবালা আনীতা হইলেন। সভা বসিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসিনী ইন্দুবালার বাস-গৃহে গিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনিই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। রাজা ধনী মানী গুণী সকল শ্রেণীর লোকই যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট;—সকলেই নীরব। এ সভায় কি প্রস্তাব হইবে, কি শুনিবেন, কি দেখিবেন, তাহার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত। এমন সময় পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসিনী বাহির হইয়া সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন,—সভ্যগণ! এ সভায় রাজা বলবর্ম্মা আসিয়াছেন; রাজা ভীমসিংহ আসিয়াছেন, রাজা বীরক্রম আসিয়াছেন এবং আরও বহু গণ্য মান্য রাজা মহারাজ ধনীগুণী মানী ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন। আপনারা আমার একটা উপাখ্যান এক্ষণে শ্রবণ করুন।

সভ্যগণ সকলেই একবাক্যে বলিলেন—বলুন, আমরা শুনিতে প্রস্তুত আছি।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—আপনারা শুনুন—মহামান্য রাজা বলবর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র মিহির নিজ অদৃষ্টে বিশ্বাসী হওয়ায় পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত

হন। পরে দৈবক্রমে তিনি ভীমসিংহরাজের কন্যা ইন্দুবালার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অদৃষ্টক্রমে অপার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনি ভীমা নদীর পরপারে রাজা হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করেন। সভাস্থ দুইজন রাজা বলিয়া উঠিলেন,—তারপর কি হইল ?

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—তারপর ? তারপর এই কোটিপতি—যে আপনা-দিগকে আমার উপদেশে এখানে অহ্বান করিয়া আনিয়াছে, সেই বণিক্‌যুবক অর্থবলে ষড়যন্ত্র করিয়া মিহিরপত্নী ইন্দুবালাকে হরণ করিয়া আনে। পত্নীবিরহে মিহির রাজ্যৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। এই বণিক্ বহু প্রলোভনেও সতীলক্ষ্মী ইন্দুবালার মন টলাইতে পারে নাই ; তাই বণিক্ আমার শরণ লইয়াছিল। আমি দুর্ব্বৃত্তের শাস্তির জন্য আপনাদের এই মহাসম্মিলন ঘটাইয়াছি। এক্ষণে আপনারা বিচার করিয়া ইহার শাস্তি বিধান করুন, ইহাই আমার প্রস্তাব।

সন্ন্যাসিনীর বক্তৃতা শুনিয়া বণিক্ যুবকের মুখ শুকাইল। অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল।

তখন দুই জন রাজা আসন হইতে উঠিলেন, একজন সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞাসিলেন,—দেবি ! মিহির কোথায় ? সে কি জীবিত আছে ? অন্য জন কহিলেন,—আহা, প্রাণপুত্তলী ইন্দুবালা কৈ ? সে কি বাঁচিয়া আছে ?

বলা বাহুল্য, যে দুইজন রাজা সন্ন্যাসিনীর নিকট এই প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাদের এক জন মিহিরের পিতা এবং অপর জন তাঁহার শ্বশুর।

সন্ন্যাসিনী কহিলেন,—ভূপালদ্বয় ! আশ্বস্ত হউন, মিহির তাপসবেশে ঐ সভাকোণে উপবিষ্ট, আর ইন্দুবালা এই পর্দ্দার অন্তরালে অবস্থিত।

তখন সভাস্থ সর্ব্বলোক বণিকের নিন্দা করিতে করিতে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। রাজা বলবর্ম্মা এবং ভীমসিংহ মিহির ও ইন্দুবালাকে একত্রিত করিয়া পরমানন্দে আপ্যায়িত হইলেন। বণিক্ অধোবদনে বসিয়া রহিল। বণিকের বহু অর্থক্ষয় এবং অজস্র লোক নিন্দা হইল। তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে মনে করিয়া রাজগণ আর তাহার বিশেষ কোন দণ্ড ব্যবস্থা করিলেন না।

মিহির এইবার সন্ন্যাসীর বেশ ছাড়িলেন, রাজবেশ পরিলেন এবং সেই দিনই পিতা ও শ্বশুর সহ মহাসমারোহে ইন্দুবালাকে লইয়া স্বীয় রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 'কপালগন্ডা' মিহিরের অনুরোধে সন্ন্যাসিনীর বেশ ঘুচাইয়া আপনার অলৌকিক রূপের ছটায় যেন পথ-প্রান্তর আলোকিত করিয়াই ইন্দুবালার সঙ্গিনী হইয়া চলিলেন। রাজা বলবর্ম্মা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, মানুষের নিজ ভাগ্যই সুখ দুঃখ দান করে। এ কথা পূর্ব্বে যেরূপ বুঝিতাম, মিহিরের ঘটনায় তাহা আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। ক্রমে সকলেই তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানীতে গিয়া পৌঁছিলেন। মিহির ইন্দুবালা ও 'কপালগন্ডা'কে লইয়া মহাসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দুরাশায় বৈধব্য।

পূর্ব্বকালে মথুরা পুরী হইতে দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে এক বণিক্ বাস করিত। বণিকের ধন সম্পত্তি প্রচুর ছিল; কিন্তু ভাগ্যদোষে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। শোকে দুঃখে অবশেষে কিছুদিনের মধ্যে বণিক্ পরলোক গমন করে।

বণিকের একটী মাত্র পুত্র ছিল। মরণের পূর্ব্বে বণিক্ কোন ক্রমে তাহার বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বণিক্পুত্র দেখিল,—তাহার কপর্দ্দক মাত্রও সম্বল নাই; অথচ বিধবা মাতা, পত্নী এবং নিজে, এই তিন জনের গ্রাসাচ্ছাদন তাহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। উপায় কি? কোন্ উপায়ে ধনার্জ্জন করা যাইবে? কি করিয়া সকলের ভরণ পোষণ চলিবে? ইহা ভাবিয়াই বণিক্পুত্র আকুল।

ক্রমে মাস গেল, বৎসর গেল; বণিক্নন্দন কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। বাড়ীর আসবাবপত্র যা' কিছু ছিল, এ যাবৎকাল সেই সকলই বেচিয়া কিনিয়া সংসার চলিল। অবশেষে এমন এক দিন হইল, সে দিন আর অন্ন জুটিল না; উপবাসী বণিক্পুত্র শয্যায় শুইয়া রহিল। তাহার মাতা এবং পত্নীও উপবাসী রহিল। দুঃখ-দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি বণিক্-পুত্রের নিদ্রা হইল না; তাহার মাতা এবং পত্নীও অনেক রাত্রি জাগিয়া রহিল। অনন্তর রাত্রি প্রভাত হয়-হয়—এমন সময়, মাতা এবং পত্নী নিদ্রায় অভিভূত হইলে, বণিক্পুত্র ভগবানের নাম লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পর দিন প্রভাতে মাতা পুত্রের অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও কাহারও নিকট

পুত্রের সংবাদ মিলিল না। দুঃখিনী জননী অবশেষে পুত্রবধূ লইয়া নিজের পিত্রালয়ে যাত্রা করিল।

এদিকে উপবাসী বণিক্‌পুত্র সে দিন সমস্ত বেলা ও রাত্রিরও দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত হাটিয়া অতিকষ্টে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মথুরায় আসিবার উদ্দেশ্য,—মথুরা সমৃদ্ধ স্থান; এখানে যদি কোনরূপ কাজকর্ম্ম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায়, তাহা হইলে এক প্রকারে নিজেদের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবে।

এই উদ্দেশ্যেই বণিক্‌পুত্র মথুরায় আসিল; কিন্তু অপরিচিত স্থান, কোথায় যাইবে? কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? বিশেষতঃ রাত্রিকাল, একাকী রাস্তায় চলাও বিপদ; হয়ত কয়েদ খানায়ই বা থাকিতে হয়। এদিকে দু'দিন হইতে পেটে অন্ন পড়ে নাই, কি খাইয়াই বা জীবন রক্ষা করা যায়? এইরূপ নানা ভাবনা তাহার উপস্থিত হইল।

কিন্তু দৈব ক্রমে তাহার সকল ভাবনা দূর হইল। মথুরা সহরের গলি-ঘুজির মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই রাস্তার দক্ষিণাংশে একখানি ইষ্টকময় ক্ষুদ্র ভগ্ন কুটীর মিলিল। শ্রান্ত ক্লান্ত বণিক্‌পুত্র কোন ইতস্ততঃ না করিয়া, একেবারে সেই কুটীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীর মধ্যে একটী ক্ষীণরশ্মি প্রদীপ আছে; আর এক জন দীর্ঘকায় রুগ্ন পুরুষ শুইয়া আছে। বণিক্‌পুত্র গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র রুগ্ন পুরুষ হস্ত-সঙ্কেতে তাহাকে নিজের কাছে ডাকিল। বণিক্‌পুত্র মনে কোন দ্বিধা না করিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিল। রুগ্ন পুরুষ দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—বেটা, তুই কে আসিলি? আমায় রক্ষা কর, আমার যাহারা ছিল, তা'রা আমায় ফেলিয়া গিয়াছে।

আমি এখন মরিতে বসিয়াছি ; পিপাসায় আমার প্রাণ যায়, কিছুকাল হইতে আমি আর উঠিতে পারিতেছি না।

বণিক্‌পুত্র ঐ কথা শুনিয়া ত্বরাত্বরি প্রদীপ প্রোজ্জ্বল করিয়া লইল এবং যেখানে জল আছে, তাহা জানিয়া লইয়া রুগ্ন পুরুষকে আনিয়া পান করাইল। রুগ্ন পুরুষ জলপানে তৃপ্ত হইল। এই অবসরে বণিক্‌পুত্র তাহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল ; নিজের সমস্ত দুঃখকাহিনী সেই রুগ্ন পুরুষের নিকট কহিল।

রুগ্ন পুরুষ বলিল,—বেটা, তুই এখানে থাক, আমি তোর উপায় করিয়া দিব। আমার স্ত্রী নাই। দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণ আমায় ফেলিয়া গিয়াছে। আমি আজ মাসাবধি রোগে ভুগিতেছি। আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে। আমি সারিয়া উঠি ; পরে অর্থ দ্বারা তোমাকে লইয়া একটা ব্যবসা বাণিজ্য করিব। আমার পুত্রেরা আমার সেই গুপ্তধনের কথা জানিত না। তাহারা দুশ্চরিত্র বলিয়াই আমি তাহাদিগকে সে কথা জানাই নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, যেন ঈশ্বরই দয়া করিয়া আমার সাহায্যের জন্য তোমায় পাঠাইয়াছেন। তুমিও সৎ পুত্রের ন্যায় কার্য্য করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। তাই তোমার নিকট ঐ গোপনীয় কথা কহিলাম। এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম চাহিয়া আমায় বাঁচাইবার চেষ্টা কর।

বণিক্‌পুত্র কহিল,—আমি নিরাশ্রয়, আপনার নিকট আশ্রয় পাইয়াছি ; আমি প্রাণপণে আপনার শুশ্রূষা করিব। আপনি যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন, সে চেষ্টা আমি একমনে করিব।

রুগ্ন পুরুষ বণিক্‌পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার কোথায় কত গুপ্তধন আছে, তাহা বলিয়া দিল। বণিক্‌পুত্রও কায়মনোবাক্যে রুগ্ন

ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সে দিন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। কাজেই আহার-সংগ্রহ তেমন আর হইল না। রুগ্ন পুরুষের ভগ্ন কুটীরে মাত্র চারিখানি রুটী ছিল। বণিকপুত্র তাহাই অমৃতবোধে খাইয়া প্রাণ ধারণ করিল। সমস্ত দিনের পথশ্রম, উপবাস, তাই আহারের পরই গভীর নিদ্রা আসিল। সে নিদ্রায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা-ঘাটে লোক-চলাচল আরম্ভ হইল। বণিকপুত্র প্রাতে উঠিয়াই রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রোগীর নির্দ্দেশ মত চিকিৎসকের নিকট গেলেন; সেখান হইতে ঔষধ আনিলেন; পথ্যের ব্যবস্থা জানিয়া আসিলেন। যথাকালে ঔষধ পথ্য রোগীকে দেওয়া হইল। অবশেষে স্বয়ং যমুনা হইতে স্নান করিয়া আসিয়া নিজের জন্য রন্ধন করিতে লাগিলেন। স্নান করিয়া আসিবার কালে বণিকপুত্রের স্বগ্রাম হইতে আগত জনৈক বণিকের মুখে স্বীয় জননী ও পত্নীর মাতুলালয়ে গমনের কথা শুনিয়া বণিকপুত্র অনেক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি আহারের পর আবার নিশ্চিন্তমনে রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। দিনে রুগ্ন ব্যক্তির দুই একজন পরিচিত লোক আসিল, তাহাদের নিকট তিনি বণিকপুত্রকে নিজের একজন বিশিষ্ট আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন।

এই ভাবে দুই দিন পর্য্যন্ত বণিকপুত্র রুগ্ন ব্যক্তির যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিলেন, যথারীতি ঔষধ পথ্য দিলেন, মধ্যে রোগীর অবস্থা একটু ভালও হইল, কিন্তু তিন দিনের দিন রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইল। এই না—সন্ধ্যাকালেই তাহার মৃত্যু হইল। বণিকপুত্র অনেক কাঁদিলেন; অবশেষে আসে-পাশের দুই চারিজন লোক ডাকিয়া আনিয়া যমুনাতীরে

গিয়া তাহার সৎকার করিয়া আসিলেন। সৎকারান্তে স্নান করিয়া অন্যান্য লোক তাহাদের গৃহে গেল। বণিক্‌পুত্র সেই ভগ্ন কুটীরেই ফিরিয়া আসিলেন। পরে রাত্রি যখন অধিক হইল, রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হইয়া আসিল, তখন তিনি সেই রুগ্ন ব্যক্তির কথিত স্থানগুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া গুপ্তধন সংগ্রহ করিলেন। সমষ্টিতে প্রায় পঞ্চ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা বণিক্‌পুত্রের হস্তগত হইল। তিনি স্বর্ণমুদ্রাগুলি দুইখানি ছিন্ন কন্থার মধ্যে রাখিয়া এক পুঁটলী করিলেন এবং সেই পুঁটলীটী কখন স্কন্ধে কখন বা কক্ষে লইয়া মথুরা হইতে নিজ বাসভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বণিক্‌পুত্রের পথে কোনই বিঘ্ন হইল না, তিনি নির্ব্বিঘ্নে মহাস্ফূর্ত্তি সহকারে নিজ গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে বণিক্‌পুত্রের মাতা এবং পত্নীও ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিনই গৃহে আসিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা যাহাদের আশ্রয়ে গিয়াছিলেন, তাহাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়াই তাঁহাদিগকে সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

বণিক্‌পুত্র সেই দিনই প্রভূত অর্থ লইয়া গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়াই মাতা ও পত্নীকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তিনি ধনরাশি পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে আনন্দ তাঁহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহাদের দুঃখ ঘুচিল। সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তনে পাড়া প্রাতি-বেশীদিগের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া কিরূপে বণিক্‌পুত্র এত সত্বর নিজের দুরবস্থা ঘুচাইল, তাহা জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভাবনায় ভাবনায় রাত্রিতে অনেকের

নিদ্রা হইতে লাগিল না। পল্লীর পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের ভাবনা আরও অধিক হইল। হঠাৎ বণিক্‌সংসারের স্বচ্ছলতা কি উপায়ে ঘটিল, তাহা না জানিতে পারিলে তাহাদের প্রাণ যেন যায়-যায় হইয়া আসিল।

একদিন দিবাবসানে পল্লীবাসিনী রমণীরা পল্লীর একটা ইন্দারা হইতে জল লইতে আসিল। বণিক্‌পত্নীও সেইখানে জলানয়নার্থ উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য রমণীরা সকলেই এই সুযোগে তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। সকলেই সনির্ব্বন্ধে বলিল,—হ্যাঁগা দিদি, একটা কথা বল্‌বি তো?

বণিক্‌পত্নী কহিলেন,—আমার যদি জানা থাকে তো অবশ্যই বলিব।

রমণীগণ। জানা তোমার নিশ্চয়ই আছে, এখন বলা না-বলা, সে তোমার ইচ্ছা।

বণিক্‌পত্নী। বিষয়টা কি খুলিয়াই বল না, তবে তো বুঝিতে পারি, আমি জানি কি না?

রমণীগণ। তা' সে কথাটা বেশী কিছু না; তুমি বল্‌লেই পার।

বণিক্‌পত্নী। খোলাসা ক'রে বলই না, শুনি?

রমণীগণ। তা' বোন্ সত্য ক'রে বলিস্; কিন্তু দেখিস্ যেন আমাদের ভাঁড়াস্ না।

বণিক্‌পত্নী। তোমাদের কি কথা, তা' শুন্‌তেই পেলেম না; তা' আর ভাঁড়ান্ না ভাঁড়ান্ কি?

রমণীগণ। এই শোনো, তোমাদের বো'ন্, আগেকার অবস্থাটা এমন ছিল না; তোমাদের সংসারে খুব অনাটনই ছিল! এত শীগ্‌গির তোমাদের অবস্থাটা এত ভাল হ'লো কি ক'রে? তোমার স্বামী তো এই সেদিন হ'লো বিদেশে গেলো; পাঁচ সাতদিন বিদেশে থেকেই আবার

বাড়ী ফিরে এ'লো। যেমন আসা, অমনি তোমাদের সংসারটী ফিরে গেলো,—যেন লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠ্‌লো! এর কারণ কি? কি ক'রে তোমার স্বামী হঠাৎ অবস্থা ফিরিয়ে ফেল্‌লো?

বণিক্‌পত্নী। দিদি সকল! আমি সত্যই বল্‌ছি, এর কিছুই আমি জানি না; এ বিষয় তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা আমি করি নাই। কি করিয়া কি হ'লো, তা তিনিই জানেন।

রমণীগণ। তা বো'ন্ তুমি সত্যই যদি কিছু না জানো, তা'হলে আর বল্‌বে কি ক'রে? তবে আমাদের অনুরোধ—তুমি এই কথাটী তাঁর কাছ থেকে শুন্‌বেই শুন্‌বে। আমরা যেন বো'ন্ কা'ল আবার এমনই সময় তোমার কাছ থেকে ঐ খবরটী পাই।

বণিক্‌পত্নী। আচ্ছা, আমি আজ রাত্রে তাঁর কাছ থেকে ঐ সংবাদটী শুন্‌বো। কা'ল আবার এমনি সময় তোমাদের কাছে এসে বল্‌বো।

এই বলিয়া বণিক্‌পত্নী স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

রমণীগণ বণিক্‌পত্নীর কথায় মহাখুসী হইল। কিন্তু তাদের মনের সন্দেহ মিটিল না। তাহারা সন্দেহ করিল,—বণিক্‌পত্নী তার স্বামীর কাছ থেকে আসল কথাটী শুনেও যদি আমাদের কাছে মিথ্যা করে যা' হয় একটা বলে, তবে তো খাঁটী খবরটী পাইব না! বেণের বৌকে বিশ্বাস কি? সে নিশ্চয়ই আসল কথাটী আমাদের কাছে বল্‌বে না। অতএব এখন ভিতরের কথা জানিবার কি করি? ভাল, এক কাজ আছে। বেণের বৌ যখন তার স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রবে, তার আগে থেকেই আমরা সকলে তাদের ঘরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো। বেণের পো' যেমন আসল কথাটী কইবে, অমনি আমরা সেটী শুনে আমাদের

মনের ধাঁধা মেটাবো। কা'ল আবার বেণের বৌও ঠিক কথাটী কয় কিনা, তাও বুঝ্‌তে পার্‌বো।

পল্লীবাসিনী রমণীরা ঐ কথাটী শুনিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছে কেন? এর কারণ কি? কারণ এই যে, উহারা বণিক্‌পুত্রের হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেরাও ঐরূপ ভাবে সহজে নিজ নিজ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিতে ব্যগ্র হইয়াছে। পল্লীবাসিনীরা স্থির করিয়াছে, বণিক্‌পুত্র যে উপায়ে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই নিজের অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে, যদি কোনরূপে ঐ উপায়টী জানিতে পারি, তবে আমরাও স্ব স্ব স্বামী দ্বারা সেই ভাবে অর্থোপার্জ্জন করাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এইরূপ মতলব করিয়াই পল্লীবাসিনীরা অদ্য বণিক্‌বধূকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং এই জন্যই উহারা আজিকার রাত্রিতে বণিক্‌ভবনের পিছনে পাহারা দিবার মতলব আঁটিতেছে।

পল্লীবাসিনীরা যেরূপ মতলব আঁটিল, কার্য্যও সেইরূপই হইল। সন্ধ্যার পরই তাহারা বণিকের শয়নগৃহের পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথাকালে খাওয়া-দাওয়ার পর বণিক্ ও বণিক্‌বধূ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। এ কথা-সে কথার পর, বণিক্‌পত্নী স্বামীর নিকট জিজ্ঞাসিলেন,—আচ্ছা, তুমি যে বিদেশে গিয়াই পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই এত টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া আসিলে, এত শীঘ্র এরূপ উপার্জ্জন তোমার কি করিয়া হইল? আমার নিকট সেই কথাটী বল। বণিক্ বলিলেন,—সে আর বেশী কথা কি, অবশ্যই তোমার নিকট একদিন এ কথা কহিব। আজ এ প্রসঙ্গ থাক।

বণিক্‌পত্নী বলিলেন, না—আজই বলিতে হইবে; শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে।

বণিক্ ভাবিলেন,—লোকে বলে, স্ত্রীলোকের পেটে কথা বেশীক্ষণ থাকে না; সে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলে। আমার অর্থপ্রাপ্তির প্রকৃত কথা যদি বলি, তবে এখনই তাহা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। শেষে আমাকে উদ্দেশ করিয়া কেহ বলিবে, একটা মরা-মানুষের যথা-সর্ব্বস্ব লইয়া আসিয়াছে। কেহ বলিবে, লোকটা তখনও জীবিত ছিল; কিন্তু তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াই তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া বণিক্‌পুত্র নিজ গৃহে পলাইয়া আসিয়াছে। এইরূপ নানা কথাই নানাজনে রটনা করিবে। অতএব সত্য কথা কহিলে, এ ক্ষেত্রে ফল ভাল হইবে না। এদিকে স্ত্রীলোকের নিকট আমি যদি মিথ্যা কথাও বলি, তাহাতে আমার পাপ হইবে না; শাস্ত্রের উক্তি এইরূপই আমার শুনা আছে। সুতরাং স্ত্রীর নিকট একটা মিথ্যা চরনা করিয়াই বলি।

এইরূপ আলোচনা করিয়া বণিক্‌পুত্র প্রকাশ্যে বলিলেন,—শুন তবে আমার অর্থোপার্জ্জনের অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিতেছি। সেই যে—সে দিন আমি তোমাদিগকে উপবাসী অবস্থায় ফেলিয়া নিজেও উপবাসী থাকিয়া ভোরের বেলা বাটী হইতে রওনা হইলাম, সেই যাত্রায়ই অন্য কোথাও বিশ্রাম না করিয়া একেবারে মথুরানগরে গমন করিলাম। মথুরা আমার অপরিচিত স্থান; আমিও মথুরাবাসীদিগের অপরিচিত; সুতরাং সেখানে কোথাও আমার স্থান হইল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমি অগত্যা যমুনার তীরে গমন করিলাম। সমস্ত দিন উপবাসী; আমার আর চলৎশক্তি নাই, তথাচ মনের দুঃখে অতি কষ্টে যমুনাতীর দিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইয়াছে। সুবিধার মধ্যে জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; পথ অপথ দেখিতে কোনই কষ্ট হইতেছে না। যাইতে যাইতে পথের ধারে এক স্থানে দেখিলাম,—

একখানি নূতন কাপড় পড়িয়া আছে, আর সেই কাপড়ের এক কোণে একটা জিনিস বাঁধা আছে। দেখিয়াই কাপড়খানি হাতে লইলাম এবং সেই কাপড়ে বাঁধা জিনিষটা কি, তাহা দেখিবার জন্য কাপড়ের সেই বন্ধনটী খুলিলাম। দেখিলাম,—একটা কৌটায় পোরা একভরি আন্দাজ আফিং রহিয়াছে। আফিং দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল। ভাবিলাম,—আমার এই দুঃখময় জীবন লইয়া এ সংসারে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র; আমার এ অবস্থায় মরণই মঙ্গল। অতএব আমি এই আফিং খাইয়াই জীবন পাত করি! এইরূপ স্থির করিয়া আমি সেই নূতন কাপড়খানি আগাগোড়া খুলিয়া ফেলিলাম, কাপড়ের এক কোণে এক টুক্‌রা কাগজে কিঞ্চিৎ সিন্দুর ছিল, সেই সিন্দুর দ্বারা কপালে এক দীর্ঘ ফোঁটা দিলাম; সর্ব্বশেষে সেই আফিংটুকু গলাধঃকরণ করিয়া নূতন কাপড়খানি মুড়ি দিয়া চিৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। প্রায় দুই ঘণ্টা এই ভাবে রহিলাম; পরে হঠাৎ পেটের ভিতর একটা শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাব পেট দিয়া আসিয়া হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া মোহর পড়িতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল মোহর পড়িল। তারপব আমি যেমন মানুষ, তেমনই হইলাম। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিল না; আমি উঠিয়াই সেই নূতন কাপড়খানিতে করিয়া যত পারিলাম, মোহর বাঁধিয়া লইয়া আসিলাম। আমিও বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আর তোমরাও তখন আসিলে। পরে সেই মোহর ভাঙ্গাইয়াই আমাদের সংসার চলিতেছে।

বণিকৃপত্নী স্বামীর অর্থোপার্জ্জনের এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এ দিকে পল্লীবাসিনীরা গৃহের পশ্চাৎ হইতে সেই কাহিনী শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের গা টিপিয়া যে যাহার গৃহে প্রস্থান করিল।

পরদিন পল্লীর সমস্ত রমণী ঐ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য নিজ নিজ স্বামীকে অনুরোধ করিল। স্বামিগণ পত্নীগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অগত্যা সেই উপায়ে অর্থার্জ্জন করিতে সম্মত হইল। রমণী-গণের আহ্লাদের সীমা নাই। তাহারা ভাবিল,—বণিক্‌পুত্র একাকী সকল মোহর আনিতে পারে নাই, আমাদের কিন্তু সেরূপ হইবে না; আমরা নিজেরা কাছে থাকিব, যত মোহর পড়িবে, এক একটী করিয়া সবগুলিই তুলিয়া লইব। আমাদের আর এক সুবিধা—আমাদের ঘরের ভিতরই মোহর পড়িবে, তা' সে রাত্রি যদি সব তুলিয়া রাখিতে নাও পারি, তাহাতেও ক্ষতি নাই। এক ঘণ্টাকাল হুড় হুড় করিয়া মোহর পড়িবে, সে মোহর ভাঙ্গাইলে না জানি কত কোটী টাকাই হইবে। সে টাকায় আমাদের কতই না সুখ হইবে, আমরা এক একজনে এক একটী রাজরাণী হইব।

এইরূপ সুখের কল্পনা করিয়া পল্লীর তাবৎ রমণী দিন থাকিতেই স্ব স্ব স্বামীর জন্য এক একখানি নূতন কাপড়, এক একটু সিন্দুর ও এক এক ভরি আফিং কেনাইয়া আনিল। তারপর ক্রমে যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, তখন প্রত্যেক রমণী নিজ নিজ স্বামীকে এক এক সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া, এক এক ভরি আফিং খাওয়াইয়া শয্যায় শোয়াইয়া রাখিল; পরে সেই নূতন কাপড়ে ঢাকা দিয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের গৃহে স্ব স্ব স্বামীর পাদমূলে মোহরের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। আফিং খাওয়াইবার পর একে একে নির্দ্দিষ্ট দুই ঘণ্টাকাল কাটিল; ক্রমে তিন ঘণ্টা গেল; কিন্তু মোহর আর পড়িল না; রমণীরা প্রত্যেকের গৃহে প্রত্যেকে উতালা হইয়া পড়িল, আর ভাবিতে লাগিল,—আমারই ভাগ্যে হয়তো মোহর লাভ হইল না; আর সকলে হয় তো প্রচুর মোহর পাইয়াছে। এইরূপ

ভাবনায় ভাবনায় আরও এক ঘণ্টা গেল। শেষে রমণীরা নিজ নিজ স্বামীর পা ধরিয়া নাড়িয়া দেখিল, সব ফুরাইয়াছে; তাহাদের স্বামিগণ ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে গ্রামময় ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতি গৃহে প্রত্যেক রমণী বক্ষে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ক্রমে সকল রমণীই কাঁদিতে কাঁদিতে একত্র হইল। তাহারা লোভে পড়িয়া দুর্ব্বুদ্ধি-বশে নিজেরাই যে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দুঃখের ভার তাহাদের আরও অধিক হইয়া উঠিল। কতকগুলি রমণী সেই বণিক্‌পুত্রকেই অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

বণিক্‌পুত্র রাত্রি প্রভাতে এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন; শুনিয়া তিনিও বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন।

এ দিকে রমণীরা দলবদ্ধ হইয়া দেশের রাজার নিকট গিয়া নালিশ করিল। তাহাদের অভিযোগের মর্ম্ম এই,—আমাদের গ্রামে এক সমৃদ্ধ বণিক্‌পুত্র আছে, তাহা হইতেই আমাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

রাজা সেই বণিক্‌পুত্রকে আনাইবার জন্য দূত পাঠাইলেন। দূত তাহাকে লইয়া সত্বর রাজ-সভায় আগমন করিল। রাজা বণিক্‌পুত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষী প্রমাণ লইয়া বুঝিলেন,—রমণীরা নিজের দোষেই বিধবা হইয়াছে। বণিক্‌পুত্রের ইহাতে কোন দোষ নাই।

রাজা বণিক্‌পুত্রকে বেকসুর খালাস দিলেন।

বিধবাগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজা দয়া করিয়া রাজ-সরকার হইতে তাহাদের আজীবন হবিষ্যাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সে দিন আর এ দিন।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! এক সময় প্রাচীন কাম্পিল্য নগরের নিকটে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাবুদ্ধি বড় একটা ছিল না। সংসারের অবস্থা তাঁহার বড়ই মন্দ ছিল। গ্রামের দুই একটী সদাশয় লোকের মাসিক যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য লইয়াই তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ বড়ই সরল ও অমায়িক; তাই গ্রামের অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

ব্রাহ্মণ দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু পর্য্যাপ্ত বসন ভূষণ ও অশনাদি দ্বারা একদিনও পত্নীকে মনের মত আপ্যায়িত করিতে পারেন নাই। পত্নীও নিজের মন্দ ভাগ্য ভাবিয়া ভ্রমেও কখন কটুবাক্যে পতির মর্ম্মপীড়া দেন নাই। পতি যে যৎসামান্য রোজগার করেন, তাহা দ্বারাই সসন্তোষে জীবন যাপন করেন।

ক্রমে ব্রাহ্মণের একটী পুত্র হইল। পুত্রটী বড় হইল; ষষ্ঠ কি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ব্রাহ্মণ, বালকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। এমন কি একখানি বস্ত্র দিয়াও বালকের নগ্নাবস্থা ঘুচাইবার শক্তি তাঁহার হইল না। বালক দিগম্বর হইয়া অপরাপর বালকের সহিত খেলা করে, হাসে, কাঁদে, নাচে! খেলার সঙ্গী বালকেরা কাপড় পরে, বালক একদৃষ্টে তাহা তাকাইয়া দেখে। নিজের কাপড় নাই বলিয়া সে পিতা-মাতার নিকট কখনও আবদার করে না।

একদিন খেলার সঙ্গী বালকেরা ঐ ব্রাহ্মণ-বালককে বলিল,—ভাই, তুমি ন্যাংটো হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করিতে পারিবে না। বালক সে

কথার কোনই উত্তর দিল না; কেবল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া খেলার স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল খেলার পর বালকদলের মধ্য হইতে একটী বালক ঐ উলঙ্গ ব্রাহ্মণ-বালকের নিকট আসিয়া বলিল,—ভাই, আমি বাড়ী যাই; এখন আর খেলিব না, আমার এই কাপড়খানি পরিয়া তুমি গিয়া খেলা কর। শেষে খেলা হইলে আমি আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।

ব্রাহ্মণ-বালক বড়ই আহ্লাদিত হইল। জীবনে কখনও কাপড় পরে নাই; আজ সে কাপড় পরিতে পারিল; বিশেষতঃ যে চিরপ্রিয় খেলা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছিল, কাপড় পরিয়া এখন সেই খেলাব সে অধিকারী হইল। কাজেই তাহার আনন্দ আজ আর ধরে না।

বালক কাপড় পরিয়া হাসিতে হাসিতে খেলিতে গেল; কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে খেলার সুখ ভোগ করিতে হইল না। যে বালক তাহাকে কাপড় দিয়া গিয়াছিল, সে বাড়ী যাইবা মাত্র তাহার এক রায়-বাঘিনী পিশী কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসিল,—ওরে হতভাগা, তোর কাপড় কোথায় ফেলে এলি? বালক বলিল,—কাপড় খানি এক বালকের কাছে রাখিয়া আসিয়াছি। আমি খাইয়া গিয়া লইয়া আসিব।

পিশী এই কথা শুনিবা মাত্র গর্জ্জিয়া উঠিল। সে, রাগে গরগর করিতে করিতে বালকদের খেলার স্থানে গেল; সেখানে গিয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকের পরিধানে সেই কাপড় দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গালাগালি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ-বালক ভয়ে-ভয়ে ত্বরাত্বরি কাপড়-খানি খুলিয়া দিল। কিন্তু কাপড় পাইয়াও সেই রায়-বাঘিনীর রাগ মিটিল না; সে যাইবার সময় 'কাঙ্গালের ছেলের কাপড় কেন?' এই বলিয়া বালকের গালে সজোরে একটী ঠোনা মারিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ-বালকের দুই চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দূর হইতে পুত্রের এই দুরবস্থা দেখিলেন; দেখিয়াও মুখে কিছুই বলিলেন না; কিন্তু অন্তর হাহাকার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণপত্নী নিজ নেত্রজলে প্লাবিত হইয়া পুত্রের নেত্রজল মুছাইলেন; তাহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন। এ ঘটনায় অন্তরে তাঁহাদের দারুণ আঘাত লাগিল। নিজেদের মন্দ ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পতি-পত্নী সে দিন দিবারাত্র অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

ব্রাহ্মণের বড়ই ধিক্কার জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন,—দারিদ্র্যময় জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই মঙ্গল। জানি বটে, আত্মহত্যা মহাপাপ; কিন্তু আর না, আর সহ্য হয় না। আমি আজই জীবন বিসর্জ্জন দিব।

এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণ রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তেই শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং মরণার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া দূরস্থ এক গভীর অরণ্যে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী এ ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। এদিকে বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন শ্রান্ত ক্লান্ত ব্রাহ্মণ এক জনমানব-হীন অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং এক বৃক্ষতলে বসিয়া সাশ্রু-নেত্রে ভগবান্‌কে অনেক ডাকিলেন; অবশেষে যুক্তকরে কহিলেন,—প্রভো! আমি আজ অতি দুঃখে আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছি। আমায় ক্ষমা কর---এই আত্মহত্যাজনিত পাপ যেন আমায় স্পর্শ করে না। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উদ্বন্ধনেই প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ যেমন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি কোথা হইতে একখানি ছিন্ন ভূর্জ্জপত্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িল। ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধে তাকাইলেন; কিছুই দেখিলেন না। পরে সেই ভূর্জ্জপত্রখানি হাতে লইয়া ওল্টাইয়া দেখিলেন,—তাহাতে লেখা আছে,—"ব্রাহ্মণ! আত্মহত্যা করিও

না ; বাড়ী ফিরিয়া যাও। কোন রাজার নিকট গমন কর, গেলেই তোমার অর্থলাভ হইবে।"

ব্রাহ্মণ এই লিখিত কথা কয়টী পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ; ভাবিলেন,—এ নির্জ্জন অরণ্যে কে আমায় এ সকল কথা লিখিয়া দিল ? নিশ্চয়ই ইহা বিধাতার কর্ম্ম ; অতএব আমি এ যাত্রা আত্মহত্যা করিব না ; বাড়ী ফিরিয়া গিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট সকল কথা বলি। পরে যেরূপ হয়, তাহার পরামর্শ মত করিব।

এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী সকাল হইতে ব্রাহ্মণকে না দেখিয়া বিষম উদ্বেগে কাল কাটাইতে ছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং ব্রাহ্মণ কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা জিজ্ঞাসিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত সংবাদই বলিলেন। ব্রাহ্মণী সকল কথা শুনিয়া আশাপূর্ণ-মনে বলিলেন,—এ তো অতি সুসংবাদ ; অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া এখনই রাজবাড়ী যাওয়া উচিত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি যদি সেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত হইতাম, তা হ'লে পূর্ব্ব হইতেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের দারিদ্র্য-মোচনের চেষ্টা করিতে পারিতাম। কিন্তু পাণ্ডিত্য তো আমার কিছুই নাই। কাজেই এতদিন যাই নাই। এখন এই লিখিত ভূর্জ্জপত্রখানি দৈবাৎ আমি পাইয়াছি, দেখি, এ সময় রাজালয়ে গেলে দৈবাৎ অর্থপ্রাপ্তি কিছু হয় কি না!

ব্রাহ্মণ এই সকল এবং অন্যান্য নানা কথা বলিলেন। সে দিন আর তাঁহার রাজবাড়ী যাওয়া হইল না। পর দিন রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া তিনি রাজবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের

একখানি জীর্ণ শতধাছিন্ন নামাবলী ছিল, ব্রাহ্মণ সেইখানি স্কন্ধে লইয়া 'গণেশ মাধব' 'গণেশ মাধব' বলিতে বলিতে রওনা হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলেই সম্মুখে একটা নদী; নদী পার হইয়া অল্প দূর গেলেই রাজবাড়ী। নদী পার হইবার খেয়া-নৌকা আছে। ব্রাহ্মণ সেই নৌকায় উঠিলেন। নৌকার মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। ভয়ঙ্কর নদীমধ্যে ব্রাহ্মণ 'দুর্গা'নাম জপিতে লাগিলেন। নৌকা কিছু দূরে গেলেই হঠাৎ একটা বাতাস আসিল। দমকা-বাতাসে ব্রাহ্মণের নামাবলীখানি নদীজলে গিয়া উড়িয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ধরিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না; নদীতরঙ্গে তাহা বহু দূরে গিয়া অদৃশ্য হইল। ব্রাহ্মণ নামাবলীখানির জন্য বড়ই দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন,—এ একবস্ত্রে আমি রাজার কাছে কেমন করিয়া যাইব? ফিরিয়া যাই। আবার ভাবিলেন,—না, ফিরিয়া গিয়াই বা কি করিব? আমার তো দ্বিতীয় বস্ত্র নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ নদীপার হইয়া সেই একবস্ত্রেই রাজার নিকট গেলেন। ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার; সুতরাং তিনি বরাবর রাজার সম্মুখে গিয়া নিজের দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিলেন; কহিলেন,—রাজন্! আমি বড় দরিদ্র; বাল্যে বিদ্যার্জ্জন তেমন করিতে পারি নাই, কাজেই এতদিন আপনার নিকট আসি নাই, অন্যত্র ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছি। কিন্তু এখন আর চলে না; তাই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার সম্পত্তির মধ্যে একখানি অতি জীর্ণ নামাবলী ছিল; তাহাও আসিবার সময় নদীতরঙ্গে গ্রাস করিয়াছে; বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

রাজা ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা শুনিলেন, শুনিয়া একটু যেন দুঃখের হাসি-রেখা ছড়াইয়া এই মাত্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! 'সে দিন আর এ দিন!'

ব্রাহ্মণ রাজার কথার অর্থ কিছু বুঝিলেন না, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভাবিলেন,—রাজা বুঝি কিছু অর্থ দিবেন, কিন্তু তাহা দিলেন না। শেষে বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভগ্নমনে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ যখন ফিরিয়া আইসেন, তখনও রাজা আর একবার বলিলেন,—'সেদিন আর এদিন!'

ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া দুঃখের সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া রিক্তহস্তে ব্রাহ্মণীর নিকট দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণী পতিকে রিক্ত-হস্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন,—এ কি, রাজা তোমায় কিছুই দিলেন না! তবে কি দৈবের লিখনও মিথ্যা হইল! আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, রাজা কি তোমায় একটা কথাও কহিলেন না?

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমার নামাবলীখানি নদীজলে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, এই কথা যখন বলিলাম, মাত্র তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—ব্রহ্মন্! 'সে দিন, আর এ দিন!' আর কিছুই কহিলেন না, শেষে আসিবার সময়ও ঐ সেই একই কথা কহিলেন।

বুদ্ধিমতী ব্রাহ্মণী এ কথা শুনিয়া একটু ভাবিলেন, পরে পুলকিত হইয়া বলিলেন,—চিন্তা নাই; তোমাকে আরও একবার যাইতে হইবে। আমি যাহা বলিয়া দি, তুমি গিয়া রাজাকে তাহা বলিবে; দেখিবে—রাজা তোমায় প্রচুর অর্থ দিবেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি তো কিছুই বুঝি নাই; তবে তুমি যদি বল তো, আর একবার যাইতে পারি। অদ্য আর যাইব না, আগামী কল্য যাইব।

তাহাই হইল। ব্রাহ্মণ পরদিন প্রভাতে রাজধানী যাইতে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণী পূর্ব্বদিন একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী যাইবার সময় সেই প্রস্তরখণ্ড তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি এবার রাজার নিকট গিয়া অন্যান্য কথার পর রাজাকে এই প্রস্তরখণ্ড দেখাইয়া বলিবেন,—রাজন্! আমার পত্নী এই প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া পাইয়াছেন। ইহার গুণ এই যে, ইহা জলে দিলে ডুবে না; জলোপরি সর্ব্বদাই ভাসিতে থাকে। এই কথার পর রাজা যখন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, এ কথা ঠিক্ নহে; তখন আপনি বলিবেন,—মহারাজ! 'সে দিন, আর এ দিন!' এই কথা বলিলেই রাজার কথার উত্তর হইবে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে বহুধন দান করিবেন।

ব্রাহ্মণ তাহাই করিলেন। তিনি যথাকালে পুনর্ব্বার রাজার নিকট গিয়া রাজাকে অনাময় প্রশ্ন করিলেন। রাজাও কুশল প্রশ্নান্তে ব্রাহ্মণকে বসিবার আসন দিলেন। ব্রাহ্মণ সেই কৃষ্ণপ্রস্তর খানি রাজার হাতে দিয়া কহিলেন,—রাজন্! আমার পত্নী এই প্রস্তরখানি পাইয়াছেন। ইহার গুণ এই যে, ইহা জলে দিলে ডুবে না; জলোপরি ভাসিতে থাকে।

রাজা এই কথায় কুতূহলী হইয়া তৎক্ষণাৎ এক পাত্র জল আনাইলেন, এবং সেই জলে প্রস্তরখানি ফেলিয়া দিয়া দেখিলেন,—প্রস্তর জলে ভাসিল না; তাহা জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। রাজা বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ, তোমার কথা তো সত্য হইল না; ইহা জলে ফেলিবা মাত্রই যে ডুবিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে কহিলেন,—রাজন্! 'সে দিন আর এ দিন!'

রাজা এই কথা শুনিবা মাত্রই একটু চিন্তা করিলেন; পরে তাঁহার

কথার যোগ্য উত্তর হইয়াছে ভাবিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি মহাসন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন দান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিলেন।

বাদসাহ জিজ্ঞাসিলেন,—পণ্ডিতজী, এ গল্পের মর্ম্ম তো আমি বুঝিলাম না; রাজা ও ব্রাহ্মণ একই কথা কহিলেন। কাহার কথার কিরূপ ভাব দাঁড়াইল, তাহা আমায় বুঝাইয়া বলুন।

পণ্ডিতজী বলিলেন,—জাঁহাপনা! প্রথমে রাজা যে ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—'সে দিন, আর এ দিন!' তাহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বে অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকেও পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ এমনই দিন উপস্থিত যে, একটা নদীতরঙ্গে আপনার নামাবলীখানি নষ্ট হইল। আপনি সেই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াও কিছুই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। আর ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণীর পরামর্শ মত রাজাকে আসিয়া বলিলেন,—'সে দিন আর এ দিন!' তাহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস রামচন্দ্র সমুদ্রোপরি বৃহৎ বৃহৎ শিলা ভাসাইয়া সেতু বাঁধিয়াছিলেন, আর আজ এমনই দিন উপস্থিত যে, আপনি সেই ক্ষত্রিয়-বংশধর হইয়া সামান্য একটুকু প্রস্তরখণ্ডও জলে ভাসাইতে পারিলেন না!

বাদসাহ হিন্দু জাতির পৌরাণিক প্রস্তাব অনেক জানিতেন; সুতরাং গল্পের শেষ ব্যাখ্যায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়া পণ্ডিতজীর গল্পের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কুব্জ ও সুন্দর।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! পূর্ব্বে মদ্রদেশে মণিভদ্র নামে এক ধনাঢ্য বৃদ্ধ বাস করিত। বৃদ্ধ জাতিতে ক্ষত্রিয়, দেখিতে অতি কদাকার। তাহার জ্ঞাতি গোত্র অনেক ছিল; কিন্তু তাহার নিজের সংসারে সে ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

মণিভদ্র কেবল যে বৃদ্ধ ও কদাকার, তাহা নহে; মদ্রদেশের সে এক জন সুবিখ্যাত কুব্জ; তদুপরি অত্যন্ত কৃপণ। এইজন্য ধন দৌলত প্রচুর থাকিলেও তাহার করে এ যাবৎ কেহই কন্যা দান করে নাই। মণিভদ্রের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা তাহার বিবাহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোনই ফল ফলে নাই। কাজেই মণিভদ্র বিবাহে নিরাশ হইয়া নিজের যে কিছু অর্থ ছিল, তাহারই বৃদ্ধিসাধনে মন দিল।

ক্রমে অনেক কাল কাটিল। মণিভদ্রের ধন কালে লক্ষ্যগুণ বৃদ্ধি পাইল। ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্পণ্য অতিমাত্র বাড়িল। পূর্ব্বে যখন ধনের মাত্রা অল্প ছিল, তখন সে বিলক্ষণ দান-'খয়রাত' করিত; ধর্ম্ম কর্ম্ম করিত; অনেক অনাথ আতুরের অন্ন সংস্থান করিয়া দিত; কিন্তু ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে সকল দান-'খয়রাত' রহিত হইল; ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাইল। এখন সে একটী অর্দ্ধ পয়সার জন্যও লোককে পীড়ন করিতে কুণ্ঠিত নহে। কাজেই তাহার ব্যবহারে দেশের লোক চটিল।

দেশের লোক চটিল তো কি হইল? দেশের যিনি রাজা, তিনি মণিভদ্রের উপর সদাই সন্তুষ্ট। মণিভদ্র প্রভূত ধনের মালিক হইয়াছিল। রাজার রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে যখনই যত ধনের আবশ্যক হইত, মণিভদ্র

সামান্য মাত্র সুদ লইয়া রাজ-সরকারে তৎক্ষণাৎ সেই ধন যোগাইত। কাজেই রাজ-সরকারে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি না হইবে কেন? চতুর মণিভদ্র অর্থ-বলেই রাজাকে হাতে রাখিয়াছিল। রাজা তাহার উপর সর্ব্বদাই প্রসন্ন ছিলেন; সুতরাং সে যদি অন্যত্র লোকের উপর কখন কোন অত্যাচারও করিত, তথাপি তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট কেহ কোন অভিযোগ করিতে সাহসী হইত না।

এ দিকে এত ধনের—এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও বৃদ্ধ মণিভদ্রের মনে কিন্তু সুখ নাই। মণিভদ্র এক দিন রাত্রিকালে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল,—আমি কি অপদার্থ! আমার জন্মটা বৃথাই কাটিয়া গেল। রমণী সম্ভোগ-সুখ আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমি এ যাবৎ প্রায় দুই তিন কোটী টাকার মালিক হইয়াছি, দিব্য দিব্য দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী-বাগান বাপী-কূপাদি করিয়াছি, এ রাজ্যের যিনি রাজা, তিনি আমায় যথেষ্ট মান্য মাননা করেন, আমি ইচ্ছা করিলে বহু লোকের উপর আধিপত্য করিতে পারি; কিন্তু এত থাকিতেও সংসারের সেই প্রকৃত সুখে আমি সুখী হইতে পারিলাম না। এক একবার অবৈধভোগে ইচ্ছা হয়; কিন্তু পারি না, তাহাতে প্রচুর অর্থের অপচয়; সর্ব্বোপরি পাপ বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মপত্নী বিনা পুত্র-লাভের উপায় নাই; পুত্র বিনা পর-লোকে পিণ্ডোদক প্রাপ্তির আশা নাই। না জানি, পরলোকে অপুত্রক-দিগের কত দুর্দ্দশাই ঘটে! কত চেষ্টা করিলাম, কত অর্থের প্রলোভন দেখাইলাম, কিছুতেই দার সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; আমি কদাকার বলিয়া কোন সুন্দরী কন্যাই আমার করে কেহ অর্পণ করিতে চাহিল না। যাহা হউক, আরও একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। এবার কিছু অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া নানা দিকে লোক নিযুক্ত করি, দেখি,—সুন্দরী

কন্যা মিলে কি না! আর এক কথা, আমি পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতাম, এখন আর তাহা করি না; হয় তো বা এই জন্যই বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। অতএব এখন হইতে আমি পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম-কর্ম্মে মনোযোগী হইব; প্রত্যহ একটী করিয়া ব্রাহ্মণকে পরি-তোষরূপে আহার করাইব।

মণিভদ্র রাত্রিকালে শুইয়া শুইয়া যাহা স্থির করিলেন, পরদিন হইতেই তাহার অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। লোকে প্রথম প্রথম মণিভদ্রের এই মতি-পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইল, শেষে স্থির করিল,—মণিভদ্র বৃদ্ধ হইয়াছে; নিজের অপার ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করিবে, এই ভাবিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দিয়াছে। ভালই হইয়াছে। এখন আর বোধ হয় অর্থ অর্থ করিয়া প্রাণপাত করিবে না, আর আর্থিক ব্যাপারে লোককে অযথা পীড়ন করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে।

দেশবাসীরা যাহা ভাবিল, মণিভদ্র কিন্তু ততদূর ধার্ম্মিক এখনও হইতে পারে নাই। তাহার স্বভাব চরিত্র পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল; পরিবর্ত্তন এই মাত্র হইল যে, মণিভদ্র প্রত্যহ কিছু কিছু খরচ করিয়া এক একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে লাগিল। আর দীন দুঃখীদিকে মাসের মধ্যে পাঁচ ছয় দিন কিছু কিছু আটা ও পয়সা বিতরণ করিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছু দিন চলিল। এক দিন মণিভদ্রের নিযুক্ত কোন লোক আসিয়া মণিভদ্রকে গোপনে বলিল,—মহাশয়! অনেক কষ্টে একটী সুন্দরী কন্যার সন্ধান পাইয়াছি। কন্যার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র; আপনি যদি এককালীন কিছু অধিক অর্থ তাহাকে দান করেন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে কন্যাদানে সম্মত আছেন।

মণিভদ্র। অর্থের পরিমাণ কত?

আগন্তুক। পঞ্চ সহস্র মুদ্রা।

মণিভদ্র। বেশ কথা, কন্যার পিতা যত অর্থই চাহে, আমি দিতে রাজী আছি; কিন্তু সত্বরই বিবাহ কার্য্যটী হওয়া চাই। নতুবা লোকে কু-পরামর্শ দিয়া কন্যাকর্ত্তাকে বিগড়াইয়া দিবে। আমার মতে আগামী পরশ্ব দিনে সম্প্রদান-কার্য্যটী হইয়া গেলেই ভাল হয়। অবশ্য তোমাকেও আমি পুরস্কার দিব। জিজ্ঞাসা করি,—কন্যাটী বেশ সুন্দরী তো?

আগন্তুক। হাঁ মহাশয়, কন্যাটী পরমা সুন্দরী। এ দেশে সেরূপ কন্যা আর আছে কি না সন্দেহ।

মণিভদ্র। আচ্ছা, তুমি এখনই রওনা হও; যাহাতে ঐ দিনই বিবাহ কার্য্য হইতে পারে, কন্যাকর্ত্তাকে বলিয়া-কহিয়া তাহার ব্যবস্থা করগে'।

আগন্তুক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বিদায় হইল। মণিভদ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—বাপ্‌রে, পঞ্চ সহস্র মুদ্রা! এক সঙ্গে এত টাকা দিতে পারিব কি? আমার প্রবৃত্তিতে ইহা লইবে কি? যদি না দেই, তবে তো এ শুভ সুযোগটী হাত-ছাড়া হয়। আমার ভাগ্যে বিবাহ হয় তো আর হইবেই না; অতএব কৌশলে কার্য্যটী করিতে হইবে। আমারও অর্থ না লাগে, বিবাহটীও হইয়া যায়, এমন কিছু একটা করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া ধূর্ত্ত মণিভদ্র সেই দিনই সন্ধ্যাকালে কতকগুলি দগ্ধ মৃণ্ময় পাত্র সংগ্রহ করিল এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, সেই গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঘসিয়া মাজিয়া এক একটী মুদ্রার ন্যায় গোলাকারে প্রস্তুত করিল। সমস্ত রাত্রি,—তৎপর দিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিল। এই উপায়ে রাশি রাশি মৃণ্ময় মুদ্রা প্রস্তুত হইল। পরে তিন চারিটী থ'লের ভিতর পুরিয়া ঐ সব মুদ্রা এক স্থানে রাখিয়া দিল।

এদিকে বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য পূর্ব্ব দিন যে লোক গিয়াছিল, এক্ষণে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। মণিভদ্র সহর্ষে তাহার নিকট সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আগন্তুক বলিল,—আপনার কথা মত আমি কন্যার পিতাকে সকল বিষয় বলিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি সেই কথার উত্তরে বলিলেন,—বর্ত্তমান মাসে বিবাহের দিন নাই। আগামী কল্য অতি গর্হিত দিন; এ দিনে বিবাহ হইলে, পতিপত্নীর চির-কলহ, চিরবিচ্ছেদ; এমন কি পত্নীর বৈধব্যযোগ নিশ্চিত। অতএব আগামী মাসে কোন উত্তম দিন দেখিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে, ইহাই গিয়া তুমি মণিভদ্রকে বল।

আমি এই কথা শুনিয়াই অবিলম্বে চলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, করুন।

মণিভদ্র ভাবিলেন, শুভ কার্য্যে বিলম্ব হইলেই বিঘ্ন ঘটে। এখন যদি এক মাস আমাকে অপেক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে হয় তো আমার জীবনে বিবাহ আর নাও হইতে পারে। অতএব বিলম্ব কিছুতেই করা হইবে না। আমি এই কৃত্রিম টাকাগুলি লইয়া কন্যার পিতার নিকট যাই। দরিদ্র পিতা এই রাশি রাশি টাকা দেখিলেই যে-কোন দিনে কন্যাদান করিবে। আর ঐ যে বৈধব্য-যোগ, কলহ-যোগ, ইত্যাদি শাস্ত্র-বচন আছে; উহা সকল সময় ফলেও না; আর যদিই বা আমাকে এই বিবাহ করিয়া মরিতে হয়, তবুও তো মনের সাধটা মিটাইয়া মরিতে পারিব। আর, অদিনে বিবাহ করিলে মরিতে হইবে বলিয়া, যে দিন বিবাহ করিব, সেই দিনেই যে মরিব, তাহারই বা অর্থ কি? বিবাহের পর যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব, সে কয়দিনও তো স্ত্রী লইয়া

সুখভোগ করিতে পারিব। অতএব যতই অশুভ দিন হউক, আমি কালই বিবাহ করিব।

মণিভদ্রের যাহা সংকল্প, কাজও সেইরূপই হইল। মণিভদ্র সেই দিনই সন্ধ্যার সময় একখানি শিবিকা মধ্যে কৃত্রিম মুদ্রাপূর্ণ থ'লে গুলি চাপাইয়া চারি জন লোক সহ ভাবী শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। তাহার বিবাহের বিষয় গ্রাম্য লোকে কিছুই জানিল না। বিবাহের পূর্ব্বে এ সংবাদ কেহ জানে, মণিভদ্রের সেরূপ ইচ্ছাও ছিল না; তাই মণিভদ্র চুপি চুপি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে গ্রাম ত্যাগ করিল; ক্রমে রাত্রি যখন প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, তখন সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। যে লোক বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করিতেছিল, মণিভদ্র তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছিল; কাজেই পথ পরিচয় সম্বন্ধে মণিভদ্রকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইল না।

এ দিকে কন্যার পিতা অদিনে কন্যা বিবাহ দিবেন না, স্থির করিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মণিভদ্র তিন চারিজন লোক সহ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া অনেক ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করিতে লাগিল। কন্যার পিতা জাগ্রৎ হইলেন, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করায় মণিভদ্র কহিল,—মহাশয়! আপনি এই পঞ্চ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া আজই আপনার কন্যাটীকে আমার করে অর্পণ করুন।

দরিদ্র কন্যাকর্ত্তা প্রথমে দুই তিন বার অদিনে কন্যাদানে আপত্তি করিলেন; কিন্তু শেষে প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহাকে সেইক্ষণেই অবৈধ ভাবে কন্যাদান করিতে হইল। কন্যাকর্ত্তার জ্ঞাতি পক্ষও এ বিবাহ জানিতে পারিলেন না। মণিভদ্রের অনুরোধে কার্য্যটী অতি সত্বর সমাধা করিতে হইল; তাই টাকা-পোরা থ'লেগুলি খুলিয়া গণিয়া গাথিয়া

দেখিবারও সময় হইল না। মণিভদ্রের লোক থ'লে গুলি যেখানে আনিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, মণিভদ্রের শ্বশুরালয় পরিত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেগুলি সেইখানেই রহিল।

কন্যাদান হইয়া গেল। মণিভদ্র বলিল,—আমাদের কুল প্রথানুসারে আজই আমাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কন্যাকর্ত্তা কৌলিক প্রথায় আপত্তি করিলেন না। বুদ্ধিমতী কন্যা পিতার অর্থকষ্ট ঘুচিল মনে করিয়া, কুব্জ কুরূপ মণিভদ্রের সঙ্গিনী হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও নিরানন্দ হইলেন না। মণিভদ্র স্ত্রীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া রাত্রি ভোর হইবার প্রাক্‌কালেই স্বগ্রামে স্বগৃহে আসিয়া পৌঁছিল।

মণিভদ্রের শিবিকাবাহীরা পুরস্কার পাইয়া বিদায় হইল। মণিভদ্র স্ত্রীর হাত ধরিয়া স্বীয় অট্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মণিভদ্রের স্ত্রী দরিদ্রের কন্যা; সে স্বামীর সেই অট্টালিকা এবং অট্টালিকার উপযোগী আসবাব পত্র দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত ও পুলকিত হইল। বৃদ্ধ মণিভদ্রও গত রাত্রি ব্যস্ততার জন্যই হউক অথবা বার্দ্ধক্য-জন্য দৃষ্টিদোষেই হউক, স্ত্রীর দেহশ্রী ভাল করিয়া দেখিতে পারেন নাই, এক্ষণে স্বগৃহে দিবালোকে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইয়া মনে মনে পরম আনন্দিত হইলেন; ভাবিলেন,—এমন রমণীরত্ন লাভ করিয়া আমার জীবন সার্থক হইল। আমার ভাগ্যে যে শেষ জীবনে এমন একটী সুন্দরী ললনা লাভ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। বস্তুতঃ ইহা আমার ধর্ম্ম কর্ম্মেরই ফল। অতএব ইতিপূর্ব্বে যেরূপ যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছিলাম, বরাবর আমি সেইরূপই করিব; ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িব না; প্রত্যহ মধ্যাহ্নে যে এক একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিলাম, আজীবন তাহাই আমি করিতে থাকিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মণিভদ্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় এ দিনেও একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল। প্রত্যহ এক একটী নবাগত অতিথি ব্রাহ্মণ মণিভদ্রের গৃহে উত্তমরূপ ফলাহার করিতে লাগিলেন।

দুই দিন গেল। তিন দিনের দিন মণিভদ্রের শ্বশুর মণিভদ্রের গৃহে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—ওরে বৃদ্ধ কুব্জ কৃপণ! আমি অর্থ কষ্টে পড়িয়া তোর ন্যায় কুরূপের করে সোণার প্রতিমা অর্পণ করিলাম, তুই আমাকে প্রতারণা করিলি! তুই টাকার পরিবর্ত্তে কতকগুলি দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড আমায় দিয়া আসিলি! এই ভীষণ প্রতারণার ফলে তোর তো নরকেও স্থান হইবে না! তুই চিরদিনের পর-প্রতারক, শঠ, ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। তুই আমার প্রতিশ্রুত টাকাগুলি দে; নচেৎ ভগবানের কাছে অচিরেই ইহার বিচার-ফল ভোগ করিবি।

এই বলিয়া মণিভদ্রের দরিদ্র শ্বশুর কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা প্রতারিত হইয়াছেন শুনিয়া কন্যাও সে ক্রন্দনে যোগদান করিলেন। ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ অট্টালিকামধ্য ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল। সে শব্দ শুনিয়া বাহিরে বহু লোক জড় হইল। ক্রমে সকল কথা প্রকাশ পাইল। লোকে এইবার মণিভদ্রের বিবাহ-রহস্য জানিতে পারিল। তাহারা মণিভদ্রের স্বভাব চরিত্র পূর্ব্ব হইতেই জানিত; এক্ষণে এই প্রতারণামূলক বিবাহের কথা শুনিয়া প্রকাশ্যেই মণিভদ্রকে গালি মন্দ করিতে লাগিল।

মণিভদ্র শ্বশুরের কটুবাক্য শুনিয়া প্রথমেই রাগিয়াছিল; কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলে নাই; এক্ষণে বাহিরের লোকের গালি মন্দ, তদুপরি শ্বশুর ও স্ত্রীর উচ্চ ক্রন্দন শুনিয়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইল। বলিল,

ফের যদি আমার বাড়ীতে কেউ চেঁচামেচি করে, তবে আমি তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিব। আমি মণিভদ্র—লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, স্বয়ং রাজা আমার খাতক; আমি কি কখন প্রতাবণা করিতে পারি?—না জানি? আমি আসল রূপার টাকাই দিয়া আসিয়াছি, তার পর কেমন করিয়া কি হইল, তার জন্য আমি দায়িক হইব কেন?

এদিকে বাহিরের লোকজন বাহিরে থাকিয়া সেইরূপই গালিমন্দ করিতেছিল, তখন মণিভদ্রের দুইজন বলিষ্ঠ খোজা দারবান্ মণিভদ্রের হুকুমে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। শ্বশুরের ক্রন্দন তখনও থামে না দেখিয়া মণিভদ্র দারবান্ সাহায্যে তাঁহাকেও বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। শ্বশুর কাঁদিতে কাঁদিতে রাজদ্বারে যাইতেছিলেন, কিন্তু গ্রাম্য লোকের মুখে রাজদ্বারে মণিভদ্রের পসার-প্রতিপত্তির কথা শুনিয়া তিনি আর সেদিকে গেলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজাবাসেই ফিরিয়া আসিলেন।

মণিভদ্রের স্ত্রী এই ব্যাপারে আরও মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে লাগিল; মণিভদ্র প্রথমে তাহাকে নানা কথায় বুঝাইয়া শুঝাইয়া প্রকৃতস্থ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। সে আরও কাঁদিতে লাগিল। তখন মণিভদ্র রাগিয়া স্ত্রীকে একটা ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিল। স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া মনের দুঃখে সেই ঘরেই সমস্ত দিন-রাত্রি কাটাইল।

পরদিন মণিভদ্রের ক্রোধ কিঞ্চিৎ কমিল, সে ঘর খুলিয়া দিল। স্ত্রী মনের দুঃখ, ক্ষোভ ও রোষ মনে মনে চাপিয়া রাখিয়া পুনর্ব্বার গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইল। মণিভদ্র ভাবিল,—ল্যাঠা চুকিল। স্ত্রী শান্ত হইয়াছে; এখন আর আমার ভাবনা নাই।

মণিভদ্র এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল বটে; কিন্তু তাহার স্ত্রী মণিভদ্র-কৃত পিতার প্রতারণার কথা মনে করিয়া মণিভদ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রহিল। স্ত্রীর ক্রোধের ভাব আশনে শয়নে প্রকাশ পাইতে লাগিল; তবে গৃহকর্ম্মে সে ঔদাস্য করিত না, রন্ধনাদি সমস্ত কর্ম্মই করিতে লাগিল; কিন্তু মণিভদ্রের সহিত কোন কথাই কহিতে লাগিল না। মণিভদ্র যে দিন যে বস্তু আনিয়া রাঁধিয়া দিতে বলিত, মণিভদ্রের স্ত্রী তাহাই তাহাকে রাঁধিয়া দিত। রাত্রিতে শয়নার্থ সাধ্য সাধনা করিলেও স্ত্রী কিছুতেই এক শয্যায় শয়ন করিত না।

মণিভদ্র স্ত্রীর এরূপ ব্যবহারে বিরক্ত, এমন কি—সময় সময় ক্রুদ্ধ হইত বটে, কিন্তু বেশী কিছু বলিত না; ভাবিত—এখনও অল্প বয়স, যৌবন আসিলে এ ভাব থাকিবে না। আমি ইচ্ছা করিলে এখনই স্ত্রীর এই অপ্রসন্ন ভাব দূর করিতে পারি; মাত্র পাঁচটী হাজার টাকা শ্বশুরকে দিলেই স্ত্রী আমার অনুরাগিণী হইতে পারে; কিন্তু সহজে তাহা করা হইবে না। এখন এইভাবে কিছুদিন যাউক; যৌবনে আপনা হইতেই স্ত্রী আমার অনুরাগিণী হইবে। ইহাতে আমার টাকাগুলিও থাকিয়া যাইবে; কার্য্যও সিদ্ধ হইবে।

মণিভদ্র এই ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্ত্রী যেরূপ যাহা করিতে লাগিল, তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইল না, বা স্ত্রীর ক্রোধ শান্তির কোন উপায় করিল না।

এই ভাবে দিন যাইতে লাগিল। মণিভদ্র প্রত্যহ যে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছিল, সে কার্য্যও সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল।

ক্রমে মণিভদ্রের স্ত্রী ষোড়শী যুবতী হইল। নব-বসন্তাগমে নবমল্লিকার ন্যায় যৌবনে মণিভদ্র-ভামিনীর সুষমারাশি সমধিক প্রকাশ পাইল।

সে রূপের ছটায় মণিভদ্রের উজ্জ্বল ভবন আরও উজ্জ্বল হইল—মণিভদ্রের চো'ক ঝলসিয়া গেল। মণিভদ্র ভাবিল,—এ রূপ কোন রূপবানের চো'খে পড়িলে নিশ্চয়ই কুফল ফলিবে; শুধু রূপবান্ বলিয়া কথা কি, অন্য কোন পুরুষেরই চক্ষু যাহাতে এই রূপরাশির উপর না পড়ে, সে পক্ষে সাবধান হইতে হইবে। আমি যে প্রত্যহ এক একটী করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আসিতেছি, তাহা এখন একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত হইলেও সহসা তাহা করা হইবে না। তবে এ সম্বন্ধে কল্য হইতেই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে হইবে। নিয়মটী এইরূপ করিলেই ভাল হয়; যথা—যিনি ভোজনার্থী হইয়া অসিবেন, তাঁহাকে অগ্রে বলিয়া দিব যে, আপনি অন্য কোন দিক না তাকাইয়া মাথা নীচু করিয়া আমার বাড়ীর ভিতর যাইবেন এবং মাথা নীচু করিয়া খাইয়া আসিবেন, উপর দিকে তাকাইতে পারিবেন না, আমার স্ত্রী পরিবেশন করিতে আসিলে তাহাকে দেখিতে পাইবেন না; যদি এ নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমা করা হইবে না, তৎক্ষণাৎ অপমানিত করিয়া আপনাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। যদি এই নিয়মে বাধ্য হন, তবে আমার গৃহে খাইতে আসুন, নচেৎ বিদায় হউন।

মণিভদ্র মনে মনে এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিল। পরদিন হইতে ঐ নিয়মেই কাজ চলিল। এখন হইতে মণিভদ্রের ভবনে যে যে ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ আসিতে লাগিলেন, মণিভদ্র তাঁহাদের প্রত্যেককেই প্রত্যহ উক্ত নিয়মে বাধ্য করিয়া ভোজন করাইতে লাগিল। কিন্তু এই নিয়মের ফল বড়ই বিষম হইয়া দাঁড়াইল। ইহাতে দুই একজন হুঁসিয়ার ব্যক্তিই মণিভদ্রের গৃহ হইতে ভোজন করিয়া অক্ষতদেহে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিলেন; তদ্‌বাদে অন্য অনেক ভোজনার্থীকেই অর্দ্ধভুক্ত, পূর্ণভুক্ত বা

একেবারেই অভুক্ত অবস্থায় প্রহারিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মধ্যাহ্নকালে মণিভদ্রের গৃহ ত্যাগ করিতে হইতে লাগিল। ফলে নবাগত ভোজনার্থী নিয়ম পালনে সম্মত থাকিয়াও ভোজন কালে বিস্মরণ ক্রমে কখন কখন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া হঠাৎ মণিভদ্রের পত্নীর দিকে তাকাইয়া ফেলিত, আর নিকটোপবিষ্ট মণিভদ্র তৎক্ষণাৎ তাহার খোজা দ্বারবান্ দ্বয়কে ডাকিয়া হুকুম দিত,—"মারো, ধরো, ইহাকে বাহির করিয়া দাও।" দ্বারবান্ দ্বয় প্রভুর আদেশ তদ্দণ্ডেই পালন করিত। অনেক প্রহারিত লাঞ্ছিত ব্যক্তি রাজদ্বারে মণিভদ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিতেন, কিন্তু ফল কিছুই হইত না। ক্রমে দেশস্থ লোক আর মণিভদ্রের ভবনে ভোজনার্থ যাইত না; তবে না জানিয়া ক্ষুধার্ত্ত বহু বিদেশী ব্যক্তিই ভোজনার্থ মণিভদ্রের গৃহে গিয়া ঐরূপে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রহারিত হইত।

এই ভাবে কিয়দ্দিন কাটিল। মণিভদ্রের ঐরূপ অত্যাচারকাহিনী শুনিয়া সকল লোকই তৎপ্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বুঝি বা ভগবান্ও তাহার প্রতি রুষ্ট হইলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ যুবক তীর্থক্ষেত্রে কোন সঙ্কল্পিত ব্রত সাঙ্গ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে মধ্যাহ্নকালে মণিভদ্রের ভবনে অতিথি হইলেন। যুবক গৌরবর্ণ; দেখিতে পরম সুন্দর; নামও তাঁহার সুন্দর। সুন্দর কৃতাহ্নিক হইয়া মণিভদ্র-ভবনে আসিবা মাত্র মণিভদ্র কহিল,—মহাশয় আমার এখানে ভোজন করিবেন, আপত্তি নাই; কিন্তু আমার একটি নিয়ম আছে, আপনাকে সেই নিয়মে বাধ্য হইয়া ভোজন করিতে হইবে।

সুন্দর কহিলেন,—আপনার কি নিয়ম আছে বলুন। মণিভদ্র কহিল,—নিয়মটী এই যে, আমার গৃহে আহার করিতে হইলে মাথা হেঁট

করিয়া অন্দরে যাইতে হইবে এবং আহারের সময়ও মাথা হেঁট করিয়া আহার করিতে হইবে; আমার স্ত্রী পরিবেশন করিতে আসিবেন, তাঁহার দিকে আপনি তাকাইতে পারিবেন না। যদি তাকান, তবে তদ্দণ্ডেই আপনাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিব।

সুন্দর কহিলেন,—এ আর এমন শক্ত নিয়ম কি? বিশেষ আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছি, আহারই মাত্র করিব; আপনার পত্নীকে দেখিয়া আমার কি হইবে, আর অনর্থক আমি তাঁহাকে দেখিবই বা কেন? আপনার কোন নিয়ম না থাকিলেও আমি দেখিতাম না।

মণিভদ্র সুন্দরের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। সুন্দর ভোজনে বসিলেন। মণিভদ্র তাঁহার নিকটে বসিল। অবগুণ্ঠনবতী মণিভদ্রপত্নী অতিথিকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অতিথি যথানিয়মে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আহার কিয়ৎপরিমাণ হইয়াছে, এমন সময় কি জানি কিরূপে দুই ফোঁটা জল উপর হইতে অতিথির মস্তকে আসিয়া পড়িল, অতিথি অমনি উপরের দিকে তাকাইলেন। এ সময় মণিভদ্রপত্নীও আর একবার পরিবেশনার্থ অতিথির অতি নিকটে আসিয়াছিলেন। মণিভদ্র নিকটেই ছিল; তাহার ধারণা হইল—এই ত ব্রাহ্মণ নিয়মভঙ্গ করিয়া আমার পত্নীকে দেখিয়া ফেলিল। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সে তৎক্ষণাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল,—ওরে বামুন, তুই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমার পত্নীর প্রতি নজর দিয়াছিস্; অতএব এখনই তোকে এই দুষ্কার্য্যের ফল দিতেছি।

এই বলিয়া মণিভদ্র তাহার খোজা দ্বারবান্দ্বয়কে ডাকিয়া ব্রাহ্মণ-যুবককে প্রহার করিতে হুকুম দিল। হুকুম হইবা মাত্র দ্বারবান্দ্বয় তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যুবক চীৎকার করিয়া বলিলেন,

—বৃদ্ধ, আমি তোমার পত্নীর প্রতি নজর দেই নাই, আমার মাথায় কোথা হইতে জল পড়িতেছিল, আমি তাহাই দেখিতেছিলাম।

মণিভদ্র ব্রাহ্মণযুবকের মুখে 'বৃদ্ধ' সম্বোধন শুনিয়া আরও চটিয়া গেল; খোজাদ্বয় প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য ব্রহ্মণযুবককে মারিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের আহার তো হইলই না, তদুপরি প্রহারের চোটে তাঁহার দেহের অনেক স্থান ক্ষত হইল, ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণযুবক সেই মধ্যাহ্নে রক্তাক্তদেহে কাঁদিতে কাঁদিতে পথ চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে অনেক দূর গিয়া এক স্থানে একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াশীতল তলদেশে বসিয়া দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,—উঃ লোকটা কি পাষণ্ড! আমি ব্রাহ্মণসন্তান, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারে বসিয়াছিলাম, আমাকে কিনা অভুক্ত অবস্থায় মারিয়া তাড়াইয়া দিল! ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, প্রহারে পিঠ জ্বলিতেছে, দেহের নানা স্থানে ক্ষত হইয়াছে। দুরাত্মা মণিভদ্র আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিল, ইহার কি কোন প্রতীকারই নাই? নিশ্চয়ই আছে। তবে আমি এজন্য কোন মানবের সাহায্য লইব না, কোন দৈবশক্তি লাভ করিয়াই আমি ইহার উচিত বিধান করিব।

রোষে দুঃখে ক্ষোভে ব্রাহ্মণযুবক সেই নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়াই আভিচারিক সাধনা করিতে লাগিলেন। উপবাসে উপবাসে তাঁহার অঙ্গ কৃশ হইয়া গেল। দিন-রজনী দেবারাধনায়ই তিনি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বহু সাধনায় বহু দিন পরে দেবতার আসন টলিল।

একদিন নিশীথকালে সেই বৃক্ষ হইতে কে যেন গম্ভীর স্বরে কহিল,—"সুন্দর! তুমি এই কঠোর সাধনা হইতে নিবৃত্ত হও। আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।"

সুন্দর সেই কথা শুনিয়া সানন্দে উৰ্দ্ধে বৃক্ষাভিমুখে তাকাইলেন এবং যুক্তকরে দেবোদ্দেশে কহিলেন,—দেব! আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমাব মনোবাসনা পূর্ণ করুন। আপনি দেবতা; এই কঠোর সাধনায় কেন আজ আমি নিমগ্ন, তাহা নিশ্চয়ই আপনি বুঝিয়াছেন; অতএব আমার বাসনা যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহা আপনি করুন।

সুন্দর এই প্রার্থনা জানাইবামাত্র এক মাহাপুরুষ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুন্দরকে বলিলেন,—এই লও, তোমাকে দুইটী শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ বটিকা প্রদান করিতেছি। এই দুইটী বটীর সাহায্যে তুমি বৈর-নির্য্যাতন করিতে পারিবে।

সুন্দর হাত পাতিয়া বটী দুইটী লইলেন; সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,— প্রভো! এ বটীর গুণ কি, প্রয়োগপ্রণালী কি প্রকার?

আগন্তুক মহাপুরুষ কহিলেন,—উহার মধ্যে যেটী কৃষ্ণ বটিকা, তাহার সাহায্যে তুমি সেই মণিভদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবে, এবং মণিভদ্রের যে কিছু বিষয়-আশয়, গুপ্ত ধন, গুপ্ত কার কারবার বা জ্ঞাতি-গোত্র আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, যে সকল নখদর্পণবৎ জানিতে পারিবে। আর যে শ্বেত বটিকাটী দিলাম, তাহা লইয়া তুমি আবার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবে। আমি আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; তুমি এই দুইটী বটিকার সাহায্যে নিজ বুদ্ধিবলে যতদূর বৈর নির্যাতন করিতে পারো, কর। এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান করিলেন।

সুন্দর তখন বটী দুইটী লইয়া মহাপুরুষোদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক সহর্ষে মণিভদ্রের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মণিভদ্র এ সময় গৃহে ছিল না; সে কোন কর্ম্মোপলক্ষে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। সুন্দর এই সুযোগে কৃষ্ণ বটিকাটী মুখে রাখিয়া মণিভদ্রের বেশে তদীয় গৃহে প্রবেশ

করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে মণিভদ্রের যাবতীয় বিষয়-আশয় ও ধন-রত্নাদির তত্ত্ব অবগত হইলেন। তিনি প্রথমেই দুই যোড়া নূতন বস্ত্র লইয়া বাটীর খোজা দ্বারবান্ দুই জনকে প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন,—তোমরা খুব সাবধানে দ্বার রক্ষা করিবে। আমি শুনিয়াছি,—কোন দুষ্ট লোক মণি-মন্ত্রের সাহায্যে আমার রূপ ধরিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যদি সত্য সত্যই আমার রূপ ধরিয়া কেহ কখন আগমন করে, তবে তাহাকে তোমরা উত্তমরূপ প্রহার দিয়া তাড়াইয়া দিবে।

দ্বারবান্ দ্বয় নবস্ত্ররূপ পুরস্কার পাইয়া পরিতুষ্ট হইল এবং প্রভুর আজ্ঞা-পালনার্থ বিশেষরূপ সতর্ক হইয়া রহিল।

সুন্দর এইবার মণিভদ্রের বেশেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মণি-ভদ্রের স্ত্রী তখন কি একটা কাজে বিব্রত ছিলেন; সহসা স্বামীকে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন,—কি জানি, আবার কোন্ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়?

মণিভদ্রের স্ত্রী যাহা ভাবিলেন, ফল তাহার বিপরীত হইল। মণিভদ্র দ্রুতপদে স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলিল,—আমি এতদিন তোমায় বৃথা কষ্ট দিয়াছি; তোমার পিতাকে বঞ্চিত করিয়াছি; এখন হইতে আমি আর তোমার মনে কোন কষ্ট দিব না। আমি আজই তোমার পিতার প্রাপ্য লক্ষ সহস্র মুদ্রা পাঠাইয়া দিব; তোমাকেও উত্তম উত্তম বসন ভূষণ ও অশন দানে তুষ্ট রাখিব। তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি এখনই তোমায় বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত করি।

মণিভদ্র-পত্নী ভাবিতে লাগিলেন,—এতদিন পরে বৃদ্ধের মতিগতি ফিরিয়াছে। বুঝি বা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছেন; অতএব এখন বৃদ্ধের বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধ যাহা বলে, সাগ্রহে শুনিয়া যাই।

এইরূপ স্থির করিয়া পত্নী পতির অনুগামিনী হইলেন। পতি পত্নীর হাত ধরিয়া একটী বিস্তৃত কক্ষে লইয়া গেলেন। এই কক্ষে কৃপণ মণিভদ্রের মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ও অন্যান্য জিনিষ পত্র সাবধানে সুরক্ষিত হইত। পতি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটী পেঁটরা হইতে বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিতে উদ্যত হইলেন। পত্নী সাগ্রহে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতি মধ্যে বাহিরের সদর দরজায় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। একজন দ্বারবান্ অন্দরাভিমুখে মুখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—হুজুর! একটা লোক আপনার বেশ ধরিয়া অন্দরে যাইতে উদ্যত হইয়াছে। আমরা তাহাকে আটকাইয়াছি।

এই কথা শুনিবা মাত্র কৃত্রিম মণিভদ্র উপর হইতে নীচের সিঁড়ি বাহিয়া কিয়দ্দূর আগমন করিলেন এবং দ্বারবান্ দ্বয়কে কহিলেন,—ঐ দুষ্ট চোর বেটাকে বাঁধিয়া ফেলো, যেন কিছুতেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে। এই বলিয়া আবার তিনি উপরে গেলেন।

দ্বারবান্ দ্বয় প্রভুর হুকুম মত কার্য্য করিতে উদ্যত হইল। প্রকৃত মণিভদ্র রোষে ক্ষোভে চীৎকার করিয়া দ্বারবান্‌দিগকে বলিতে লাগিল, —ওরে নেমকহারাম বেটারা, তোরা কাহাকে আমার বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে দিয়াছিস্? দ্বারবানেরা কহিল,—তুই চোর বদমাইস্, কপটবেশে আমাদের প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিস্?

মণিভদ্রের আর সহ্য হইল না; তিনি ক্রোধভরে হস্তস্থিত বংশ যষ্টি দ্বারা একজন দ্বারবানের মস্তকে প্রহার করিলেন। দ্বিতীয় দ্বারবান্ এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া মণিভদ্রের মাথায় লাঠী মারিল। লাঠী খাইয়া মণিভদ্র পড়িয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া রক্তধারা বহির্গত হইতে লাগিল। মণিভদ্র চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাহিরে বহুলোক জড়

হইল। চীৎকার শুনিয়া উপরের মণিভদ্রও নীচে আসিলেন। ক্রমে সংবাদ পাইয়া কতিপয় রাজপুরুষ সহ একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী মণিভদ্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত ঘটনা শুনিলেন; কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; কে যে আসল. কে যে নকল, তাহার নির্ণয় হইল না। তখন তাঁহারা উভয় মণিভদ্রকেই রাজদরবারে লইয়া গেলেন। বাহিরের জনমণ্ডলী উভয় মণিভদ্রকেই একাকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। কৌতূহল বশে অনেকেই বিচার দর্শনার্থ রাজদরবারে গমন করিল। একজন রাজরক্ষী মণিভদ্রের বাড়ীর সম্মুখে প্রহরায় নিযুক্ত হইল। মণিভদ্রের স্ত্রী উপর হইতে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ভয়ে বিস্ময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একাকী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজবাড়ীতে আজ হুলস্থূল ব্যাপার! এই অদ্ভুত ঘটনার বিচার-দর্শনার্থ দর্শকমণ্ডলী আসিয়া দলে দলে রাজসভায় উপস্থিত। রাজা যথাকালে বিচার করিতে বসিলেন। পাত্র মিত্র পারিষদ্‌বর্গ যে যাহার স্থানে উপবেশন করিলেন। মণিভদ্র রাজার পূর্ব্ব-পরিচিত, বিশেষতঃ রাজার মহাজন, স্বয়ং রাজা তাঁহার খাতক; বহুবার বহু ব্যাপারে রাজা তাহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে দুই মণিভদ্রকে দেখিয়া কে যে তাঁহার পরিচিত আসল মণিভদ্র, আর কে যে নকল মণিভদ্র, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উভয়েরই আকৃতি প্রকৃতি একইরূপ লক্ষ্য হইতে লাগিল।

রাজা উভয়েরই জবানবন্দী লইলেন। উভয় মণিভদ্রই নিজেকে মণিভদ্র বলিয়া পরিচয় দিল। রাজা তখন মণিভদ্রসম্বন্ধে নিজে যতদূর যাহা গুপ্ত তথ্য জানিতেন, তাহা একের অসমক্ষে অন্যকে প্রশ্ন

করিলেন; উভয়েই সে প্রশ্নের হুবহু একই উত্তর প্রদান করিল। তখন রাজা দ্বারিবান্দ্বয়ের সাক্ষ্য লইলেন।

দ্বারবান্ দ্বয় নব বস্ত্ররূপ পারিতোষিক পাইয়া গৃহস্থিত কৃত্রিম মণিভদ্রেরই অনুরক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা জাল মণিভদ্রকেই প্রকৃত মণিভদ্র বলিয়া সনাক্ত করিল, আর প্রহারিত মণিভদ্রকে জাল মণিভদ্র বলিয়া সাক্ষ্য দিল।

অনন্তর রাজা বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মন্ত্রী দ্বারা মণিভদ্রের স্ত্রীর সাক্ষ্য লওয়াইলেন। স্ত্রী সাক্ষ্যে বলিল,—আমার যতদূর বিশ্বাস, তাহাতে গৃহস্থিত অক্ষত মণিভদ্রই আমার স্বামী; আর যে ব্যক্তি প্রহারিত ও লাঞ্ছিত হইয়া গৃহের বাহিরে ছিল, সে জাল মণিভদ্র।

রাজা সাক্ষ্য প্রমাণাদির সাহায্যে যেরূপ বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে অক্ষত দেহ মণিভদ্রকেই তিনি প্রকৃত মণিভদ্র বলিয়া স্থির করিলেন; আর প্রহারিত প্রকৃত মণিভদ্রকে তিনি জাল মণিভদ্র স্থির করিয়া তাহাকে শূলে চাপাইবার আদেশ দিলেন!

রাজার আদেশমাত্র দুইজন ঘাতক আসিয়া মণিভদ্রকে বধ্য ভূমে লইয়া গেল, এবং অবিলম্বে তীক্ষ্ণ শূলে চাপাইয়া দিল। মণিভদ্র শূলে আরোপিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—জনগণ! আমি আসল মণিভদ্র হইলেও আজ রাজবিচারে শূলে আরোপিত হইলাম। এতদিনে বুঝিলাম, উৎকট পাপ বা পুণ্যের ফল ইহকালেই ভুগিতে হয়। আমি আজীবন পাপাচরণ করিয়াছি; বহুলোক বহুপ্রকারে আমার নিকট লাঞ্ছিত, অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছে; শ্বশুরকে বঞ্চনা করিয়াছি; নিজের স্ত্রীকেও একদিনের জন্য সুখভোগ

করিতে দেই নাই ; কড়া সুদে টাকা ধার দিয়া, কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি। আজ সেই সকল পাপের ফল আমার ফলিল।

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই মণিভদ্রের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল ; জনমণ্ডলী উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া যে যাহার স্থানে গমন করিল।

এদিকে মণিভদ্রবেশী সুন্দর সহর্ষে মণিভদ্রের গৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর পত্নীর সহিত মণিভদ্রের মৃত্যুবিষয়ক নানাকথার পর সুন্দর আপনার আদ্যোপান্ত- সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দৈবলব্ধ দ্বিতীয় বটিকাটী মুখমধ্যে অর্পণ করিয়া নিজের নিসর্গ-সুন্দর প্রকৃত কলেবর ধারণ করিলেন। মণিভদ্রপত্নী তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—ঠিকই হইয়াছে, বিধাতার বিচার কখনই অন্যায় হইতে পারে না। আমি এখানে আসিয়া অবধি দিবা-বিভাবরী একান্তে কেবল ভগবান্‌কেই ডাকিতে ছিলাম। বৃদ্ধ মণিভদ্র ছলে, কৌশলে, অবৈধভাবে, অদিনে, অক্ষণে, আমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিল। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাতে পতি বুদ্ধি স্থাপন করি নাই। আজ বিধাতার অনুগ্রহেই এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ; অতএব আপনিই আমার যথাশাস্ত্র পাণিগ্রহণ করুন। আর মণিভদ্রের বেশেই আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়া আমার সহিত দেশান্তরে প্রস্থান করুন।

পত্নীর প্রস্তাব মতই কার্য্য হইল। সুন্দর মণিভদ্রের বেশেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ করিয়া পত্নী সহ দেশান্তরে গমন করিলেন, এবং তথায় নিজ সুন্দর রূপ ধরিয়া কিছু দিন সুখভোগের পর সমস্ত ঐশ্বর্য্য পুণ্য কার্য্যে ব্যয় করিয়া পত্নী সহ বনাশ্রমে ভগবদারাধনায় দেহ-পাত করিলেন।

পঞ্চ পথিক।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! এক সময় মগধ দেশ হইতে পাঁচজন লোক কৈলাস পর্ব্বতে যাত্রা করেন। দেবদেব কৈলাসপতির প্রতি ভক্তিই তাঁহাদিগকে কৈলাসাভিমুখে লইয়া চলিল। তাঁহাদের পরিধানে কৌপীন; মস্তকে জটাভার; গাত্রে কম্বল; হস্তে এক একটা লৌহ চিমটা; আর স্কন্ধে সকলেরই এক একটা ঝুলী। সেই ঝুলীর মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

এই অবস্থায় প্রত্যহ বনের ফলমূল খাইয়া—গিরি-নির্ঝরিণীর জলপান করিয়া, মহানন্দে তাঁহারা উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে লোকালয় আর দেখা গেল না। বহুদিন পথ পর্য্যটনের পর নিরবচ্ছিন্ন বন্য, পার্ব্বত্য পথই তাঁহারা অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

যে পাঁচজন কৈলাস যাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এখন পথঘাট ভাল চিনেন না। তবে কৈলাসপর্ব্বত উত্তর দিকে অবস্থিত, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা কেবল উত্তর দিকেই যাইতে লাগিলেন। এখন আর কোন লোকজনের সহিত পথে তাঁহাদের দেখা হয় না; তবে মধ্যে মধ্যে কচিৎ দুই একজন সাধু পুরুষের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। সেই সকল সাধুর মধ্যে প্রায়শই মৌনব্রতী; তাঁহারা নরলোকের সহিত প্রায়ই কথা কহেন না। যাঁহারা কথা কহেন, তাঁহারাও অধিক বাক্যালাপ করেন না; কেবল স্বল্প কথায়ই নিজ বক্তব্য শেষ করেন।

কৈলাসযাত্রী পথিক-পঞ্চক পথে যাইতে যাইতে ঐ শেষোক্ত সাধু-

গণের স্বল্প কথায় যতটুকু পথ পরিচয় পাইতে লাগিলেন, তদনুসারেই পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

একদিন হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাঁহারা অনেক দূর গিয়াছেন। এখন আর জন প্রাণীর সহিত তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ নাই। চারিদিকেই অগণিত গিরিশ্রেণী; মধ্যে মধ্যে নতোন্নত শৈলভূমি; সকল ভূমিই শ্যামল সুন্দর শষ্পমালায় সমাবৃত। স্থানে স্থানে পাদপকুঞ্জ; কত শত পীত হরিত বর্ণের বিহঙ্গ তদুপরি বসিয়া কল-গানে তন্ময়চিত্ত; সমীরণ এখন ধীর-বাহী; গন্তব্য পথের দুই ধারেই পুষ্পপুঞ্জশোভী তরুরাজি; ধীর সমীর-সঞ্চারে সেই সকল পুষ্পের মিষ্ট গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এইরূপ সুরম্য স্থান দেখিয়া পথিক-পঞ্চক কেবল উত্তরাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে এখন অপার আনন্দ। তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন। কয়েক দিন হইতেই পথপরিচয় মিলিতেছে না, কেবল সুগম স্থান দেখিয়া অনবরত তাঁহারা উত্তর দিকেই চলিতেছেন।

আজ এত ক্ষণে দিবাবসান হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইল। সূর্য্য-দেব লোক-লোচনের অগোচরে গমন করিলেন। এতদিন রাত্রিকালে ভ্রমণকারীদিগের একটা না একটা নিরাপদ আশ্রয়-স্থান মিলিতেছিল; কিন্তু আজ রাত্রি হইয়া আসিল; তথাচ তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় একটা নিরাপদ স্থান কোথাও পাইতে লাগিলেন না। তাঁহাদের ভাবনা হইল,—অন্ধকার রাত্রি কোথায় কাটাইব? দুর্গম গিরিপ্রদেশে এতদিন ভ্রমণ করিলাম, এমন সঙ্কটে তো আর কখন পড়ি নাই। এরূপ একটী ভূখণ্ডও দেখি না, যেখানে নির্ব্বিঘ্নে রাত্রিবাস করিতে পারি; কেবল নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানীই দেখিতেছি। কোথায় যাই; ক্ষুধায় পিপাসায় প্রাণ যে এখন যায়-যায়। আর তো হাঁটিতে পারি না; হাঁটিয়াই বা এ

আঁধারে যাই কোথা? হা কৈলাস-পতি! আমাদের আশ্রয় দাও। এ ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে এ ভীষণ রাত্রি আমরা যেন অবাধে কাটাইতে পারি।

এইরূপ ভাবনায় চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে তাঁহারা একটা বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই বৃক্ষ এত বড় যে, তাহার এক একটী সুপরিসর শাখায় এক এক জনে অনায়াসে শুইয়া থাকা যায়। বৃক্ষটী অতি বড়—অতি স্থূল হইলেও উহার মূল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এমনই ভাবে গঠিত যে, তাহাতে আরোহণ করিবার অসুবিধা কিছুই ছিল না। তাঁহারা বৃক্ষ দেখিবামাত্র একে একে সকলেই গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন।

সন্ধ্যা এখনও ঘোর হয় নাই। লোহিতচ্ছবি দিবাকর পশ্চিম গগনে ডুবিয়াছেন মাত্র। এমনই সময়ে তাঁহারা বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমে এক একটু করিয়া সান্ধ্য অন্ধকারে শৈলাকাশ নিরবকাশ হইতে বসিল। পথিক-পঞ্চক নিশ্চিন্তমনে বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিলেন। কিন্তু কি বিপদ! বৃক্ষবাসেও বেশী ক্ষণ তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। একটু পরেই দেখিলেন,—একটা অতি বড় সর্প সেই বৃক্ষসমীপস্থ জঙ্গল মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সর্পের আকৃতি এত বৃহৎ যে, সে ইচ্ছা করিলে এক এক জনকে অনায়াসেই গিলিয়া ফেলিতে পারে। সর্পটা যেরূপ দীর্ঘ, তেমনই স্থূল; এরূপ ভয়ঙ্কর সর্পের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে, এ ধারণা পথিক-পঞ্চকের মনে আদৌ ছিল না। সর্প-দর্শনে প্রথমে তাঁহাদের কৌতূহলই হইয়াছিল; কিন্তু সর্প যখন বরাবর তাঁহাদের আশ্রয়-বৃক্ষাভিমুখেই আসিতে লাগিল, তখন তাঁহারা

ভীত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—বুঝি বা ঐ ভীষণ সর্প আমাদের সহিত এই সমগ্র বৃক্ষটাই গিলিয়া ফেলে !

পথিক-পঞ্চক ভয়ে ভয়ে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই সর্প আরও কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইল। অজগরের বৃহৎ বিরাট কলেবর, তাই তাহার গতি অতি ধীরভাবেই হইতেছিল। নতুবা এতক্ষণে সে বৃক্ষমূলে আসিয়াই উপস্থিত হইত। ভ্রমণকারীরা ভাবিয়া স্থির করিলেন,—আমরা যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছি, এ বৃক্ষ নিশ্চয়ই ঐ অজগরের রাত্রি বাসস্থান এবং সেই জন্যই উহার এই বৃক্ষের দিকেই গতি। অতএব আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হইবে না। মহাসর্প তাহার আশ্রয়বৃক্ষে আমাদিগকে পাইলে নিশ্চয়ই সংহার করিবে, আমরা ঐ ভীষণ সর্পের কিছুই করিতে পারিব না। সুতরাং এ বৃক্ষ এখনই পরিত্যাগ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

বৃক্ষস্থ পথিকেরা এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের নিজের ঝুলী ও কম্বল প্রভৃতি লইয়া বৃক্ষ হইতে নামিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অজগর এ সময় বৃক্ষের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত; কাজেই বৃক্ষের মূল ভাগ দিয়া তাঁহারা তখন নামিতে সাহস পাইলেন না। এখন উপায় কি ? সম্মুখে সাক্ষাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত! কি করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করা যায় ? ভাবিয়া চিন্তিয়া এক জনে এক পরামর্শ দিলেন। তখন সেই পরামর্শ মত সকলেই কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। পরামর্শদাতা পথিক বলিলেন, আমরা যে বৃক্ষশাখায় আছি, দেখিতেছি—এই শাখা বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমরা বরাবর এই শাখা ধরিয়া হাঁটিতে থাকি। পাঁচজনে ইহার অগ্রভাগে পৌঁছিলে নিশ্চয়ই ইহা নিম্নাভিমুখে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িবে। তখন আমরা সকলেই একযোগে ইহা হইতে লম্ফ দিয়া

পড়িব। সর্প অনেক দূরে থাকিয়া যাইবে, সে তখন আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। এই বৃহৎ শাখার গতি দেখিতেছি ক্রমশঃ নিম্নাভি-মুখেই হইয়াছে, সুতরাং লম্ফ দিয়া পড়িলেও আমাদিগকে বড় একটা চোট লাগিবে না।

এই মরামর্শ মতই কার্য্য হইল। পথিকেরা বৃক্ষশাখা বাহিয়া অনেক দূর হাঁটিয়া একে একে সকলেই সেই শাখার অগ্রদেশ হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িলেন। পড়িবামাত্র দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক সুন্দর প্রস্তরময় সমতল ক্ষেত্র ; উহার তিন দিকে তিনটী অনুচ্চ শৈল-সন্নিবেশ—যেন অল্পোন্নত প্রশস্ত প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান। স্থানটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও তেমন তীব্রভাবে গিরি প্রদেশ ঘিরিয়া ফেলে নাই। পথিকেরা তখনও আশ্রয় প্রাপ্তির আশায় সেই সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কিয়দ্দূর হইতেই একটা অগ্নিশিখা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। পথিকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন,—ঐ স্থানে নিশ্চয়ই কোন সাধুর আশ্রম আছে। যদি কোন সাধু মহাত্মার আশ্রয় পাই ভালই ; নচেৎ কোন একটা নিরুপদ্রব গিরি-গহ্বর পাইলেও অদ্য রাত্রি তাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারিব।

এই ভাবিয়া তাঁহারা সেই ক্ষেত্রসীমাস্থিত গিরিশৃঙ্গ প্রান্তে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন,—সেখানে শৃঙ্গ মাত্র একটী নয় ; আরও অনেকগুলি ছোট বড় পর্ব্বতশৃঙ্গ ঐ প্রদেশে অবস্থিত। কিন্তু সেখানে কোন সাধু নাই কিম্বা কোন গিরিগহ্বরও নাই। একটা আগুন জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু আগুনের অল্প দূরেই একটা অতি বৃহৎ বৃদ্ধ বানর উপবিষ্ট। বানর দেখিয়াই ভয়ে পথিকদিগের প্রাণ কাঁপিয়া গেল।

বৃদ্ধ বানর তাঁহাদের দিকে বারবার তাকাইতে লাগিল। অগ্নির আলোকে নর ও বানর উভয় পক্ষেরই আকার প্রকার স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। পথিকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এইবার জীবন সংশয় উপস্থিত। বানর নিশ্চয়ই একটা নাই; কেননা উহারা প্রায় একাকী থাকে না। এখানে বহু বানরেরই বাস, তাহা বিলক্ষণই বুঝা যাইতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে বানরদল আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে। আমাদের হাতে এক একটা চিমটা আছে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা বহু বানরের হাত হইতে আত্মরক্ষা অসম্ভব। উহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে।

এইরূপে সকলেই আসন্ন বিপদ ভাবিয়া চিন্তামগ্ন হইলে, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনে বলিয়া উঠিলেন, আর না, বিলম্ব করিয়া ফল নাই। আমরা এখনই এ স্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা করি। সে কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া অপর ব্যক্তি বলিলেন,—বাপ্‌রে! তা' কিছুতেই পারা যাইবে না। এই পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ ধরিয়া পলায়নের চেষ্টা বৃথা। তাহাতে ফল কিছুই হইবে না। আমি বলি,—আইস, আমরা সকলে মিলিয়া করযোড়ে ঐ কপিবরের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এমন অনেক বানর আছে, তাহারা অত্যন্ত শান্তস্বভাব ও বুদ্ধিমান্। তাহাদের ভাষা অবশ্য বুঝা যায় না বা তাহারাও মানুষের ভাষা বুঝে না; কিন্তু আকার ইঙ্গিতে তাহাদের আশয় অভিপ্রায় বেশই বুঝিতে পারা যায় এবং তাহারাও মানুষের অভিপ্রায়াদি বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। আমি এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া একবার এক বানরের নিকট আশাতীত আতিথ্য সৎকার পাইয়াছিলেন। তাই আমার মনে হয়, ঐ বানরও নিশ্চয় দুষ্টস্বভাব নহে।

আমরা কাতরভাবে উহার শরণাপন্ন হইয়া আশ্রয়-প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভে বঞ্চিত হইব না। অদ্যকার মত আমাদের দুঃখ-দুর্ভাবনার অবসান হইতে পারিবে।

তখন সকলেই সেই প্রস্তাবে একমত হইলেন এবং ধীরে ধীরে কপি-বরের নিকট যাইতে লাগিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চ পথিকের আগমনে বৃদ্ধ কপি কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; কেবল একদৃষ্টে আগন্তুকদিগের আকার প্রকার লক্ষ্য করিতে লাগিল। আগন্তুকেরা আরও অগ্রসর হইলেন। কপিবরের নিকটে গিয়া অঞ্জলি বন্ধন করিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—কপিবর! আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমাদিগকে আশ্রয় দাও; ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তোমাদেব প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন।

পথিকগণের এ প্রার্থনা যেন নরোত্তমের নিকট পৌঁছিল। রাম নাম শ্রবণে বানরোত্তমের গাত্র যেন সহসা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বানর কি একটা অব্যক্ত শব্দ করিলেন, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে শত শত বানর আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ কপি কি এক সঙ্কেত করিল, তখন কতিপয় বানর সেই আগন্তুকদিগের নিকট অতি শিষ্টভাবে গিয়া—তাঁহাদের হস্তস্থিত লৌহ-চিমটার অগ্রভাগ ধরিয়া তাঁহাদিগকে সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি লইয়া আসিল। তাঁহারা সেইস্থানে আসিয়া দেখিলেন,—খানিকটা প্রস্তরময় সমতল ক্ষেত্র; উহার আশে পাশে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ; সেই সকল বৃক্ষের ডালে ডালে আরও বহু বানর অবস্থিত।

এখন আর বানর দেখিয়া পথিক-পঞ্চকের ভয়সঞ্চার হয় না। তাঁহারা সেখানে আসিবা মাত্র বানরেরা এক প্রকার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষপত্র আনিয়া তাঁহাদের বসিবার আসন প্রদান করিল। তাঁহারা বৃক্ষপত্রে

বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই কতকগুলি বানর বড় বড় পত্রপুটকে করিয়া ঝরণার জল লইয়া আসিল। সেই জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া পথিকেরা সুস্থ হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাধা করিলেন। বানরেরা দুই তিন প্রকার সুমিষ্ট ফল আনিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিল। পথিকেরা একে একে সকলেই সেই সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আহা, এমন সুমিষ্ট ফল তো আমরা কোন কালেই খাই নাই। চমৎকার অতিথি-সৎকার! বানরে যে মানুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, আজ তাহা প্রত্যক্ষ হইল। এখন দেখি, ইহারা শয়নের ব্যবস্থা কিরূপ করিয়া দেয়?

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। বানরেরা বড় বড় বৃক্ষপত্র আনিয়া সেইখানে বিছাইয়া দিল এবং এক প্রকার লতাপাতা মুড়িয়া বালিসের মত করিয়া দিল। পথিক পাঁচজন সেইরূপ শয্যায়ই মহানন্দে শয়ন করিলেন। চারিদিকের বৃক্ষশাখায় বহু বানর জাগিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইলেই সকলেই আবার কৈলাসাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বৃদ্ধ বানরের ইঙ্গিত ক্রমে কতকগুলি বানর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিল। পথিকেরা মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আহা, বনপশুর এরূপ মনুষ্যোচিত ব্যবহার বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। নিশ্চয়ই আমরা দেবভূমিতে আসিয়াছি, নহিলে বনপশুর এরূপ ব্যবহার সম্ভবপর হইতে পারে কি? এই হিমালয়ই দেবভূমি। প্রাচীন পুরাণ ইতিহাস কাব্যকথা স্পষ্টতঃ ইহার দেবত্ব-গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ত্রিলোক-জননী মা মহামায়া,

এইখানেই লীলাবশত গিরিনন্দিনী নাম লইয়াছিলেন। এই সেই পুণ্যপূত হিমালয়ে আমরা আসিয়াছি। মনে হয়, শীঘ্রই কৈবল্যধাম কৈলাসে আমরা উপস্থিত হইতে পারিব। এই পশুজাতি-কৃত এরূপ অপূর্ব্ব আতিথ্যই তাহার পূর্ব্ব সূচনা। দেবভূমির সকলই দেবচরিত্র! বানর জাতিই বা এরূপ সদাশয় না হইবে কেন? শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়ে ইহারাই তো একসময় তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় হইয়াছিল।

এইরূপে নানা কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা মনের আনন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কৈলাস আর বেশী দূর নহে, এই কথা যখনই তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, তখনই তাঁহারা এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন।

বানরগণ বহুদূর তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। এইবার একটা গিরি-নদী পার হইতে হইবে। বানরেরা সকলেই সেই নদীতীরে গিয়া দাঁড়াইল; কেহই আর অগ্রসর হইল না। তাহারা নিজ নিজ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিতে সঙ্গী পথিকদিগকে এইবার নদী পার হইয়া বামে না গিয়া দক্ষিণে যাইতে বলিল। বামে তাঁহারা না যা'ন, এজন্য হাত নাড়িয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল।

পথিকেরা বানরদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইলেন বটে, কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় তাঁহাদের সকল চেষ্টাই শেষে ব্যর্থ হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহারা যে কি ভীষণ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, পাঠক তাহা পরবর্ত্তী বিবরণপাঠে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।

বানরেরা ইঙ্গিতে পথ পরিচয় প্রদান করিয়া স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল। ভ্রমণকারী পথিক-পঞ্চক সেই নদীতীরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পরপারে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। গিরীনদীর খাত খুব বিস্তৃত;

স্রোতও খুব প্রখর ; তথাচ তাহা পার হওয়া বিশেষ ক্লেশকর হইবে না ভাবিয়া তাঁহারা বড় একটা চিন্তিত হইলেন না ; কারণ পর্ব্বতবাহিনী নদী যত বড়ই হউক, বা যতই প্রখর হউক, তাহাতে জল অধিক থাকে না, জল-পরিমাণ কোথাও একহাত, কোথাও বা আধ হাত মাত্র ; সে জল আবার অতি স্বচ্ছ। সুতরাং জলমধ্যে কোথায় কোন্ নুড়ী পাথরটী কি অবস্থায় আছে, স্পষ্টই তাহা পরিদৃষ্ট হইতেছিল।

পথিকেরা স্বচ্ছন্দে নদী পার হইতে লাগিলেন। নদীর প্রায় বারো আনা আন্দাজ পার হইয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা পার্ব্বত্য ধূলি-কঙ্করবাহী কর্কশ বাতাস প্রবলবেগে তাঁহাদের দিকে আসিল। তাঁহারা সেই প্রবল বাতাসের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া দিক্ বিদিক্ স্থির রাখিতে পারিলেন না, শশব্যস্তে সকলেই পারে উঠিয়া কোন গিরিশৃঙ্গ বা কোন বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া আত্ম রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। বায়ু-বিক্ষিপ্ত ধূলি-কঙ্করে তাঁহাদের চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহারা ভাল করিয়া পথ দেখিতেও পারিলেন না। ফলের বেলায় দাঁড়াইল এই যে, বানরেরা যে পথে যাইতে বারবার নিষেধ করিয়া গিয়াছিল, তাঁহারা সেই পথেই গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিপদ এইবার আরও ঘনাইয়া আসিল।

কৈলাস দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থলী। সেখানে সশরীরে গমন করা কি সহজ পুণ্যের কাজ? ভ্রমণকারীদিগের সে পুণ্য—সে তপঃ-সঞ্চয় ছিল না ; কাজেই তাঁহাদের এই বিধি-বিড়ম্বনা।

এতদিন সুখে দুখে দিনগুলি বেশ কাটিয়াছিল। কিন্তু আজ পথিকেরা সত্যসত্যই বিপন্ন। যাহা হউক, বাতাসের ঘূর্ণীপাকে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও পথভ্রান্ত হইয়া অতি কষ্টে একটা বৃহৎ বৃক্ষের আড়ালে আসিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই বাতাসের প্রবলবেগ কমিল; ধূলি-কঙ্করবর্ষণ থামিল; আকাশ পরিষ্কার হইল। পথিকেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বানরদিগের নিষিদ্ধ পথেই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথও ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। কতক দূর গিয়া ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে এক জনে বলিয়া উঠিলেন, তোমরা তো কিছুই বুঝিতেছ না, আমার যেন মনে হয়, আমরা সেই নিষিদ্ধ পথেই আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের গন্তব্য পথ যদি এতই দুর্গম হইত, তা' হইলে বানরেরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আসিত। আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলিয়াছি, বাতাসের ঘুর্ণীপাকে পড়িয়াই আমাদিগকে এই বিপথে আসিতে হইয়াছে।

তখন সকলেরই 'হুঁস' হইল। সকলেই 'তাইত' 'তাইত' বলিয়া পথ-ভ্রমের বিষয় অলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে বিপথেই আসিয়া পড়িয়াছেন, এই ধারণাই সকলের নিশ্চিত হইল। কিন্তু এখন উপায় কি? ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইলেন। কিছুকালের জন্য সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যে ভীষণ স্থানে তাঁহারা আসিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলেন,—সেস্থান হইতে ফিরিয়া যাওয়াও সহজ নহে। তখন 'যা, থাকে কপালে' স্থির করিয়া তাঁহারা সম্মুখের দিকেই চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর কষ্টে সৃষ্টে যাইয়া সম্মুখে একটু পরিষ্কৃত সমতল স্থান পাইলেন। অনেক সময় হইতেই তাঁহারা শ্রান্ত ক্লান্ত; তাই সেই স্থানটুকু পাইবা মাত্রই একে একে সকলেই বসিয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর তাঁহারা দেখিলেন,—অদূরে একটী গিরি-নির্ঝরিণী কুলকুল-রবে তীরস্থ তরুলতার সহিত কি যেন অস্ফুটালাপ করিতে করিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে। নির্ঝরিণী দেখিয়া

পথিক-পঞ্চকের মন আশ্বস্ত হইল। তাঁহারা সকলেই জলপানার্থ তাহার তীরাভিমুখে চলিলেন।

এখন আর বেলা বেশী নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশের প্রান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছেন। কিছুকাল পরেই সন্ধ্যার ছায়ায় সকল স্থান অন্ধকারাবৃত হইবে। ভ্রমণকারীরা অদ্য মাত্র জল-পানেই দিন-যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন; তাই ঝরণার তটপ্রান্তে উপনীত হইয়াই সকলে আকণ্ঠ জলপান করিলেন; জলপানে তাঁহাদের পরম পরিতৃপ্তি হইল। তাঁহারা তখন ঝরণার পর-পারে গিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাত্রি-যাপনের সঙ্কল্প করিলেন।

এমন সময় দেখা গেল, কতকগুলি মহিষী সেই ঝরণার পর পার হইতে ঝরণায় জল পান করিতে আসিতেছে; আর তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক কৃষ্ণকায় বিকটপুরুষ কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ লতা ও একটা বৃহৎ যষ্টিহস্তে আগমন করিতেছে। প্রথমে মহিষী দেখিয়াই পথিক-পঞ্চকের ভয় হইয়াছিল; এখন আবার এই ভীষণ পুরুষ দেখিয়া তাঁহাদের আরও ভয় হইল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—ওঃ কি ভীষণ পুরুষ! রাক্ষসের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এ মূর্ত্তি রাক্ষস অপেক্ষাও ভীষণ। জানি না, ঐ ভয়ঙ্কর কালোপম পুরুষের করাল কটাক্ষপাতে আমাদের আজ কোন্ দুর্দ্দশাই বা ঘটে! কি করিব, এ বন্ধুর প্রদেশ দিয়া পলাইয়া যাইবারও যো নাই। এখানে বসিয়া থাকিলেও ফল ভাল হইবে না; অতএব এই স্থান হইতে এই ঝরণা পার হইয়া অন্য পথে যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

এই ভাবিয়া পথিকেরা ত্বরাত্বরি ঝরণা পার হইয়া পথান্তরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে সেই মহিষীদল আসিয়া ঝরণার জল পান করিতে

লাগিল। তাহারা যতক্ষণ জল পান করিল, সেই কৃষ্ণকায় বিকট পুরুষ ততকাল ঝরণার তীরে 'ঠায়' দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যেমন তাহাদের জলপান শেষ হইল, অমনি সেই পুরুষ পথিকদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল। পথিকগণ তখনও অধিক দূর যাইতে পারেন নাই। বিকট পুরুষ মুহূর্ত্তমধ্যে একে একে তাঁহাদের সকলকে গিয়া ধরিল এবং তাহার হস্তস্থ লতাপাশ দ্বারা একসঙ্গে সকলেরই হস্ত বন্ধন করিল। বিকট পুরুষ বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল, পথিকেরা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তখন সে তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। পথিকেরা এ বিপদে মনে মনে ভগবান্‌কেই ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহারা শান্ত-ভাবেই তাহার অনুগামী হইলেন।

পথিকেরা এইবার ঘোর বিপদে পতিত। ভাবিলেন,—আজ এই নির্জ্জন অরণ্যময় প্রদেশে আমাদিগকে অভয় দেয়, এমন আর কেহই নাই। এই মুহূর্ত্তেই এই বিকটাকার রাক্ষসের হস্তে নিশ্চয়ই আমাদিগকে মরিতে হইবে। এ রাক্ষস আমাদিগের সকলকে একে একে খাইয়া ফেলিবে, নিশ্চয়ই; কিন্তু কিরূপ যাতনা দিয়া কি ভাবে কত দিন রাখিয়া কোন্ প্রকারে আমাদিগকে খাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। উপস্থিত বন্ধন দশায় পড়িয়াছি, ইহার পর কি হইবে, কে জানে? অহো, বানরদিগের নির্ণীত পথে না যাইতে পারিয়া আজ আমরা কি ঘোর বিপদেই না পড়িলাম! হা ভগবন্, রক্ষা কর, বিপদে পরিত্রাণ কর।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বন্ধনগ্রস্ত পথিক-পঞ্চক সেই বিকট পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আদিত্য দেব অস্তাচলে আত্মগোপন করিলেন। পথিকদিগের যেন কালরাত্রি উপস্থিত হইল। বিকট পুরুষ সেই

মহিষীপাল ও পথিকদিগকে লইয়া ক্রমে আরও একটা ঘোর অন্ধকারাবৃত গভীর অরণ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। পথিকগণের আর চলিবার শক্তি নাই। তাঁহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। তাঁহারা সকলেই একেবারে বসিয়া পড়িলেন।

পথিকদিগকে বসিতে দেখিয়া বিকট-পুরুষ রাগে গরগর করিতে করিতে তাঁহাদের হস্তবন্ধনী রজ্জু ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। পথিকেরা নিরুপায় হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেন।

একটু পরেই সেই অরণ্যানীর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই তিনটা আলোকরশ্মি দেখা দিল। পথিকেরা হঠাৎ আলোকদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; মনে একটু বলও হইল; ভাবিলেন,—এ দুর্গম অরণ্যপ্রদেশে আলোক আসিল কোথা হইতে? এমন অপূর্ব্ব আলোক তো আমরা পূর্ব্বে কোন রাজভবনেও দেখি নাই। কি জানি, কোথায় আসিলাম! অথবা ইহা বুঝি রাক্ষসী মায়া! দেখা যাউক, কি হইতে কি হয়।

এই ভাবিয়া তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। ক্রমে একটী আলোকমালা-মণ্ডিতা অপূর্ব্ব পুরী পরিদৃষ্ট হইল। বিকট পুরুষ নিকটে আসিবা মাত্র পুরীদ্বার আপনাপনি খুলিয়া গেল। বন্দী পথিক-পঞ্চক আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুরীদ্বার খুলিবা মাত্র মহিষীদল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। পরে বিকট পুরুষ পথিকদিগকে কি যেন কহিল, পথিকেরা এবারও তাহা বুঝিতে পারিলেন না; দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিকট পুরুষ রাগে রাগে পাঁচ জনকেই এক সঙ্গে তুলিয়া লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

সকলে প্রবেশ করিবা মাত্র পুরীদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিকট পুরুষ তখন পথিকদিগকে একটা কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিল। পথিকেরা কক্ষাভ্যন্তরে স্থান পাইয়া সকলেই একযোগে বসিয়া পড়িলেন; মনে মনে বলিলেন,—এ দানবের হস্তে নিস্তার কিছুতেই নাই। একটু পরেই হয় তো আমাদিগকে মরিতে হইবে! এখন একটু বিশ্রাম তো করিয়া লই; পরে যা হয় হউক।

সেই অন্ধকারকক্ষে বসিয়া সকলেই এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। বিকট পুরুষ তাঁহাদিগকে সেইখানে রাখিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল। পথিকগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও বন্ধন-পীড়নে কাতর হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরেই আবার সেই বিকট পুরুষ আসিতে লাগিল। পথিকেরা ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—এইবার আমাদিগের আয়ু ফুরাইয়াছে। আবার ঐ বিকট পুরুষ আসিতেছে।

বলিতে বলিতে একটা প্রকাণ্ড 'মশাল'হস্তে বিকট পুরুষ আসিয়া প্রবেশ করিল। এইবার পথিকেরা মশালের আলোকে সেই বাস-কক্ষটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহাদের প্রাণ ধড়ফড় করিতে লাগিল। তাঁহারা দেখিলেন,—বাস-কক্ষটী খুব বড়; নানা চিত্রে চিত্রিত। মধ্যে শয্যাসনাদি কিছু না থাকিলেও তলদেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহশ্রী দেখিয়া তাঁহাদের মনে বিস্ময় জন্মিল। ভাবিলেন,—আসন্নমৃত্যু বন্দী আমরা, এমন ঘরে আমাদিগকে স্থান দিল কেন? অথবা রাক্ষসী পুরীর সমস্ত ঘরই বুঝি এইরূপ।

বন্দী পথিকেরা এইরূপ ভাবিতেছেন। এ দিকে সেই বিকট পুরুষ আসিয়াই তাঁহাদের হস্তবন্ধন খুলিয়া দিল এবং একটা গোলাকার লৌহ-পাত্রে এক পাত্র জল ও একটা কাঠের পাত্রে এক পাত্র ছোলা তাঁহাদের

সম্মুখে রাখিয়া গেল। আবার অন্ধকার হইল। বন্ধনমুক্ত পথিকেরা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; ভাবিলেন,—তবে আজ হয় তো আমাদিগকে মারিবে না, উহার মতলব কি কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না; খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া শেষেই হয় তো বা আমাদের প্রাণ বধ করিবে; আলো ছিল না, ক্ষতি নাই। এই যে ছোলা ও জল দিল, ইহাও আশাতীত। যা'হউক, অন্ধকারেই এই সকল ছোলা ও জল দ্বারা আত্মরক্ষা করি।

পথিকেরা তাহাই করিলেন। সমস্ত দিনের দারুণ ক্ষুধাতৃষ্ণা; তদুপরি পথপর্য্যটনের পরিশ্রম; কাজেই সেই ছোলা আর জলই তাঁহারা অমৃতবোধে উদর পুরিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত রাত্রিমধ্যে সেই বিকট পুরুষ আর তাঁহাদের নিকট আসিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। সৌরালোকে সে পুরীর সর্ব্বস্থানই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন,—চমৎকার পুরী; দ্বিতল ত্রিতল গৃহও সে পুরীমধ্যে বিদ্যমান; কিন্তু লোক জন বেশী নাই। একটা বৃহৎ গৃহের তলে কতকগুলি মহিষীমাত্র আবদ্ধ আছে। প্রভাত হইবা মাত্র বিকট পুরুষ একে একে সেই মহিষীগুলির দুগ্ধ দোহন করিয়া একটা প্রকাণ্ড লৌহ কটাহে রাখিল। পরে একটা বৃহৎ উনানে অগ্নি জ্বালিয়া তদুপরি সেই দুগ্ধপূর্ণ কটাহ চাপাইয়া দিল। ক্রমে দুগ্ধরাশি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তখন সেই বিকট পুরুষ অন্য একটা ঘর হইতে একটা 'জীয়ন্ত' মনুষ্য আনিয়া সেই উত্তপ্ত দুগ্ধরাশি মধ্যে ফেলিয়া দিল। যখন জ্বাল পাইতে পাইতে দুগ্ধ খুব ঘন হইয়া আসিল, মানুষটার মাংসাদি গলিয়া গেল, তখন বিকট পুরুষ সেই দুগ্ধকটাহ নামাইয়া তন্মধ্য হইতে

মনুষ্যাস্থিগুলি বাছিয়া ফেলিল। অতঃপর ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেই কটাহমধ্যস্থ গাঢ় দুগ্ধরাশি সম্পূর্ণ খাইয়া ফেলিল। তাহার পর মহিষীগুলিকে লইয়া পুনর্ব্বার সে পুরী হইতে বহির্গত হইল। পুরীদ্বার পূর্ব্ববৎ আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

পূর্ব্বরাত্রে আনীত পথিক-পঞ্চক এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে অবসন্ন হইলেন; মুখে বলিলেন,—বাপ্ রে! এমন ভীষণ ব্যাপার! ওঃ তবে তো আমাদিগকেও এই ভাবেই 'জীয়ন্তে' মারিয়া ভক্ষণ করিবে! এ রাক্ষসের আহার বোধ হয় এইরূপই। হয় ত আমাদের ন্যায় আরও কত হতভাগ্যকে আনিয়া আনিয়া ঐ রাক্ষস এইরূপে জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিয়াছে। আজ যে হতভাগ্যকে 'জীয়ন্তে' দগ্ধ হইতে দেখিলাম, বোধ হয়, দুই চারি দিন পূর্ব্বে উহাকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। এইরূপ আরও বোধ হয়, দুই চারি জন গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ আছে। আজ হউক, কাল হউক, আমরাও ঐ ভাবেই রাক্ষসের ভক্ষ্য হইব। এ পুরী হইতে বাহিরে যাইবার উপায় নাই। রাক্ষস বোধ হয়, এই যে মহিষীপাল লইয়া বাহির হইল, আর সেই সন্ধ্যার সময় ফিরিবে। আমাদের এ বন্দীখানা হইতে মুক্ত হইবার উপায় তো কিছুই নাই। এখন আর কি করিব? এ বাড়ীর সমস্ত গৃহাদি একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, সে ফল আমাদের ভুগিতেই হইবে।

এই বলিয়া পথিকেরা সে পুরীর সকল ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। পুরী হইতে বাহিরে যাইবার দ্বিতীয় দ্বার তাঁহারা পাইলেন না। যে একটী দ্বার, তাহা সেই রাক্ষসের আগম-নির্গম ব্যতীত খুলে না। সে রহস্যময় দ্বার, অন্যের পক্ষে অভেদ্য।

পথিকেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—সে পুরীর কোথাও আর প্রাণীটি মাত্র নাই। ক্রমে একতল, দ্বিতল, এবং ত্রিতল গৃহে গমন করিলেন। সে সব গৃহেরও কোথাও কাহাকে দেখিলেন না! অথচ ঘরগুলি দিব্য ফুট্‌ফুটে,—নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত; দেখিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; ভাবিলেন,—ব্যাপারখানা কি, কিছুই তো বুঝিতেছি না! এ বাড়ীতে কি কেবল ঐ রাক্ষসই বাস করে? না—আরও কেহ আছে? ঐ রাক্ষসের ঘর কোন্‌টা, তাহাও তো কিছুই বুঝিলাম না; তবে কি রাক্ষসটা রাত্রিতে এ পুরীমধ্যে থাকে না! আচ্ছা, ঐ যে একটী সুন্দর সুবৃহৎ গৃহ আছে, আমরা ঐ ঘরটীতে একবার গিয়া দেখি, ওখানে কেউ আছে কি না! এই বলিয়া পথিকেরা সেই সুন্দর ঘরটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন,—ঘরের মধ্যস্থিত এক খানি স্বর্ণ পালঙ্কোপরি একটী পরমাসুন্দরী ষোড়শী যুবতী শুইয়া আছে। যুবতী নিদ্রিতা। যুবতীর দেহপ্রভায় সেই গৃহটী যেন আলোকিত হইয়াছে। পথিক-পঞ্চক এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন! যুবতীর পরিচয়াদি জানিবার জন্য তাঁহাদের অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তাঁহারা সকলেই করযোড়ে উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—মা গো, তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, না সরস্বতী? যেই হও, গা তোলো মা, এই নিরাশ্রয়দিগের মুক্তির উপায় বলিয়া দাও।

মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়া যুবতী সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসিল,—কে তোমরা?

পথিকগণ।—মা, আমরা বন্দী, একটা রাক্ষস আমাদিগকে এই পুরীতে আনিয়া বন্দী করিয়াছে।

যুবতী। বুঝিয়াছি, তোমরা রাক্ষসের কবলে পড়িয়াছ। কি করিবে, এখান হইতে বাহির হইবার তো উপায় নাই।

পথিকগণ। মা, কে তুমি কেন এমন ভাবে এই রাক্ষসী পুরীতে একাকিনী রহিয়াছ? তোমার কি আর কেহ নাই?

যুবতী। সে অনেক কথা; তাহা শুনিয়া আর লাভ কি?

পথিকগণ। মা, আমরা তো মরিতেই বসিয়াছি, তবু তোমার আত্ম-কাহিনী শুনিতে পারিলে আমাদের যেন একটা তৃপ্তি হয়।

যুবতী। শুন তবে বলিতেছি। আমি এক রাজনন্দিনী। এই পুরীই আমার পৈতৃক বাসভূমি। এই পুরীর নিকটে নিকটে বহু লোক বাস করিত। আমার পিতা তাহাদের রাজা ছিলেন। একদা মৃগয়া করিতে গিয়া আমার পিতা কোন সাধু পুরুষের কোপোৎপাদন করেন। তাহাতে সেই সাধু শাপ দেন যে, তোর পুরী অচিরেই রাক্ষস-কবলিত হইবে। পিতা যে দিন নিজপুরে আসিয়া এই শাপবাক্য প্রকাশ করিলেন, সেই দিন হইতেই দলে দলে নরনারী এই রাজধানী ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইতে লাগিল। দুই তিন দিন পরেই এক ভীষণ রাক্ষস আসিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল। আমার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি একে একে সকলেই রাক্ষসের কবলে প্রাণ হারাইলেন। রাজপুরী ও নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান জন মানব-শূন্য হইল। আমি নয় বৎসরের বালিকা ছিলাম। রাক্ষস আমাকে মারিল না; এই ঘরটীর ভিতর রাখিয়া দিল। আমি একাকী কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। রাক্ষস আমার ঘরের নিকটে কোথা হইতে আনিয়া খাদ্য-পানীয়াদি প্রত্যহ যথাকালে রাখিয়া যাইত। এই ভাবে আরও ছয় বৎসর কাটিল। আমার বয়স যখন পঞ্চ দশ বৎসর হইল, তখন রাক্ষস একদিন আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিবাহ করিতে চাহিল। আমি রাক্ষসের আকার দেখিয়াই ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া

পড়িলাম। মূর্চ্ছান্তে উঠিয়া দেখিলাম,—রাক্ষস সেখানে নাই। এক সাধু পুরুষ আমার সম্মুখে দণ্ডয়মান। সাধুদর্শনে আমার মনে ভক্তি হইল। আমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। সাধু প্রসন্নমুখে আমায় বলিলেন,—বৎসে! আমারই শাপে তোমার পিতৃবংশ লুপ্ত হইয়াছে, যাহা হইবার হইয়াছে। তোমার কোন ভয় নাই; রাক্ষস তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। তুমি রাক্ষসপ্রদত্ত অন্নজলাদি আর গ্রহণ করিও না। আমি তোমাকে একটী ওষধি প্রদান করিতেছি, ইহা ধারণ করিও। ইহার প্রভাবে তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হইবে; সেই রাক্ষসও তোমার নিকটে আসিতে পারিবে না। আমি চেষ্টায় আছি, অচিরেই কোন রাজপুত্র আসিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিবেন। সাধু এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আমি অদ্য এক বৎসর রাক্ষসের অনুগ্রহার্থিনী না হইয়া এই ঘরেই একাকিনী বাস করিতেছি। সাধু-দত্ত সেই ওষধির প্রভাবে রাক্ষস আমায় স্পর্শও করিতে পারে না।

পথিকগণ। মা, আমাদিগকে যে রাক্ষস ধরিয়া আনিয়াছে; সেই রাক্ষস আর আপনার কথিত রাক্ষস কি এক?

যুবতী। হাঁ, এই রাক্ষসই সেই রাক্ষস। আমার পিতার যতটুকু রাজ্য ছিল, তাহাই উহার অধিকারভুক্ত হইয়াছে। রাক্ষস দিনে মহিষ চড়ায়, আর নরপশু প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনে। প্রাতে, নরই হউক, পশুই হউক, একটা কোন জীব মহিষীদুগ্ধে মিশাইয়া জাল দিয়া খায়। দিনে একবারই উহাকে খাইতে দেখি। রাত্রিবেলা রাক্ষস এখানে থাকে না; কোথায় যায়, কি খায়, তাহাও জানি না। তোমরা

নিশ্চয় বিপথে আসিয়া রাক্ষসের অধিকারে পড়িয়াছিলে, তাই তোমা-দিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। রাক্ষস তোমাদিগকেও ঐরূপেই খাইবে।

পথিকগণ। মা, আমাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?

যুবতী। রাক্ষসের অধিকৃত স্থানের পর বানরদিগের অধিকার। সেখানে গিয়া পড়িতে পারিলে রাক্ষস আর কিছুই করিতে পারিত না; কিন্তু সে স্থান তোমরা কাটাইয়া আসিয়াছ। সেখানে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব; কারণ এই পুরীদ্বার এক অদ্ভুত রকমের। উহা রাক্ষসের আদেশেই খোলে এবং বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই এ পুরী হইতে বাহির হইবারই উপায় নাই। রাক্ষস তোমাদিগকে আজই খাইবে না; এখনও তাহার দুই দিনের খাদ্য সংগৃহীত আছে। তোমরা ভগবান্‌কে ডাক, তিনি বৈ আর উদ্ধারের উপায় নাই।

যুবতীর কথায় পথিকগণের মুখ শুকাইয়া গেল; ভাবিলেন,— রাক্ষসের দুই দিনের খাদ্য আছে। তিন দিনের দিনই তো আমাদের একজনকে খাইবে। অহো, সে দিন কি ভয়ঙ্কর দিন! এখন কি করিব, মনে প্রাণে ভগবান্‌কেই গিয়া ডাকি। তাঁহার কৃপায় যদি উদ্ধার পাই, নতুবা রাক্ষসের হাতেই মৃত্যু।

বন্দী পথিকগণ এই ভাবিয়া নিজেদের কক্ষে গমন করিলেন এবং মনে প্রাণে কেবল ঈশ্বরকেই ডাকিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন ঈশ্বরো-পাসনাতেই তাঁহাদের কাটিল। তাঁহারা রাক্ষসপ্রদত্ত ভক্ষ্য পানীয় কিছুই গ্রহণ করিলেন না। সন্ধ্যার পর রাক্ষস যথানিয়মে মহিষীদল লইয়া পুরী প্রবেশ করিল; আবার যথানিয়মে গভীর রাত্রে পুরী হইতে চলিয়া গেল।

পথিকগণ মনে প্রাণে ঈশ্বরকেই ডাকিতেছেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। হঠাৎ পুরীর অদূরে সৈন্যকোলাহল শুনা গেল। পথিকেরা

চমকিত হইলেন; ভাবিলেন,—একি! এই গভীর অরণ্যমধ্যস্থ এখানে হঠাৎ সেনাকোলাহল শুনা যাইতেছে কেন? অথবা সকলই ভগবানের খেলা! তিনি যা, করেন, সকলই মঙ্গলের জন্য। এই ভাবিয়া পথিকগণ আরও প্রগাঢ়ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে বহুসংখ্যক খনক-সৈন্য কর্ত্তৃক পুরী-প্রাচীর ভগ্ন হইল। জয়োল্লাসে সেনাদল পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। সেনাদলের অগ্রে অগ্রে এক সাধু পুরুষ এবং সাধু পুরুষের পশ্চাতে পশ্চাতে এক রাজপুত্র। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে তন্মধ্যস্থ সেই ত্রিতল গৃহের অভিমুখে তাঁহারা গমন করিলেন।

এদিকে সেই ত্রিতল গৃহবাসিনী রাজনন্দিনী এক শুভ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ সাধু পুরুষ ও তৎসমভিব্যাহারী এক রাজপুত্রকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন,—আজ সাধুর বাক্য সত্য হইল। আমার মনোবাসনা বুঝি পূর্ণ হইতে চলিল।

সাধু পুরুষ রাজনন্দিনীর গৃহের নিকট আসিয়াই বলিলেন,—মা, আজ আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল। এস মা, তোমাকে এই রাজকুমারের করে সমর্পণ করিয়া আমি কৃতকার্য্য হই। মা, ইনি একজন প্রখ্যাতবংশীয় রাজপুত্র; ইনি আমার আশ্রমের সন্নিকটে মৃগয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নিকট তোমার পরিচয়াদি প্রদান করায় ইনি তোমার পাণি গ্রহণে সম্মত হন। ইহাঁর সঙ্গে প্রভূত সৈন্য সম্ভার আছে। তাহারই সাহায্যে আমরা এই পুরী প্রাচীর ভগ্ন করিয়া এখানে আসিতে পারিয়াছি। মা, আর বিলম্ব নাই। তুমি সত্বর

আমাদের অনুগামিনী হও, আমার আশ্রমে গিয়া তোমাদের পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হইবে।

রাজনন্দিনী সেই মুহূর্ত্তেই রাজকুমারের অনুগামিনী হইলেন; বলিলেন,—আর কিছুকাল পরেই রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব সুত্বর সত্বর এই পুরীপ্রদেশ পার হইয়া যাইতে পারিলেই মঙ্গল।

সাধু বলিলেন,—ভয় কি মা, রাজকুমার স্বয়ং বীরশ্রেষ্ঠ; তদুপরি ইঁহার সেনাবল যথেষ্ট। তুমি নির্ভয়ে চলিয়া আইস; রাক্ষস তোমার বা অন্য কাহারও, কিছুই করিতে পারিবে না।

রাজনন্দিনী কহিলেন,—প্রভো! আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। এই পুরীমধ্যস্থ একটি কক্ষে পাঁচজন পথিক রাক্ষসের বন্দী অবস্থায় অতি দুঃখে অবস্থান করিতেছে, এই সঙ্গে তাহাদিগকেও মোচন করিতে হইবে।

রাজপুত্র বলিলেন,—সে আর অধিক কথা কি, এখনই তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া নিরাপদ পথে পৌছাইয়া দিব।

রাজনন্দিনী এ কথায় আনন্দিত হইলেন। তখন তাঁহারা সকলেই সেই ত্রিতল গৃহ হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন; বন্দী পথিকেরা যে ঘরে ছিল, সেই ঘর হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন। পথিকগণ 'জয় জগদম্বিকে' বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। পুরীর বাহিরে স্বর্ণশিবিকা প্রস্তুত ছিল; রাজনন্দিনী তাহাতে আরোহণ করিলেন। রাজপুত্র অশ্বারোহণে রাজনন্দিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পথিকগণ সাধুর সঙ্গ লইলেন। পুরীমধ্যে যে কিছু উত্তম উত্তম সামগ্রী ছিল, অশ্ব ও অশ্বতরাদির পৃষ্ঠে চাপাইয়া সৈন্যগণ তাহা লইয়া চলিল।

রাজপুত্রের মৃগয়াসঙ্গী সৈন্যগণ এই ভাবে জয়োল্লাসে মেদিনী কাঁপাইয়া সেই অরণ্যানীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল।

রাজপুত্র সৈন্যগণ-সহ যাইতে যাইতে রাক্ষসাগমনের পূর্ব্বেই তাহার অধিকার প্রায় অতিক্রম করিলেন। আর কিছু পথ পার হইতে পারিলেই পথ নিরাপদ হইত; কিন্তু তাহা হইল না। রাজপুত্র রাক্ষসাধিকৃত স্থানে থাকিতে থাকিতেই রাক্ষস যথানিয়মে প্রভাতে সেই পুরী-দ্বারে আসিল। রাক্ষস আসিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। রাক্ষস পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—পুরীর পশ্চাৎ দিকের প্রাচীর ভগ্ন, পুরীমধ্যস্থ দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠিত; রাজকন্যা অপহৃত এবং বন্দী মনুষ্যগণ পলায়িত! দেখিয়াই রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইল। ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে সেখানে আর তিলার্দ্ধ কাল অপেক্ষা না করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল এবং লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুতগতি বনভূমির চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

রাজপুত্র এ সময় নিজ সঙ্গিগণ সহ বানরাধিকৃত স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। ননাস্থান অনুসন্ধানের পর রাক্ষসও এবার বিদ্যুদ্বেগে তাঁহারই দিকে ধাবিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই মনুষ্যগন্ধ রাক্ষসের নাসায় প্রবেশ করিল। রাক্ষস ভাবিল,— নিশ্চয় এই দিকেই সকলে গিয়াছে; এই দিক্ হইতেই প্রচুর মনুষ্যগন্ধ আসিতেছে। ভালই হইয়াছে; পাঁচ ছয়টা মানুষ গিয়াছে; এবার তাদের সঙ্গে শত শত মনুষ্য আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব। আর সেই রাজপুত্রী?—সেটাকে পে'লে, এবার আর কিছুই মানিব না; একেবারে বিবাহ ক'রে ফেল্‌বো, এখানে আর রাখ্‌বো না, একটা বড়-গোছের পর্ব্বত শৃঙ্গে রাখিয়া দিব।

এইরূপ স্থির করিয়া রাক্ষস একটা বৃক্ষশাখা হস্তে লইয়া রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গীদের দিকে ছুটিল।

কিয়দ্দূর ব্যবধান থাকিতেই রাজসৈন্য পিছন হইতে একটা শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সকলেই ঝড় আসিতেছে মনে করিয়া ব্যস্ত হইল। রাজপুত্র রাজনন্দিনীর জন্য একটা নিরাপদ স্থান নির্ব্বাচন করিলেন। আসন্ন ঝড় হইতে আত্মরক্ষার জন্য সকলেই সচেষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুত্রের সমভিব্যাহারে যে সাধু পুরুষ ছিলেন, তিনি সকলকে বলিলেন,—তোমরা সাবধানে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ঐ শব্দ ঝড়ের শব্দ নয়; আমার মনে হয়, যে রাক্ষসের পুরী হইতে আমরা আসিতেছি, উহা সেই রাক্ষসেরই আগমন-শব্দ।

সাধু এই কথা বলিতে না বলিতে রাক্ষস আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে রাজসৈন্যোপরি রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। প্রস্তরাঘাতে রাজসৈন্য মধ্যে কাহারও হস্ত, কাহারও পদ, কাহারও মস্তক, কাহারও পৃষ্ঠ ছিন্ন ভিন্ন হইল। রাজসৈন্যও সত্বর রাক্ষসের দিকে শত শত তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষস সজোরে বৃক্ষশাখা ঘুরাইয়া সেই সকল বাণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। সাধু পুরুষ দেখিলেন,—রাক্ষসের বেগ ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি রাজপুত্রকে বলিলেন,—এই ভীষণ রাক্ষসের সঙ্গে সহজে পারিয়া উঠা যাইবে না; এক কাজ করুন,—এই ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদ্দিকে ছুটিয়া যাউন; আমরা কোন গতিকে বানরাধিকারে পড়িতে পারিলেই নিরাপদ হইব; তখন রাক্ষস আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না।

তাহাই হইল। রাজপুত্র স্বীয় সৈন্যদলকে সেইরূপই উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে পিছন দিকে ছুটিতে লাগিল।

সেই যে নদীর কথা বলিয়া আসিয়াছি—যে নদী পার হইয়া পঞ্চ

পথিক ভ্রমবশতঃ রাক্ষসাধিকারে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই নদী পর্য্যন্তই বানরদিগের অধিকার। এক্ষণে সেই নদী মাত্র দুই শত হস্ত ব্যবধানে আছে। এ দিকে রাজসৈন্যের অস্ত্রশস্ত্রাদিও ফুরাইয়া গিয়াছে। রাত্রিও প্রভাত হইয়াছে। নদীর নিকটে যে সকল বানর ছিল, তাহারা দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই একত্র হইল। রাক্ষস এইবার দ্রুতবেগে দুই বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া রাজ-সৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল। রাজসৈন্য নিরুপায় হইয়া সকলেই একযোগে পিছন দিকে দৌড়াইল। তাহারা দৌড়াইতে দৌড়াইতে এইবার বানরদিগের অধিকারে আসিয়া পড়িল। কিন্তু রাক্ষস এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা সকলে বানরাধিকারে আসিলেও সে তাঁহাদের অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। তখন অদূরে কয়েকটী বানর দেখিয়া সাধু ও পথিকগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—বানরগণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, রাক্ষসের হাতে প্রাণ গেল। তাঁহারা এই কথা বলিবা মাত্র ছোট বড় শত শত বানর রাক্ষসকে আক্রমণ করিল। রাক্ষসে বানরে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বানরদিগের হস্তে রাক্ষস পরাস্ত হইল। বানরেরা রাক্ষসের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাহার অধিকারমধ্যে ফেলিয়া আসিল। রাজপুত্র এবং অন্যান্য সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া নিজেদের গন্তব্য স্থানে যাইবার উদ্‌যোগী হইলেন। বানরেরা ইঙ্গিতক্রমে তাঁহাদিগকে তাহাদের আতিথ্য স্বীকারে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাঁহারা তাহাতে সম্মত না হইয়া নিজেদের অভীষ্ট দিকেই প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সাধু তাঁহার আশ্রমে গেলেন। রাজপুত্র ও সৈন্য-সামন্তাদিও আশ্রমের অতি নিকটে আসিয়া পটমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী অগ্রে সেই সাধুর আশ্রমেই

গমন করিলেন। সাধু পুরুষ নিজের আশ্রমে গিয়া দৈনিক উপাসনাদি সমাপনান্তে রাজপুত্রকে বলিয়া পাঠাইলেন,—বৎস! অদ্য শুভ দিন আছে। রাজকুমারীকে তোমার করে অদ্যই সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

সাধুর সদিচ্ছা পূর্ণ হইল। রাজপুত্র সাধুর অভিপ্রায় মত সেই দিনই সেই আশ্রমে রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সাধু প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—আজ আমার এক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। তোমরা এক্ষণে নিরাপদে নিজ রাজধানীতে গিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন কর।

পরদিন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র রাজপুত্র সাধুর অনুমতি লইয়া রাজপুত্রী সহ নিজ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই পথিক পাঁচজন সাধুর আশ্রমেই থাকিয়া গেলেন।

পথিকেরা সাধুসেবায় অনেকদিন কাটাইলেন। অনন্তর একদিন তাঁহাদের মনে হইল,—আমরা সশরীরে কৈলাসে গিয়া কৈলাসপতির লীলাস্থান দেখিব, এইরূপ সঙ্কল্প লইয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। বহুকাল কাটিয়া গেল; কিন্তু আমাদের সে সঙ্কল্প আর পূর্ণ হইল না। কত বিঘ্ন বিপদ আমাদের উপর দিয়া গিয়াছে; ভগবানের কৃপায় সে সকল উত্তীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে এই সাধুর শান্ত আশ্রমে আমরা নিরুদ্বেগে আছি বটে; কিন্তু আমাদের মনটী সেই কৈলাসপতির লীলাস্থলী কৈলাসেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। সেখানে না যাইতে পারিলে আমাদের মনে আর শান্তি হইতেছে না; অতএব আমরা আজই সাধুর অনুমতি ও উপদেশ লইয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিব।

সঙ্কল্প স্থির হইল। সাধুপুরুষের অনুমতি মিলিল। পথিক-পঞ্চক পরম হর্ষে এবার আবার কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিরাপদে পথ চলিলেন; কোন বিপদই তাঁহাদের এ পর্য্যন্ত

উপস্থিত হইল না। তৃতীয় দিনের দিন তাঁহারা এক গিরিসঙ্কট-সমাকীর্ণ ভয়াবহ পথে উপস্থিত হইলেন। এই পথে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর হঠাৎ সম্মুখে এক বিষম বিভীষিকা উপস্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন,—কতকগুলি ভীষণ যামণীয়াকৃতি ষোড়শী রমণী উভয় পার্শ্বস্থ গিরিগাত্র হইতে একযোগে লম্ফ দিয়া নিম্ন পথে পতিত হইল। তাহাদের পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মাথায় জটাজূট, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম-হস্তে এক একটা রুধিরাক্ত নরশির। সেই সকল রমণীর মুখমণ্ডল ভীষণ অথচ রমণীয়; প্রত্যেকেরই কপালে এক একটা উজ্জ্বল সিন্দূরতিলক; দেহ—সকলেরই গৌরবর্ণ। এই রমণীরা পরস্পর 'কিল্‌বিল্‌' করিয়া কি যেন বলাবলি করিতে করিতে লম্ফ দিয়া নিম্নদেশে পতিত হইল।

পথিক পাঁচজন এই ভীষণ ব্যাপার দেখিবা মাত্র ছোড়ভঙ্গ হইয়া যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। এক জন পথিক বরাবর উত্তর দিকে দৌড়িয়া গিয়া দিনান্তে এক প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। অন্য সঙ্গী চারিজনের মধ্যে কে যে কোথায় গেল, তাহার আর সন্ধান মিলিল না। উত্তর দিক্‌-গত পথিক উল্লিখিত বিমল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইল। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন,—এমন অপূর্ব্ব স্থান তিনি কখন দেখেন নাই! এমন সুমিষ্ট বাতাস বুঝিবা আর কোথাও নাই! সেই মাঠের মৃদুমন্দ বাতাসে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল; ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল। ক্রমে চারিদিক্‌ হইতে একটা অপূর্ব্ব সৌরভ আসিতে লাগিল। পথিকের মন পুলকিত হইল। তিনি ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে এক স্থানে একটী বৃক্ষতলে দেখিলেন,—এক বৃদ্ধ বসিয়া কি যেন ধ্যান করিতেছে। বৃদ্ধকে দেখিয়া পথিক বলিলেন,—বাবা! আমি হরগৌরীর লীলাস্থল কৈলাসে

যাইব—কৈলাস কতদূরে? বৃদ্ধ বলিল,—বাবা, এই ত তুমি কৈলাসপার্শ্বে আসিয়াছ! ভাবনা কি, আর কিছু দূর গিয়াই উপরে উঠিতে থাক।

পথিক তাহাই করিলেন। তিনি সে স্থান হইতে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিলেন। এই সময় পথের পার্শ্বে আর এক স্থানে এক বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পথিক বৃদ্ধাকে দেখিয়া বলিলেন,—মা, হরগৌরীর লীলাস্থলী আর কত দূর?

বৃদ্ধা বলিলেন,—এই ত বাবা, প্রায় আসিয়াছ। তবে কথা এই, তোমার কি এখন সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে?

বৃদ্ধার মুখ হইতে যেমন এই মাত্র কথা বাহির হইল। অমনি পথিক কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি কাঁদ কেন? পথিক বলিল,—মা, আমি বাড়ী যাইব। আমার বাড়ীর জন্য দুঃখ হইতেছে।

বৃদ্ধা বলিলেন,—সত্যই বাড়ী যাইবে? তবে চক্ষু বোজো। পথিক তাহাই করিল। বৃদ্ধা কি এক মন্ত্র পড়িলেন। পথিক বিদ্যুদ্‌বেগে গিয়া, অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যেই নিজের বাড়ীর পশ্চাৎদিকের একটা গর্ত্তের পাড়ে পতিত হইল। পথিক চক্ষু চাহিয়া নিজের বাড়ী দেখিল; দেখিয়াই তাহার চৈতন্য হইল। তাহার বাড়ীর লোকজন তাহাকে লইতে আসিল; কিন্তু সে আর বাড়ী যাইতে চাহিল না; কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—হায় হায়! আমার কি অদৃষ্ট! আমি হাতে চিন্তামণি পাইয়া হারাইলাম! মহামায়ার মায়া বুঝিতে পারিলাম না! আহা, কোথায় সেই দেবদুর্ল্লভ কৈলাসে গিয়াছিলাম! আমার কি মোহ জন্মিল, আমি বাড়ীর জন্য ব্যাকুল হইলাম। অহো, আর আমি বাড়ী প্রবেশ করিব না।

এই বলিয়া পথিক সেই দণ্ডেই ঘোর বিবেকী হইয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গের সেই পথিকচতুষ্টয়ের আর সন্ধান মিলিল না।

রাজকন্যার পণ-ভঙ্গ।

তৃতীয় দিন।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! পুরাকালে নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তটে এক সুসমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যের রাজা অপুত্রক; রাজার যিনি মন্ত্রী, তাঁহারও কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। এই জন্য রাজা ও মন্ত্রী অন্য শত সুখ থাকিতেও অন্তরে একান্ত অশান্তি ভোগ করিতেন।

দৈবক্রমে রাজপত্নী ও মন্ত্রিপত্নী উভয়েই এক সময় গর্ভবতী হইলেন। বিধাতার এমনই বিধান যে, তাঁহারা উভয়েই একই দিনে যথাকালে এক একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মিবার সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। যথাকালে পুত্রযুগলের জাতকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল। দীন দুঃখী, অনাথ আতুর, বহুধন লাভ করিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র উভয়েরই বয়োবৃদ্ধি হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জ্ঞান-গবেষণাও বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারা একত্র অধ্যয়ন, একত্র ভ্রমণ, একত্র ব্যায়াম-চর্চ্চা, একত্র অশ্বারোহণ, একত্র অস্ত্রচালন-পটুতা—অভ্যাস করায়, তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে দিন দিন প্রগাঢ় প্রণয় সঞ্চার হইল। উভয়েই উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বন্ধুতা শেষে এমনই হইয়া দাঁড়াইল যে, একের নিকট অন্যের অদর্শন অসহ্য হইয়া উঠিল। কেহ কাহাকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা উভয়েই উভয়কে বন্ধু বলিয়া ডাকিতেন।

রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র সমবয়স্ক যুবক ; উভয়েই যথাকালে এক একটী সুশিক্ষিতা সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এক রাজকন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র তাঁহার সমান ঘরে সমানজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পর রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র বৎসরাবধি কাল নিজ নিজ পত্নী সহ গৃহে রহিলেন। কিন্তু এই সময়ের পরই তাঁহাদের মতি ভিন্ন দিকে ধাবিত হইল। তাঁহারা সঙ্কল্প করিলেন,—আমরা অশ্বারোহণে সমগ্র দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিব। তাঁহাদের যেমনই সঙ্কল্প, অমনি কার্য্যারম্ভ। বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী আর কি করিবেন? তাঁহারা এই কার্য্যে প্রথমে প্রতিবাদ করিয়াও শেষে অগত্যা সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র আহ্লাদিত হইয়া নিজেদের পাথেয়স্বরূপ কতক-গুলি অল্পভার অথচ মূল্যবান্ মণিমাণিক্য সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা যাইবার সময় নিজ নিজ পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয় বন্ধুর পত্নীই তাঁহাদের বিদেশ হইতে পুনরাগমন পর্য্যন্ত স্ব স্ব পিত্রালয়ে থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। উভয় বন্ধুই সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন।

তাঁহাদের পত্নীগণও পর দিনই স্ব স্ব পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

এ দিকে বন্ধুদ্বয় নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে বহু নদ-নদী, পর্ব্বত-প্রান্তর, বন-উপবন, গ্রাম-নগর—অতিক্রম করিয়া দেখিয়া শুনিয়া মনের আহ্লাদে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের ভ্রমণকাল চারি বৎসর পূর্ণ হইল। পঞ্চম বৎসরে তাঁহারা স্বগৃহে আসিবার মনন করিলেন। পথে আসিতে আসিতে মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে কহিলেন,—বন্ধু, আমাদের

পত্নীগণ পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছে; আমরা যাইবার সময় তাহাদের সহিত একবার দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাই এবং সম্ভব হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়াই গৃহে গমন করি।

রাজপুত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। যাইতে যাইতে প্রথমেই রাজপুত্রের শ্বশুর বাড়ী নিকটবর্ত্তী হইল।

এ সময় দিবা অবসান হইয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তাচলে ডুবিয়াছেন। বিহঙ্গমকুল আপন আপন কুলায় অভিমুখে ছুটিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা-'রাণী' দীপাবলীর মালা পরিয়া রাজপুত্রের শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত।

রাজপুত্রের শ্বশুর একজন রাজা। রাজার বাড়ী; সুতরাং বহুদূর পর্য্যন্ত চারিদিকে আলোকস্তম্ভ প্রোথিত। বন্ধুদ্বয় সেই আলোক সাহায্যে পথ দেখিয়া রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাজবাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারী রাজপুত্রকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বৈঠকখানা গৃহে লইয়া গিয়া বসিবার আসন প্রদান করিল। দুই বন্ধু দুইটী আরাম-কেদারায় অঙ্গ রাখিয়া পথশ্রান্তি অপনয়ন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী বাড়ীর ভিতর গিয়া রাজপুত্রের আগমন-সংবাদ জানাইল। কিছুক্ষণ পরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া রাজপুত্রকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। মন্ত্রি-পুত্র সেই বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আহারের জন্য অনেক কাল পরে সামান্য মাত্র মিষ্টান্ন ও এক গ্লাস জল আসিয়া পৌঁছিল।

মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের শ্বশুরালয়ের আদর-আপ্যায়নের ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এ কি রকম ভাব-পরিবর্ত্তন! কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আমি পূর্ব্বেও তো এখানে আসিয়াছি; তখন তো

আদর-আপ্যায়নের অবধি থাকিত না। এখন এরূপ হইল কেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে। আচ্ছা দেখি,—সে রহস্য ভেদ করা যায় কি না!

এইরূপ আলোচনা করিয়া মন্ত্রিপুত্র আরও একটু কাল অপেক্ষা করিলেন। রাজবাড়ীর সকল লোকই নিদ্রিত হইল। তখন তিনি ধীরে ধীরে সুকৌশলে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বুঝিলেন,—অন্তঃপুরে লোকজন বেশী নাই; সিঁড়ি বাহিয়া উপর তলায় উঠিলেন; দেখিলেন,—সেস্থানও নীরব নিস্তব্ধ। মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন,—রাজপুত্র কোথায়? কোথায় তাঁহার শয্যা-গৃহ? কিছুদূর গিয়াই দেখিলেন,—একটা গৃহের গবাক্ষ হইতে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে। মন্ত্রিপুত্র সেই গৃহের অতি নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষপথে গৃহ-মধ্যস্থ সকল ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মন্ত্রিপুত্র দেখিলেন,—রাজপুত্র পালঙ্কোপরি নিদ্রিত। নিম্নে কিয়দ্দূরে তাঁহার পত্নী রাজপুত্রী একখানা থালায় করিয়া বিবিধ খাদ্য সামগ্রী স্তরে স্তরে সাজাইতেছেন। মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন,—রাজপুত্রের বুঝি এখনও আহার হয় নাই; তাই রাজপুত্রী নিজেই তাঁহার আহারের আয়োজন করিতেছেন? কিন্তু একটু কাল পরেই তাঁহার এ ধারণা রহিল না। তিনি দেখিলেন,—এক হাতে নানা খাদ্য সামগ্রীপূর্ণ সেই থালা একখানি রোমাল দিয়া ঢাকিয়া অন্য হাতে একটী ক্ষুদ্র আলো লইয়া রাজপুত্রী গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মন্ত্রিপুত্র এই ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন,—পরন্তু অতীব কৌতু-হলান্বিত হইয়া রাজকন্যার অগোচরে ধীরে—অতি গোপনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। রাজপুত্রী কখন দ্রুতবেগে, কখন ধীরপদে যাইতেছিলেন। তিনি ক্রমে অন্তঃপুরের একটা গুপ্ত দ্বার দিয়া রাজবাড়ীর নাতিদূরস্থ

অশ্বশালায় প্রবেশ করিলেন! এখানে প্রবেশ মাত্র এক দীর্ঘাকার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া কহিল,—হারে, শালী, আজ তোর এত রাত্রি হ'ল কেন? রাজপুত্রী সবিনয়ে উত্তর করিলেন,—কি করিব বন্ধু, আজ আমার স্বামী এসেছে, তাই তাহাকে খাওয়াইয়া শোয়াইয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। দীর্ঘ পুরুষ এই কথা শুনিয়া সক্রোধে কহিল,—কি, তোর স্বামী এসেছে? আচ্ছা দেখি, তুই আমায় কেমন ভালবাসিস্! এই নে, এই অস্ত্র দিলাম, তোর স্বামীকে এখনই খুন করিয়া আয়, নইলে আমি তোর এ খাদ্য সামগ্রী কিছুই গ্রহণ করিব না।

বলা বাহুল্য, ঐ দীর্ঘকায় পুরুষ রাজকীয় অশ্বপালক। রাজকন্যার সহিত ইহার অবৈধ প্রণয় অতি অল্পদিন হইল ঘটিয়াছে। এই অল্পদিন মধ্যেই পাপিনী রাজপুত্রী উহার একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছে।

অশ্বপালের সেই ভীষণ কথা শুনিয়া মন্ত্রিপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন; কিন্তু পাপিনী রাজনন্দিনী একটুও বিচলিত হইল না। পাছে অশ্বপালের বন্ধুত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই নির্ম্মম কর্ম্ম সাধনে উদ্যত হইল। মন্ত্রিপুত্র ফিরিয়া গিয়া রাজপুত্রকে জাগাইয়া যে সতর্ক করিয়া আসিবেন, অথবা নিজেই পাপিনীর গতিরোধ করিবেন, সে অবকাশও পাইলেন না। পাপিনী বিদ্যুদ্‌বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং যাইবার সময় সেই গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র রাজকন্যার পশ্চাদনুসরণেরও সুযোগ পাইলেন না।

মন্ত্রিপুত্র বাহিরেই রহিলেন। তিনি আর ভিতরে প্রবেশ করিবার কোনই সুযোগ পাইলেন না; তাঁহার মন রাজপুত্রের জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন,—এখানে দাঁড়াইয়া

থাকিয়া লাভ নাই। আমি ঘুরিয়া সদর দরজার দিকে যাইবার চেষ্টা করি। যদি কোন কৌশলে সে পথে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারি, আর রাজপুত্রকে জীবিত পাই, তাহা হইলে পাপিনীর পাপ চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারিব।

এই ভাবিয়া মন্ত্রিপুত্র প্রায় সিকি মাইল পথ ঘুরিয়া বাড়ীর প্রধান ফটকের দিকে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন।

এ দিকে পাপিনী রাজকন্যা রাজপুত্রের শয়ন-কক্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রাজপুত্র এক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—রাজবাড়ীর বহির্বাটীস্থিত উদ্যানে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইতেছে। একটা প্রকাণ্ড বিকট রাক্ষস রাজপুত্রের সহধর্ম্মিণীকে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহার প্রিয় সহচর মন্ত্রিপুত্র তাহা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন,—তাঁহার সহধর্ম্মিণীও রাক্ষসী হইয়া গেল এবং শাণিত ছুরিকা-হস্তে রাজপুত্রকেই হত্যা করিতে ছুটিল।

এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াই রাজপুত্র শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং শূন্য গৃহ দেখিয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যেমন আসিলেন, মন্ত্রিপুত্রও তৎক্ষণাৎ সেই-খানে আসিয়া উপস্থিত। তখন উভয় বন্ধু সবিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের সংবাদ লইলেন; এবং এ যাবৎ কে কি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলিলেন। স্থির হইল,—এখনই তাঁহারা এ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া যাইবেন। পরামর্শ মত তাহাই হইল। উভয়ে উভয়ের অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রবল বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন।

অশ্ব পবনবেগে চলিল। তাঁহারা পরদিন সায়ংকালে মন্ত্রিপুত্রের শ্বশুরালয়ে গিয়া পৌঁছিলেন। মন্ত্রিপুত্রের অন্তর কাঁপিতে লাগিল। তিনি

মনে মনে ভাবিলেন,—রাজপুত্রের শ্বশুরালয়ে যাহা দেখিয়া আসিলাম, বুঝি এখানেও আবার সে দৃশ্য দর্শন করিতে হয়।

মন্ত্রিপুত্র নানা সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইয়া শ্বশুরভবনে উপস্থিত হইলেন। এখানে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রের আদর-আপ্যায়নের অবধি রহিল না। মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন,—মুখপাত তো মন্দ নয়; পরে কি হয়, দেখা যাউক।

মন্ত্রিপুত্র যাহাই ভাবুন, এখানে তাঁহার কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই। এখানকার সৌজন্য, শিষ্টাচার, সাধুতা—আগাগোড়া সমান।

তাঁহারা উভয় বন্ধু রাজোচিত আহারাদি করিয়া রাত্রে শয়ন করিতে গেলেন। রাজপুত্র সুরম্য হর্ম্ম্যে সুসজ্জিত কক্ষে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন। মন্ত্রিপুত্রের শয্যা হইল—অন্তঃপুরে; তিনি সেইখানে শয়ন করিতে গেলেন। গিয়া দেখেন,—শয়নকক্ষ প্রোজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত; তাম্বূলাদি বিবিধ বিলাসদ্রব্য সুসজ্জিত; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী বা কোন পরিচারিকা সেথায় নাই।

মন্ত্রিপুত্র একটু বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণ পরেই একজন পরিচারিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং মন্ত্রিপুত্রকে অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে বলিল,—আমি প্রভুনন্দিনীর আদেশে আপনার নিকট একটী সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।

মন্ত্রিপুত্র। কি সংবাদ আছে বল। তোমাদের প্রভুনন্দিনী এখন কোথায়? তিনি কি করিতেছেন?

পরিচারিকা। প্রভুনন্দিনী এখনও উপবাসিনী। তিনি ভগবান্ চন্দ্রমৌলির পূজার জন্য গিয়াছেন; এখনই আসিয়া আপনার পাদ-বন্দনা

করিবেন। তাঁহার আদেশে আমি এই সংবাদ দিতেই আপনার নিকট আসিয়াছি।

মন্ত্রিপুত্র। চন্দ্রমৌলির মন্দির কত দূর?

পরিচারিকা। এই বেশী দূর নয়। এখান হইতে খানিক দূরেই একটা অরণ্য; সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার পবিত্র মন্দির।

মন্ত্রিপুত্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি এইখানে একটু থাক। আমি বন্ধু রাজপুত্রের সহিত একটা কথা কহিয়া আইসি।

পরিচারিকা মন্ত্রিপুত্রের শয়নকক্ষে রহিল। মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের নিকট যাইবার অছিলায় একেবারে সে পুরী হইতে দ্রুত বাহিরে আসিলেন এবং পত্নীর উদ্দেশে চন্দ্রমৌলির মন্দির অভিমুখে ছুটিলেন। পথে খানিকটা গিয়াই দেখিলেন,—অদূরে কে এক নারীমূর্ত্তি যাইতেছে। তাহার বাম হস্তে একটা উজ্জ্বল আলো, আর দক্ষিণ হস্তে পুষ্প-পাত্র। মন্ত্রিপুত্র দেখিয়াই বুঝিলেন,—ইনিই তাঁহার পত্নী। তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তর্পণে যাইতে লাগিলেন।

অগ্রগামিনী রমণী ক্রমে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। মন্ত্রিপুত্রও অলক্ষ্যে পিছু পিছু চলিলেন। রমণী সেই গভীর অরণ্য-মধ্যস্থ দেবমন্দিরে গিয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলির পূজায় বসিলেন। মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন, এখন পর্য্যন্ত স্ত্রী-চরিত্রে কোন অসাধুতার চিহ্ন দেখিতেছি না; দেখি পরে কি হয়? ভাবিয়া মন্ত্রিপুত্র মন্দিরের পশ্চাৎদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমণীর পূজা শেষ হইল। তিনি মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া মন্দিরের অদূরস্থিত একটা ক্ষুদ্র আস্তানা প্রান্তে গমন করিলেন। আস্তানাটা তরুলতায় আচ্ছন্ন, দূর হইতে ভালরূপ দেখা যায় না। মন্ত্রিপুত্র

ভাবিলেন,—ঐ নারী এখানে আবার কোথায় যাইতেছে! ভাবিয়া তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। বিশেষ অনুভব করিয়া দেখিলেন,—আস্তানা মধ্যে একটী ক্ষীণরশ্মি প্রদীপ আছে। মন্ত্রিপুত্র উঁকি মারিয়া নিপুণ-ভাবে তাকাইলেন; লক্ষ্য হইল,—কে এক দীর্ঘকায় পুরুষ নিশ্চল্দেহে সমাসীন। দেখিয়াই মন্ত্রিপুত্রের মাথা ঘুরিয়া গেল; ভাবিলেন,—এ কি দৃশ্য! আমার পত্নী কি তবে পাপিনী! ইহা কি উহার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্থান! না জানি, এখানেই বা আবার কোন অপ্রিয় আলাপ শুনিতে হয়? মন্ত্রিপুত্রের অন্তর কাঁপিল; তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রমণী আরও একটু দূর অগ্রসর হইলেন। মন্ত্রিপুত্রের সংশয় আরও দৃঢ় হইল। কিন্তু এ কি! মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন করিয়া রমণীর মধুর কণ্ঠ হইতে তিনটী শব্দ উঠিল,—"বাবা, বাবা, বাবা!" মন্ত্রিপুত্র সবিস্ময়ে আরও দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন; বিশেষভাবে তাকাইলেন; দেখিলেন,—আস্তানা মধ্যস্থ পুরুষ ধ্যানমগ্ন; গাত্র বিভূতিভূষিত:—সৌম্য শান্ত প্রসন্ন মুখশ্রী! তাহাতে পাপগন্ধ থাকিতে পারে না। মন্ত্রি-পুত্র কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন! আবার নারীকণ্ঠ হইতে উঠিল,—"বাবা, বাবা, বাবা!" এইবার ধ্যান ভঙ্গ হইল। সাধু পুরুষ বলিলেন,—কি বেটী, তুই আসিয়াছিস্? কেন, আজ এত রাত্রে আসিলি কেন? তোর তো পতিদেবতা উপস্থিত। আজ তোর সেই দেবতারই পাদ-পূজার দিন।

রমণী। বাবা, চন্দ্রমৌলির পূজা করিয়া, আপনার আশীর্ব্বাদ লইবার জন্যই আসিয়াছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন,—আমার স্বামী যেন তাঁহার বন্ধু সহ সর্ব্বদা কুশলে থাকেন।

সাধু পুরুষ। মা, তোর ন্যায় দেব-দ্বিজ-পরায়ণা রমণীর কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। তুই এত দিন ভগবান্ চন্দ্রমৌলির অর্চনা করিয়াছিস্, তাহারই ফলে তোর স্বামীর বন্ধু রাজপুত্র সে দিন প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে। এ কথা তুই পরে জানিতে পারিবি। দেব-ভক্তি-বলে তোর সকল অমঙ্গল দূর হইবে, তুই নিশ্চিন্ত হইয়া এখন গিয়া স্বামি-সেবা কর্।

মন্ত্রিপুত্র এই সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন,—ওঃ এ সাধু তো সহজ সাধু নহেন। ইনি রাজপুত্রের প্রাণরক্ষার কথাও জানিয়াছেন। তবে আমি যে এখানে আছি, ইহাও উনি নিশ্চয় জানেন। আমি পত্নীর প্রতি সন্দেহ করিয়া তো ভাল করি নাই। এমন সাধু আমার দুষ্ট অভিপ্রায়ে এখানে আসার কথা জানিয়া না জানি আমায় কতই ঘৃণিত নীচ মনে করিবেন?

এই ভাবিয়া মন্ত্রিপুত্র সাধুর নিকট গিয়া ক্ষমা চাহিলেন; বলিলেন,—মহাপুরুষ, ক্ষমা করুন। আমি নীচ, আমি সন্দেহবশে এখানে উপস্থিত!

সাধু হাসিয়া বলিলেন,—তোমার সাধ্বী পত্নীর প্রতি আমি চিরপ্রসন্ন; সুতরাং তুমিও আমার প্রসাদ লাভের যোগ্য। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে। আর ধ্যানে বিঘ্ন করিও না, প্রস্থান কর; সময়ান্তরে আসিও।

মন্ত্রিপুত্র ও তাঁহার পত্নী সাধুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। পথে আসিতে আসিতে পতিপত্নীর অনেক কথা হইল। মন্ত্রিপুত্রের মুখে রাজপুত্রের প্রাণসঙ্কটের কথা শুনিয়া পত্নী বিস্মিত হইলেন। এদিকে পত্নীর মুখে সাধুর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কথা শুনিয়া মন্ত্রিপুত্র মনে মনে তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তি স্থাপন করিলেন।

সে রাত্রি পত্নী সহ মন্ত্রিপুত্রের সুখে অতীত হইল। পরদিন মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে লইয়া পুনরায় দেশ ভ্রমণেই চলিলেন। যাইবার সময় মন্ত্রিপুত্রের পত্নী বলিয়া দিলেন,—আপনারা এ দেশের সীমা অতিক্রম করিলেই সম্মুখে দুইটী পথ দেখিতে পাইবেন। দক্ষিণের পথে যাইবেন না। ঐ স্থান হইতে বাম পথ অবলম্বন করিবেন। কারণ দক্ষিণের পথ নদীতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ নদীতীরে এক রাজকন্যার প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তির এমনই শক্তি যে, তাহা দেখিবা মাত্র অনেক রাজপুত্র তাহা জড়াইয়া ধরিয়া অবশেষে প্রাণ হারাইয়াছেন। আমার ইহা শুনা আছে; তাই আপনাকে সাবধান করিয়া দিলাম।

মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—না, এমন বিঘ্নসঙ্কুল পথে আমরা যাইব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এই বলিয়া তিনি রাজপুত্রকে সঙ্গে করিয়া অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—একটা প্রস্তরগঠিত নারীমূর্ত্তির এরূপ অলৌকিক শক্তির কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এ কাণ্ড আশ্চর্য্য বটে; না দেখিয়া গেলেও তো কেমন একটা অনির্ব্বৃতি লইয়া যাইতে হয়। যা' করেন ভবিতব্যতা, একবার না দেখিয়া যাইব না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে দেশের প্রান্ত-সীমায় উপস্থিত হইলেন। এখানে সত্য সত্যই দুইটী প্রশস্ত পথ পরিদৃষ্ট হইল। মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের নিকট পূর্ব্বেও কিছু বলেন নাই, এখনও কিছু না বলিয়াই দক্ষিণের পথে অশ্বচালনা করিলেন।

ক্রমে নদীতীরস্থ সেই প্রস্তররচিত নারীমূর্ত্তির নিকট গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র কিছু দূর হইতেই সেই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—বন্ধু, বন্ধু! দেখ দেখ—কি অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি! এরূপ

অলৌকিক দৃশ্য আমি তো আর দেখি নাই, সুতরাং উহার খুব নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া আইসি। এই বলিয়াই তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একবার নিষেধ করিলেন; কিন্তু রাজপুত্র তাহা শুনিলেন না। তিনি একেবারেই তাহার অতি নিকটে গেলেন। তাঁহার মুখে মাত্র এই একটী কথা শুনা গেল,—আ মরি মরি! এমন রূপ তো আর দেখি নাই! এই বলিয়াই সেই মূর্ত্তি রাজপুত্র জড়াইয়া ধরিলেন। মন্ত্রিপুত্র ভাবিলেন,—এ বিপদ কম নয়, বুঝি বা স্ত্রীর কথাই ফলিয়া যায়। এখন উপায় কি?

এই ভাবিয়া তিনি রাজপুত্রকে অনেক ডাকিলেন, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না।

রাজপুত্র যেন সে রূপমোহে মূর্চ্ছিত! তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়! তিনি অতিকষ্টে বলিলেন,—বন্ধু, বাঁচাও।

মন্ত্রিপুত্র বাস্তবিকই বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, কি করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, ভাবিয়া আর কূল পাইতেছেন না। ভাবিলেন,—অজানিত অপরিচিত বিদেশে একা আমি কোন্ উপায়ে রাজপুত্রকে আবার প্রকৃতিস্থ করিয়া দেশে ফিরিব? ইত্যাদি নানা ভাবনায় তিনি তন্ময়। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন,—না আর ভাবিব না; আমার লোকবল নাই, আমি বুদ্ধিবলেই সকল রহস্য জানিব এবং রাজপুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দেশে লইয়া যাইব।

এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রিপুত্র সেই প্রস্তরমূর্ত্তির নিম্ন বেদিকায় সন্ধান করিতে লাগিলেন,—কোন প্রস্তরফলকে এই মূর্ত্তিসম্বন্ধে কোন বিবরণ খোদিত আছে কিনা? সন্ধান করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন,—

শিল্পীর নাম ও তাহার ঠিকানা খোদিত আছে। কবে কোন্ তারিখে এই প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র অশ্বারোহণে অতি দ্রুত সেই শিল্পীর উদ্দেশে ছুটিলেন। নদীতীরের অনতি দূরেই এক প্রাচীন ভগ্ন সহর ছিল। মন্ত্রিপুত্র সেইখানে গিয়া অতিকষ্টে অনুসন্ধান করিয়া শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কথায় বার্ত্তায় সেই সময় শিল্পী ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির ইতিহাসসম্বন্ধে মন্ত্রিপুত্রের নিকট বলিল,—মহাশয়! আমি পূর্ব্বে এক জাহাজে কর্ম্ম করিতাম। প্রস্তরশিল্প ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। " নদীর অপরপারে এক রাজা আছেন। তিনি এক সময় সপরিবারে আমাদেরই জাহাজে জলপথভ্রমণে মনস্থ করেন। রাজার একটী মাত্র কন্যা; কন্যাটীর বিবাহ এখনও হয় নাই; বোধ হয়, এ জীবনে হইবেও না। কারণ, কন্যা পণ করিয়া বসিয়াছে,—আমি পুরুষের মুখ দেখিব না। সে যা' হউক, এই কন্যা লইয়া রাজা যখন জাহাজে উঠেন, তখন আমি জলমধ্যে সেই কন্যার ছায়া মাত্র দেখিতে পাই। ছায়া দেখিয়াই 'কায়া'র অনুমান করিলাম; আমার মনে হইল,—এরূপ সুন্দরী ত্রিভুবনে আর নাই। ভাবিলাম,—এই সৌন্দর্য্যরাশি চিরদিন কঠোর পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া যাইবে, কেহই দেখিতে পাইবে না, কাহারও ভোগে আসিবে না। যা হউক, আমি ইহার একটা প্রতিকৃতি রাখিয়া দিব। এই ভাবিয়া বহুদিন অনন্যচেষ্ট ও তন্ময় হইয়া ঐ প্রস্তরমূর্ত্তি আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং যে নদীতে রাজকন্যার ছায়া দেখিয়াছিলাম, সেই নদীরই তীরে উহা রাখিয়া দিয়াছি। কিন্তু ফল বড়ই মন্দ হইতেছে। অনেক রাজকুমার ঐ মূর্ত্তি দেখিয়াই উন্মাদ-

প্রায়; শুনিয়াছি—কয়েক জন রাজপুত্র না কি ঐ মূর্ত্তির মূলদেশে বসিয়া-বসিয়াই অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণ হারাইয়াছেন!

মন্ত্রিপুত্র শিল্পীর মুখে ঐ রাজকন্যার কাহিনী শুনিয়া স্থির করিলেন,—রাজপুত্রেরও জীবনের তবে আশা নাই। যদি কোন গতিকে সেই 'জীয়ন্ত' রাজকন্যাকে আনিয়া দেখাইতে পারি, তবেই তিনি বাঁচিতে পারেন।

এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি রাজপুত্রের নিকট আসিয়া, সকল বিবরণ বলিবার পর, শেষে বলিলেন,—বন্ধু! কয়েক দিন কোনরূপে জীবনধারণ কর; দেখি—নকল ছাড়িয়া আসলে তোমায় মিলাইতে পারি কি না? রাজপুত্র আশায় উৎফুল্ল হইয়া সেই মূর্ত্তির পাদমূলেই ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সেই মূর্ত্তি ছাড়িয়া যাইবার তাঁহার শক্তি হইল না। এমনই সে রূপজ মোহের মদিরা!

মন্ত্রিপুত্র অবিলম্বে কোন গতিকে নদী পার হইয়া সেই রাজার রাজধানীতে গেলেন। সেখানে গিয়া এক বৃদ্ধাকে অর্থবলে বশ করিলেন। বৃদ্ধা রাজকন্যার ফুল যোগাইত। মন্ত্রিপুত্র একদিন বৃদ্ধাকে বলিলেন,—তোমাকে আরও বহু অর্থ দিব। তুমি একটী সংবাদ আমায় আনিয়া দাও। বৃদ্ধা বলিল,—কি সংবাদ? মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—শুনিতে পাই তোমাদের রাজকন্যা নাকি পুরুষের মুখ দেখিবেন না, এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা, সেই বিষয়টী তুমি যেরূপেই হউক, জানিয়া আসিয়া আমায় বলিবে।

বৃদ্ধা সম্মত হইল এবং নানারূপে রাজকন্যার মনস্তুষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই কথাটী শুনিয়া আসিল। বৃদ্ধা আসিবা মাত্র মন্ত্রিপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা বলিল,—অনেক সাধ্য সাধনার পর রাজকন্যার মুখে শুনিলাম,—পূর্ব্ব জন্মে তিনি না কি এক বিহঙ্গমপত্নী

ছিলেন। তাঁহার দুই তিনটী শাবক জন্মিয়া ছিল। একদা বনমধ্যে দাবানল উত্থিত হইয়া সমস্ত বন গ্রাস করিতে বসিল। তাঁহার স্বামী বিহঙ্গম অগ্নিভয়ে নিজে পলাইয়া গেল। তিনি একাকী সন্তান কয়টী লইয়া পলাইতে পারিলেন না; সন্তানস্নেহে তাঁহাকে সেইখানেই দগ্ধ হইতে হইল। এই পূর্ব্বজন্ম কথা তাঁহার স্মরণ আছে বলিয়াই তিনি স্বার্থপর পুরুষকে অতি ঘৃণা করেন; তাই তাঁহাদের মুখ দেখিতে চাহেন না।

মন্ত্রিপুত্র এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাজকন্যাকে হাতে আনিবার জন্য মনে মনে একটা উপায়ও স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বৃদ্ধার বাড়ী ছাড়িলেন এবং রাজবাড়ীর এক কর্ম্মচারীর বাসায় গিয়া আশ্রয় লইলেন। কথায় বর্ত্তায় আলাপ-পরিচয়ে রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার অল্পকালের মধ্যেই বেশ একটু বন্ধুতা জন্মিল। মন্ত্রিপুত্র সেই কর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজপুরে রাষ্ট্র করাইলেন,—ভিন্ন দেশ হইতে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন; তিনি বাল্য হইতেই স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না, এবং ভবিষ্যতেও দেখিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা।

মন্ত্রিপুত্র কর্ম্মচারীর নিকট নিজেকে রাজপুত্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ পরিচয় দেওয়ার তাঁহার একটা উদ্দেশ্যও ছিল।

যা হউক, ক্রমে রাজা এই সংবাদ শুনিলেন, কৃত্রিম রাজপুত্রকে তাঁহার দেখিবার ইচ্ছা হইল। তিনি সেই কর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজপুত্রকে নিজ সভায় আনাইলেন। রাজার অন্তঃপুরমধ্যেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল। রাজকন্যা কি রাজপত্নীরা সকলেই কৌতূহলবশে এই স্ত্রী-মুখ-দর্শন-বিমুখ রাজপুত্রকে দেখিতে আসিলেন। পর্দ্দার অন্তরালে তাঁহাদের স্থান হইল। মস্ত মজলিস বসিল। রাজা নবাগত রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। যদি

বাধা না থাকে, তবে আপনি কেন স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না, এ কথাটী আমাকে শুনাইলে আমি বড়ই আনন্দিত হই।

রাজপুত্র ওরফে—মন্ত্রিপুত্র কহিলেন,—শুনুন সকলে;—পূর্ব্বজন্মে আমি এক বিহঙ্গম ছিলাম। আমার স্ত্রী ছিল; দুই তিনটী শাবক ছিল। একদা বনমধ্যে দাবানল দেখা দেয়। অনলে সমস্ত দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এই সময় আমার স্ত্রী বিহঙ্গমী প্রাণভয়ে পালাইয়া যায়। তিনটী শাবক লইয়া একাকী আমি যাইতে অপারগ হই; কাজেই স্নেহে পড়িয়া তাহাদের সহিত আমাকে দগ্ধ হইতে হয়। অদৃষ্টক্রমে আমি এক রাজপুত্র হইয়া জন্মিয়াছি বটে; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া আমার আর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় না।

এই কথা বলিবা মাত্র পর্দ্দার মধ্য হইতে রাজকন্যা বলিয়া উঠিলেন,—শাবক কয়টী ফেলিয়া প্রাণভয়ে পালাইয়াছিলাম আমি—না তুমি? এই বলিয়া ক্রোধে অভিমানে রাজকন্যা একেবারে পর্দ্দা ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন। সকলে দেখিয়া সবিস্ময়ে অবাক্! ব্যাপার কি? ক্রমে সকলে জানিতে পারিলেন,—রাজকন্যাই সেই পূর্ব্বজন্মের বিহঙ্গমী। কৃত্রিম রাজপুত্র রাজকন্যার রূপ দেখিয়া হতজ্ঞান। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব।

এই আকস্মিক ঘটনায় রাজকন্যা ও কৃত্রিম রাজপুত্র কাহারও প্রতিজ্ঞা অটল রহিল না; পরস্পর স্ত্রী-পুরুষের মুখ পরস্পর দেখিলেন। তখন রাজা কন্যাকে বলিলেন,—মা, প্রতিজ্ঞা যখন ভাঙ্গিয়াছে; তখন এই রাজপুত্রের সহিতই তুমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও।

রাজকন্যা মাথা নীচু করিয়া মৌনাবস্থায় রহিলেন। কৃত্রিম রাজপুত্রকেও বিবাহের জন্য অনুরোধ করা হইল।

ক্রমে উভয়েই সম্মত হইলেন। কৃত্রিম রাজপুত্র বলিলেন,—আমাদের কুলপ্রথা এই যে, কন্যা লইয়া আমাকে নিজালয়ে যাইতে হইবে। সেখানে বসিয়াই যথাবিধি বিবাহকার্য্য হইবে।

তাহাই হইল। মন্ত্রিপুত্র নিজ বুদ্ধিবলে রাজকন্যাকে আনিয়া রাজপুত্রকে অর্পণ করিলেন। রাজপুত্রের মৃত দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল। তিনি সকল ঘটনা শুনিয়া মনে মনে বন্ধু মন্ত্রিপুত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। রাজপুত্রী নিজেরই তুল্যাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; সকল ব্যাপার বুঝিলেন; কৌশলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বা পণ ভঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি আর দুঃখিত হইলেন না। তখন উভয় বন্ধু হৃষ্ট হইয়া দেশে চলিলেন। যাইবার সময় মন্ত্রিপুত্র নিজ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। উভয়েই এখন পত্নীযুক্ত হইলেন।

রাজপুত্রের পূর্ব্ব পত্নী সেই পাপিনী—সেই সেদিন রাজপুত্রের হত্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া অশ্বপালের নিকট গমন করিলে, সে তাহার কথায় বিশ্বাস করিল না। অশ্বপাল বুঝিল,—ইচ্ছা করিয়াই রাজপুকে হত্যা না করিয়া রাজকন্যা আমার নিকট মিথ্যা বলিতেছে। এই বুঝিয়া সে ক্রোধে রাজকন্যাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার এ কূল ও-কূল দু'কূলই গেল।

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র স্বস্ব পত্নী সহ দেশ ভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন, সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিলেন।

নরসুন্দর।

বাদসাহ বলিলেন,—পণ্ডিতজী! আমি শুনিয়াছি,—জনসমাজে নাপিত, ভূত ও ব্যাঘ্র সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আপনার যদি জানা থাকে, তবে সেই সম্বন্ধে দুই একটী গল্প বলুন।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! নাপিতের নামান্তর—নরসুন্দর। এই নরসুন্দরদিগের চাতুরীসম্বন্ধে আমার অনেক গল্পই জানা ছিল। তন্মধ্যে এক্ষণে একটী মাত্র গল্প স্মরণ হইতেছে, জাঁহাপনার অনুমতি হয়ত অগ্রে আমি সেই গল্পটী বলি।

বাদসাহ তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, গড়গড়ার নল হাত হইতে ফেলিলেন এবং সহাস্তবদনে বলিলেন,—বলুন বলুন, অগ্রে সেই গল্পটাই শুনা যাউক।

পণ্ডিতজী কহিলেন,—জাঁহাপনা! আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, ঐ সময় সর্ব্বজন্তুই মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারিত। আপনার এই দিল্লীসহরের দক্ষিণে রাজপুতনা অঞ্চলে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি রাজ্য আছে। বহু পূর্ব্বকালে এই সকল রাজ্যের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা বড়ই বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন, নাপিত দ্বারা প্রত্যহই ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতেন।

শাস্ত্রের নিষেধ, এই জন্য কেবলমাত্র জন্মবারেই তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম করাইতেন না। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দিনেই তাঁহার ক্ষৌর কর্ম্মের বাধা ছিল না। যে নাপিত তাঁহার ক্ষৌরকর্ম্ম করিত, তাহার বাড়ী রাজার বাড়ী হইতে বহুদূরে না হইলেও যাইতে আসিতে প্রত্যহ নাপিতকে একটী

জঙ্গল পথ অতিক্রম করিতে হইত। সেখানে কোন জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব ছিল না; তাই নাপিত নির্ভয়ে নিশ্চিন্তমনে বরাবর সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত।

ঘটনাক্রমে একদিন একটা ব্যাঘ্র সেই জঙ্গলে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘটার দুই দিন আহার জুটে নাই, তাই সে অত্যন্ত ক্লান্ত; কিন্তু ক্লান্ত হইলেও মানুষ মারিবার শক্তি তখনও তাহার বিলক্ষণই ছিল। বাঘটা এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া জীবজন্তু মারিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু জন্তু মিলিল না; কাজেই সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পথের ধারে একটা বৃক্ষপার্শ্বে বসিয়া রহিল। বাঘ বসিয়া বসিয়া সেদিন সমস্ত রাত্রি সেইখানেই কাটাইল।

রাত্রি যখন প্রভাত হইল; সূর্য্যের কিরণ এক একটু করিয়া প্রকাশ পাইল; তখন রাজ-নাপিত রাজাকে কামাইবার জন্য সেই পথে রাজ-বাড়ী অভিমুখে চলিল। নাপিতের বামহস্তে একটা ব্যাগ; ব্যাগের মধ্যে কামাইবার যন্ত্রপাতি এবং একখানি দর্পণ, আর দক্ষিণ হস্তে একগাছী লাঠী। নাপিত অকুতোভয়ে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে যেমন সেই বৃক্ষের নিকট আসিল, অমনি বাঘটা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং খুব গম্ভীরভাবে নাপিতকে বলিল,—থাম্, আর যাইতে হইবে না। আজ দুইদিন আমার আহার জুটে না।

হঠাৎ সম্মুখে বাঘ দেখিয়া নাপিত প্রথমে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু নাপিত কিনা, তাই তখনই তাহার এক বুদ্ধি হইল। সে 'হাঃ-হাঃ' করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বাঘের উদ্দেশে কহিল,—ভালই হইয়াছে। বিধাতা আমায় এই পথে আনাইয়া ভালই করিয়াছেন।

বাঘ বলিল, নাপিত! তোর এত উল্লাস কেন রে?

নাপিত কহিল,—আরে উল্লাস আবার করিব না! আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়াছি, আজ তোকে না পাইলে রাজা আমার 'গরদান' লইত। বাঘ বলিল,—কেন, কি হইয়াছে, ব্যাপার কিরে নাপিত?

নাপিত কহিল,—আর ব্যাপার! আমাদের রাজা বাতে ভুগিয়া ভুগিয়া এতদিন ভারী কষ্ট পাইতেছেন, কত 'অষুধ' করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না; শেষে এক সন্ন্যাসী রাজাকে এক 'অষুধ' বলিয়া দিয়াছেন; রাজার আদেশে সেই 'অষুধ' যোগাইবার ভার পড়িয়াছে আমার উপর। আজ 'অষুধ' যোগাইবার শেষ দিন। তোকে যদি আজ না পেতাম, তা'হলে রাজা আমায় শূলে চড়াইত।

বাঘ বলিল, সে কি কথা? আমাকে পাইয়া তোর প্রাণ বাঁচিল কিসে!

নাপিত।—আরে শোন, রাজার সেই 'অষুধে' একশ' আটটা বাঘের তেল লাগিবে। সন্ন্যাসী বাঘ ধরার 'অষুধ'ও বলিয়া দিয়াছে। আমি সেই 'অষুধ' দিয়া এ যাবৎ একশ' সাতটা বাঘ ধরিয়াছি। একটা কিছুতেই মিলিতেছিল না। আজ বিধাতা তোকে মিলাইল। নহিলে আমার প্রাণ থাকিত না।

বাঘ বলিল,—ইস্। মানুষে আবার বাঘ ধরিতে পারে নাকি! তোর সব মিথ্যা কথা।

নাপিত বলিল,—বলিস্ কিরে,এই দ্যাখ্ একটা বাঘ যে এখনও আমার সঙ্গে আছে। এটাকে কা'ল রাত্রে ধরেই কাঁচের খাচায় পু'রে রেখেছি।

বাঘের এইবার ভয় হইল। কিন্তু মুখের দাপট ছাড়িল না; বলিল,—কৈ তোর বাঘ দেখা দেখি?

নাপিত তখন ত্বরাত্বরি তাহার ব্যাগ হইতে বড় একখানা দর্পণ বাহির করিয়া বাঘের সম্মুখে ধরিল। বাঘ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া সভয়ে চিৎকার করিতে করিতে সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিল।

নাপিত হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং সানন্দে রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজাকে সকল কথা কহিল। রাজা শুনিয়া নাপিতবুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিলেন।

ও দিকে বাঘ দৌড়িতে দৌড়িতে সেখান হইতে দুইতিন ক্রোশ দূরে একটা ভয়ঙ্কর জঙ্গলে গিয়া পৌঁছিল। সেই জঙ্গলে প্রায় দুই তিন শত বাঘ ছিল। নবাগত ব্যাঘ্রকে হাঁপাইতে দেখিয়া সেখানকার বাঘেরা জিজ্ঞাসা করিল;—তুমি হাঁপাইতেছ কেন? নবাগত বাঘ উত্তর করিল,—ভাই সকল, বড়ই দুঃসংবাদ; ব্যাঘ্রকুলের বড়ই বিপদের দিন উপস্থিত।

ব্যাঘ্রদল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসিল,—কেন, কি হইয়াছে?

নবাগত ব্যাঘ্র কহিল,—এক নাপিত রাজাদেশে বাঘ ধরিতেছে, আর তাহাদিগকে মারিয়া তাহাদের তৈল লইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে।

ব্যাঘ্রদল এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল,—ও সব বাজে কথা। মানুষের কি শক্তি আছে, আমাদিগকে ধরিতে পারে?

নবাগত ব্যাঘ্র বলিল,—নাহে, তা নয়, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।

ব্যাঘ্রদল কহিল,—এত বড় কথা; আচ্ছা, চল্ দেখি, আমরা দেখিয়া লইব,—কেমন সে নাপিত?

নবাগত ব্যাঘ্র বলিল,—ভাই সকল! আমি কিন্তু অগ্রে অগ্রে যাইতে পারিব না। আমি পিছনে থাকিয়াই তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া

লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া বাঘ অন্যান্য বাঘদিগকে পথ দেখাইয়া সেই পূর্ব্বকথিত বৃক্ষের নিকট আনিতে লাগিল। ব্যাঘ্রদল লম্ফ ঝম্প করিয়া মহোল্লাসে চলিতে লাগিল। যখন বাঘ সকল সেই বৃক্ষের কিয়দ্দূরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন পাঁচজন পথিক সেই বৃক্ষপার্শ্বস্থ পথ দিয়া রাজ-বাড়ী যাইতেছিল। তাহারা অদূরে ব্যাঘ্রদল দেখিয়া ভীত চকিতমনে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল এবং সকলেই একে একে তথাকার সেই বৃক্ষে গিয়া উঠিল। এই সময় রাজ-নাপিতও কার্য্য শেষ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নিজাবাসে যাইতেছিল। তাহারও দৃষ্টি সেই আগন্তুক ব্যাঘ্রদলের উপর পড়িল। গত্যন্তর নাই দেখিয়া নাপিতও ত্বরাত্বরি বৃক্ষে উঠিল। ইতি মধ্যে প্রায় তিন শত ব্যাঘ্র আসিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়া কাহাকেও না দেখিয়া তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যাঘ্রকে বলিল,—কৈ, সে নাপিত কোথায় গেল ?

ব্যাঘ্র উত্তর করিল,—নাপিত বোধ হয় রাজবাড়ী গিয়াছে, এখনই সে এ পথে আসিবে।

ব্যাঘ্রগণ এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল ; কিন্তু বৃক্ষের উপর কে কোথায় আছে, তাহা তাহারা কিছুই দেখিল না।

নাপিত আসিবার পূর্ব্বে বৃক্ষে যে পাঁচ ব্যক্তি উঠিয়াছিল, ঘটনাক্রমে তাহারা পাঁচ জনই বৃক্ষের একটা বড় ডালে বসিল। নাপিত শেষে আসিয়াছিল, সে তাহাদের উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত একটী ছোট ডালে চুপ করিয়া বসিল। পাছে ব্যাঘ্রদল টের পায়, এই মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে কেহই কোন বাক্যালাপ করিতেছিল না। নীচে ব্যাঘ্রদল খুব 'ডাকহাঁক' করিতেছিল। কেহ বলিতেছে,—নাপিতটাকে পেলে আমি তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তটুকু খাইব। কেহ বলিতেছে,—

একা তুই খাইবি কিরে, আমাদিগকেও ভাগ দিতে হইবে। কেহ বলিতেছে—না, নাপিতটাকে আস্ত ধরে নিয়ে এক গর্ত্তে ফেলে রাখবো, শেষে এক এক দিন তার এক এক খানা হাত-পা' খাবো।

নাপিত বৃক্ষের উপরে থেকে এই সব কথা শুনে শুনে ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। এমন সময় দৈবের এমন ঘটনা,—সেই যে পাঁচ ব্যক্তি বৃক্ষের একটা বড় ডালে বসিয়াছিল, সেই ডালটা অগ্রে মড়মড় ধ্বনি—শেষে এক বিপরীত শব্দ করিয়া নিম্নস্থিত ব্যাঘ্রদলের উপর পড়িল। ডালের চাপে বহু বাঘ বিষম বেদনা পাইয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িল। অন্যান্য ব্যাঘ্রেরা কি হইল, কি ঘটিল, তাহা ভাল করিয়া না দেখিয়াই 'বাপ্ বাপ্'-রবে যে যে দিক্ পারিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। এ দিকে নাপিত সেই বৃক্ষে থাকিয়াই চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—ধর্ ধর্ আগে বড় বড় কয়টাকে ধর্, একটাও যেন পালাইতে না পারে। ব্যাঘ্রেরা এই কথা শুনিয়া আরও প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। তখন সেই পূর্ব্বেকার বাঘটা অন্য সকল বাঘকে বলিতে লাগিল,—কেমন এখন পালাও কেন? আমি তো আগেই ব'লেছিলাম। বাঘেরা আর সে কথায় কাণ না দিয়া কেবল একমনে দৌড়িতেই লাগিল।

যে পাঁচ জন লোক পড়িয়াছিল, তাহাদের কাহাকেও কোন আঘাত লাগে নাই। তাহারা ডালের উপরই ছিল। যত আঘাত সেই ডালেই লাগিয়াছিল। শেষে নাপিতও ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিল। তখন ছয় জনে মিলিয়া খুব এক চো'ট হাসি! হাসিতে হাসিতে তাহারা যে যাহার গৃহে গমন করিল।

গল্প শুনিয়া বাদসাহও খুব হাসিলেন। বলিলেন, পণ্ডিতজী! এ বড় মিঠা গল্প।

গীত-ভীত ভূত।

প্রাচীন রত্নপুর গ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান ছিল না; একমাত্র বর্ষীয়সী স্ত্রী। ব্রাহ্মণ ভগবদারাধনায়ই দিনপাত করিতেন। সন্ধ্যা, আহ্নিক, তপ, জপ, ইত্যাদি কার্য্যেই তাঁহার প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হইত। ব্রাহ্মণের দুই এক ঘর যজমান ছিল, তাহাদের প্রদত্ত ভোজ্য-সাহায্যেই তাঁহাদের পতিপত্নীর জীবনধারণ হইত: এক মাত্র ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর কোনই চিন্তা ছিল না।

কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় ব্রাহ্মণ বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার নির্জ্জন বাসে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মণের সম্পত্তির মধ্যে একখানি মাত্র বাড়ী; সে বাড়ীরও অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাকীর্ণ। যে অংশে ব্রাহ্মণ দম্পতির বাস, সেই অংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; তদ্ব্যতীত সমস্ত স্থানই জঙ্গলময়। ব্রাহ্মণের তিন দিকে তিন খানি ছোট ছোট ঘর: সেই ঘরের এক খানিতে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপূজা করেন, এক খানিতে তাঁহার রন্ধনাদি হয়, আর এক-খানিতে তিনি শয়ন করেন। এক দিক্ খোলসা; একটা বহুদিনের পুরাতন বৃহৎ তেঁতুল গাছ সেই দিক্‌টায় আছে। সেই গাছেই সে দিক্‌টা ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ব্রাহ্মণের বাড়ীর যে কিছু আবর্জ্জনা সেই গাছের তলেই জড় হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের বাস-গ্রাম বহু বিস্তৃত; গ্রামে দূরে দূরে বহুসংখ্যক লোক বাস করে। ভদ্রলোক মাত্র গ্রামে তিন চারি ঘর; তদ্ব্যতীত অন্য সমস্তই

নিম্নশ্রেণীর লোক; তন্মধ্যে বারোশত ঘরই নাপিত। এই নাপিতগণ ক্ষৌর বাস করিয়াই সংসার নির্ব্বাহ করে।

এক দিন কোন উৎসব উপলক্ষে ঐ গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিদেশ হইতে আগত একটা যাত্রার দলের গান হইল। গানে ধন্য ধন্য পড়িল। শ্রোতৃমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে যাত্রার দলের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। গ্রামের বহু নাপিত এই যাত্রা শুনিতে আসিয়াছিল। তাহারা গানে এতই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, উৎসবান্তে যাত্রার দল যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারা অনেকে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে দিন কয়েক পরে তাহারা স্থির করিল, না,—আর আমরা পরের দলের গান শুনিব না; নিজেরাই দল বাঁধিব, গান করিব। আমরা যাত্রার দল করিয়া টাকা পয়সা রোজগার করিতে পারিব, এবং দেশে বিদেশে অনেক সুখ্যাতি পাইব।

নাপিতেরা এইরূপ স্থির করিয়া গানের আখড়াই দিতে লাগিল। ক্রমে প্রত্যেক ঘর হইতেই এক একজন করিয়া লোক আসিয়া সেই গানের দলে যোগ দিল। বলা বাহুল্য, এই গায়কদলের সমস্ত লোকই নাপিত; এ দলের লোক সংখ্যা বারো শত।

কিন্তু একটা বড় গোল বাধিল। এই বারো শত নাপিত এক স্থানে বসিয়া গান বাজনা করিতে পারে, এরূপ স্থান নাপিত-মহলে পাওয়া গেল না। দল বাঁধিয়া গান গাহিতে না পারিলে নাপিতগণের মনে শান্তি নাই। এখন উপায় কি? কোথায় যাওয়া যায়?

নাপিতগণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্থির করিল,—এই গ্রামের প্রান্তে যে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার বাড়ীখানা খুব বড়; আমরা সেই ব্রাহ্মণকে বলিয়া কহিয়া সেই বাড়ীর বন-জঙ্গল কাটিয়া সেইখানে

বসিয়াই প্রত্যহ গানের আখড়াই দিব। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের ইহাতে কোন আপত্তি হইবে না; আর যদিই বা তিনি আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে না হয় খাজনাস্বরূপ কিছু কিছু দেওয়া যাইবে।

এই পরামর্শ স্থির হইবা মাত্র প্রথমে এক দিন তিন জন নাপিত সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া করযোড়ে কহিল,—দাদাঠাকুর! প্রণাম হই; আমাদের একটু নিবেদন আছে।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কি নিবেদন?

নাপিতগণ। আজ্ঞে, দাদাঠাকুর! আমরা একটী গানের দল করিয়াছি, ভগবানের নামগান করিব; তা আপনার বাড়ীতে একটু স্থান দিবেন?

ব্রাহ্মণ। আমার বাড়ীতে তো বেশী ঘর নাই, তোমরা কোথায় বসিয়া গান করিবে?

নাপিতগণ। আজ্ঞে ঘর নাই-বা হইল; একটু স্থান পাইলেই হয়।

ব্রাহ্মণ। স্থানও তো তেমন দেখি না; আমার বাড়ীর প্রায় স্থানই তো জঙ্গলময়।

নাপিতগণ। আজ্ঞে, আমরা জঙ্গল পরিস্কার করিয়া লইব, আপনি অনুমতি করিলেই হয়। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—বনজঙ্গল সাফ্ করিয়া উহারা যদি গান করিতে পারে তো আমার তাহাতে ক্ষতি কি? আমার বাড়ীতে কত স্থান পড়িয়া আছে, সে স্থান দিয়া আমার দরকারই বা কি?

ভাবিয়া ব্রাহ্মণ অনুমতি দিলেন,—আচ্ছা তোমরা যদি বন জঙ্গল পরিস্কার করিয়া লইতে পারো তো এখানে গান করিবে, আমার আপত্তি নাই।

নাপিতত্রয় অনুমতি পাইয়া সন্তুষ্ট-মনে নিজের দলের মধ্যে গিয়া সেই

সংবাদ প্রকাশ করিল। দলস্থ সমস্ত লোক আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে সকলে গিয়া সেই ব্রাহ্মণবাড়ীর জঙ্গল সাফ্ করিতে লাগিল। বারো শত নাপিত একযোগে কাজ করিল; একদিনের মধ্যেই জঙ্গলাদি কর্ত্তিত হইয়া সমস্ত স্থান পরিষ্কৃত হইল। তখন তাহারা স্থানে স্থানে চেটাই পাতিয়া নিজেদের বাদ্য যন্ত্রাদি লইয়া গান করিতে বসিয়া গেল। অশিক্ষিত নাপিতেরা গান-বাদ্যের সুর-তান-লয় মান কিছুই জানে না; যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তাহাই গাহিতে এবং বাজাইতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, নাপিতেরা বাদ্যে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। বারো শত নাপিতের সেই অসংলগ্ন গান-বাদ্যের বিকট রোলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীর অনতিদূরে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাও অস্থির। কিন্তু কে কি করিবে? বারো শত অশিক্ষিত নাপিতের বিরুদ্ধে কথা কওয়া ব্যর্থ ভাবিয়া কেহই আর সেরূপ করিতে সাহসী হইল না। ব্রাহ্মণ নিজ কৃত কর্ম্মের ফল ভাবিয়া নিরন্তর কেবল ভগবান্‌কেই ডাকিতে লাগিলেন।

নাপিতেরা তিন দিন পর্য্যন্ত অবিরাম গান বাদ্য করিল। চতুর্থ দিন গান-বাদ্যের বিকট রোল কিঞ্চিৎ কমিল। কারণ, নাপিতগণ তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে থাকিয়া তন্ময়ভাবে কেবল গান বাদ্যই করিয়াছিল। অদ্য দ্বিতীয় প্রহরের পর তাহারা গান বাদ্য বন্ধ করিয়া খাওয়া দাওয়ার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল।

এদিকে গত তিন দিনের গান-বাদ্যের ব্যাপারে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত, এমন কি উন্মাদপ্রায় হইয়া অদ্য সন্ধ্যার পরই শয়ন করিলেন। কিন্তু পাছে নাপিতেরা আবার গান আরম্ভ করে, এই ভাবনায় তাঁহার নিদ্রা হইল না। রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল, নাপিত দলের

মধ্যে এ সময় খাওয়া দাওয়ার ধুম চলিতেছে। কোন গতিকে কোন নাপিত একটু উচ্চ কথা কহিলেই ব্রাহ্মণের ভাবনা হয়—এই রে, এই বুঝি আটকুড়ির বেটারা আবার গান ধরে! ব্রাহ্মণ! আরও ভাবিতে লাগিলেন,—বেটারা যদি আবার সেইরূপ গান ধরে, তবে কল্যই আমি সস্ত্রীক এ স্থান হইতে পলায়ন করিব।

ব্রাহ্মণ এইরূপ নানাভবনা ভাবিতেছেন। ইতি মধ্যে বাহির হইতে কে যেন তাঁহাকে অনুচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলেন,—কে তুমি? ঐ গানের দলের কোন নাপিত নাকি?

আগন্তুক বলিল,—দাদাঠাকুর, আমি নাপিত নই,—ভূত।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাপ্‌রে, একে নাপিতের জ্বালায় অস্থির; তার উপর আবার ভূত!

ভূত বলিল,—দাদাঠাকুর, আমি আপনাকে বিরক্ত বা ভীতিগ্রস্ত করিতে আসি নাই। আপনার কাছে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেইজন্যই আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণ। ভূতের আবার আমার নিকট প্রয়োজন কি? তোমারও কি গানের দল আছে নাকি?

ভূত। না মহাশয়, আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করাই আমার প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণ। তুমি ভূত, আমি ব্রাহ্মণ, আমার তুমি উপকার করিবে কেন?

ভূত। আজ্ঞে দাদাঠাকুর, আমার দুঃখের কথা শুনুন। আমি আপনার বাড়ীর ঐ তেঁতুলগাছটায় আজ প্রায় তিনপুরুষ যাবৎ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছি। এতদিন আপনার আশীর্ব্বাদে কোন বিপদেই পড়ি

নাই। কিন্তু এই যে একটা গানের দল আসিয়াছে, এ ব্যাটাদের গানের চোটে আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না! এই গান-বাদ্যে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে। এত দিনের পৈতৃক বসত বৃক্ষটী এক্ষণে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহাই আমার দুঃখ। কি করি, উপায় নাই, অদ্যই আমাকে এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এখন উহারা গান বাদ্য বন্ধ করিয়াছে বটে; কিন্তু আবার যদি আরম্ভ করে, তাহলে আর আমার রক্ষা নাই। এত দিন আপনার ঐ গাছটীতে ছিলাম; সুতরাং যাইবার কালে আপনার কোন একটা উপকার করিয়া যাইতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—বাবা ভূত! তুমি যদি এই নাপিতগুলাকে তাড়াইয়া দিয়া যাইতে পারো, তবে ইহা অপেক্ষা অধিক উপকার আমি কিছুই মনে করি না। দেখ, এই গু-খে'কোর বেটাদের গানে বাদ্যে আমারও প্রাণ ওষ্ঠাগত; ব্রাহ্মণী তো কখন মরে, তার ঠিক নাই। যদি আজ বাঁচি, তবে কালই আমিও এ স্থান ত্যাগ করিব; কিন্তু কোথায় যাইব, স্থির করিতে পারি নাই। তুমি ভূত অনেক স্থানের খবর রাখ, একটা নিরাপদ স্থানের কথা বলিতে পারো কি?

ভূত বলিল,—দাদাঠাকুর, আপনি যে উপকারের কথা কহিলেন, তাহা আমি করিতে পারি বটে; কিন্তু সাহস হইতেছে না। কেন না, আমি যখন তাড়াইতে যাইব, তখন ঐ নাপিতগুলা যদি গান ধরে, তবে আর আমার রক্ষা নাই। এই ভয়েই আমি পারিতেছি না, তবে যে নিরাপদ স্থানের কথা বলিলেন, তাহা অবশ্য বলিয়া দিতেছি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—বুঝিলাম, তুমি ভূত, তোমারও ঐ গানে আমা

অপেক্ষা অধিক ভয় হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি যে উপকার করিতে চাহিলে, সে তবে কিরূপ উপকার?

ভূত কহিল,—আমি স্থির করিয়াছি, আপনার কিছু অর্থ সংস্থান করিয়া দিব।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—না বাবা, ঐটী মাপ কর। আমি ব্রাহ্মণ, অর্থের লোভ আমায় দেখাইও না। আমার সংসারে আমি, আর আমার স্ত্রী; কোন গতিকে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া গেলেই হইল। আমি অর্থবান্ হইয়া বড়লোক হইতে চাই না।

ভূত। অর্থিক উপকার ভিন্ন অন্য কোন উপকার করিয়া আমি তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—ভূতের সঙ্গে তর্ক করিয়া ভূত চটাইয়া কাজ নাই। ও যা' ইচ্ছা করিয়াছে, করুক।—এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি যা' স্থির করিয়াছ কর; কিন্তু উহা কিরূপে করিবে, শুনিতে পারি কি?

ভূত। আমার নিজের কাছে অর্থ নাই। আমি অন্য দ্বারা দেওয়াইব। তাই ভাবিয়াছি, অদ্য রাত্রেই এখান হইতে আমি রওনা হইব। এই গ্রামের পরবর্ত্তী গ্রামে এক জমীদার আছেন। আমি গিয়া এখন সেই জমীদার-কন্যার স্কন্ধেই চাপিব। জমীদারের বিপুল অর্থ সম্পদ্; কিন্তু সন্তানের মধ্যে একটী মাত্র কন্যা। সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি ভূত ছাড়াইবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া নানা দেশ হইতে ওঝা সংগ্রহ করিবেন। আপনি এক কাজ করুন। আপনিও অদ্যই সেই জমিদারের বাড়ীর উদ্দেশে সস্ত্রীক রওনা হউন। সেখানে গিয়া আপনি তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াই পরিচয় দিবেন। জমীদারের চেষ্টায়

যত স্থান হইতে যত রোঝাই আসুক, আমি তাহাদের কাহারও মন্ত্র তন্ত্রেই জমীদার-কন্যাকে ছাড়িয়া যাইব না। শেষে আপনি তাহার চিকিৎসার্থ যাইবেন। আমি প্রথমে আপনাকে দেখিয়া নিষেধ করিব; কিন্তু শেষে আপনি যেরূপ মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন, আমি তাহাতেই সেই জমীদার-কন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আপনার ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে। জমীদারের নিকট আপনি প্রভূত অর্থ পাইয়া সেইখানেই সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবেন। কিন্তু আর একটা কথা আপনাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া যাইতেছি, আমি জমীদারকন্যাকে ছাড়িয়া আর, যদি কাহারো স্কন্ধে গিয়া চাপি, তবে সেখানে আর আপনি আমাকে ছাড়াইতে যাইবেন না; গেলে, আপনার মান থাকিবে না। আমি সে স্থান হইতে সহজে যাইব না।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাবা ভূত! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব, তাহার অন্যথা আমার দ্বারা হইবে না।

ব্রাহ্মণে ও ভূতে পরস্পর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতি মধ্যে সেই গানের দলের মধ্য হইতে হঠাৎ এক নাপিত একটা বিকট রাগিণী ধরিল। ভূত বলিল,—দাদা ঠাকুর, আর না—আর থাকিতে পারিলাম না। এক্ষণে প্রণাম হই।

এই বলিয়া ভূত তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল। এদিকে ব্রাহ্মণ রাত্রি সত্ত্বেই সস্ত্রীক তাঁহার স্বগ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। নাপিতেরা মনের আনন্দে গানবাদ্য ও নৃত্য করিতে লাগিল। শুনা যায়, শেষে নাকি রাজবলের সাহায্যে তাহাদিগকে একমাস পরে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে হয়, নতুবা গ্রামের ভদ্রলোক কয় ঘরের আর উপায় ছিল না।

যাহা হউক, এদিকে ভূত তাহার কথামত কার্য্য করিল। সেই রাত্রেই

সে গিয়া জমিদারকন্যার স্কন্ধে চাপিল। পরদিন প্রভাতে জমীদার-কন্যার চিকিৎসার্থ নানাস্থানে লোক পাঠাইয়া বহু রোজা-বৈদ্য আনয়ন করিলেন। সমস্ত দিন ধরিয়া তাহারা জমীদার-কন্যার নানারূপ চিকিৎসা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ভূত কিছুতেই জমীদার-কন্যাকে ছাড়িল না।

সমস্ত দিন কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হয়-হয় হইয়া আসিল। জমীদার ও জমীদারপত্নী কন্যার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত। এই সময় একজন লোক ছুটিয়া আসিয়া জমীদারকে জানাইল,—হুজুর, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নী সমভিব্যাহারে এ স্থানে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—এই স্থানের জমীদারকন্যা ভূতাবিষ্টা হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া আমি উহাকে নিরাময় করিব বলিয়াই আসিয়াছি। তোমরা জমীদারকে গিয়া বল, কোন চিন্তা নাই; আমিই তাঁহার কন্যাকে নিরাময় করিব।

লোক-মুখে জমীদার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে আনাইতে বলিলেন বটে; কিন্তু বিশেষ একটা আগ্রহ করিলেন না; কেন না, সমস্ত দিন হইতে কত চিকিৎসক, কত তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ, কত রোজা-বৈদ্য চেষ্টা করিল, কিছুতেই কিছু হইল না, এক্ষণে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন, এ ধারণা তাঁহার আদৌ ছিল না। সেই জন্যই তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন না।

এদিকে জমীদারের লোক প্রভুর সম্মতি পাইবামাত্র সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ আসিবা মাত্র সেই ভূতাবিষ্ট কন্যা দূর হইতে বলিতে লাগিল,—ওরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তুই আসিস্ না, আসিস্ না, আসিলে আমি থাকিতে পারিব না; এখানে আমি বেশ আছি।

তখন ঐ কথা শুনিবামাত্র জমীদার-পরিবারের সকলেই সেই ব্রাহ্মণকে

সাগ্রহে কন্যাসমীপে লইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ গিয়া দুই একটা ভূতাপসারক মন্ত্র পড়িলেন। ভূত সেই কন্যাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ভূতাবিষ্ট অবস্থায় জমীদার-কন্যার লজ্জা সরম কিছুই ছিল না; কিন্তু ভূত চলিয়া যাইবামাত্র তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ বক্ষে কক্ষে কাপড় টানিয়া দিলেন এবং লজ্জায় দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

জমীদার মহা খুসী হইলেন। ব্রাহ্মণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান-সমাদর করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জমীদারের আনুকূল্যে সেই স্থানে মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। নাপিতগণের ভয়ে তিনি আর পৈতৃক বাস্তুভিটার মায়া রাখিলেন না।

এদিকে সেই ভূত সেখান হইতে গিয়া সেই রাত্রেই এক রাজকন্যার স্কন্ধে ভর করিল। জমিদারবাটী হইতে রাজবাটী অনেকদূর, প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যবধান। কিন্তু ভূত কি না! তাই রাত্রেই সেখানে গিয়া উপস্থিত! রাজকন্যা অন্তঃপুরের প্রশস্ত কক্ষে শুইয়া ছিলেন; ভূতাবিষ্ট হইবামাত্র চিৎকার করিয়া উঠিলেন। হাত-পা ছুড়িতে লাগিলেন। রাজকন্যার চীৎকার শুনিয়া রাজা-রাণী জাগিলেন। কন্যার অবস্থা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজপরিবারমধ্যে সকলেই উদ্বিগ্ন হইলেন। রাজকন্যা ভূতাবিষ্টা হইয়াছেন বলিয়াই সকলে স্থির করিলেন।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে চিকিৎসক সন্ধানার্থ লোক ছুটিল।

অবিলম্বে অনেক চিকিৎসক আসিল; কিন্তু কোন চিকিৎসকই রাজকন্যাকে নিরাময় করিতে পারিল না। ক্রমে একদিন দুইদিন করিয়া

সপ্তাহ অতীত হইল। রাজা ভাবনায় চিন্তায় রাজকার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। একদিন রাজদরবারে কোন কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন দেশ হইতে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি রাজার উদ্বেগের কারণ জানিতে পারিয়া বলিলেন,—আপনার অধীনে এক জমিদার আছেন, তাঁহার কন্যারও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শেষে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার চিকিৎসা করেন; তাহাতেই তিনি নিরাময় হন, সম্ভবতঃ সেই ব্রাহ্মণ সেই জমীদারেরই আশ্রয়ে বাস করিতেছেন।

রাজা এই সংবাদ শুনিবা মাত্র জমীদারকে সকল ঘটনা জানাইয়া পত্র লিখিলেন; পত্রে সেই ব্রাহ্মণকে রাজবাটীতে পাঠাইয়া দিবার জন্যই বিশেষ করিয়া লিখিলেন। পত্র প্রাপ্তি মাত্র জমীদার সত্বর সেই ব্রাহ্মণকে রাজধানীতে পাঠাইবার উদ্‌যোগ করিলেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু ভূতের নিষেধ মনে করিয়া রাজভবনে গমনে সম্মত হইলেন না। তিনি জমিদারকে বলিলেন,—আমি বৃদ্ধ, এ বয়সে আর অত দূরে যাইতে ইচ্ছা করি না; আপনি অন্য চিকিৎসক পাঠাইয়া দিন। কিন্তু জমীদার রাজ-ভয়ে সে কথা শুনিলেন না; তিনি ব্রাহ্মণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের যাহাতে পথে কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—এইবার নিশ্চয়ই ভূতের হাতে প্রাণ দিতে হইল। বেটা আমায় নিষেধ করিয়া গিয়াছে; তবু চলিলাম; আমায় কি আর সে রাখিবে? একটী চড়ে মুণ্ডটী ছিঁড়িয়া ফেলিবে। কি করি? গিয়া দেখি, একটা কৌশলে যদি মান প্রাণ বাঁচান যায়। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ যাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে পৌঁছিবা মাত্র রাজার লোকজন আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে রাজান্তঃপুরে লইয়া গেল। তিনি রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ভূত চীৎকার করিয়া বলিল,—আরে লোভী ব্রাহ্মণ, তুই আমার নিষেধ না মানিয়া অর্থলোভে আবার এখানে আসিলি? তা' এবার আমি কিছুতেই যাইব না, দেখি, তুই আমার কি করিতে পারিস্!

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হাঁ হে বাপু ভূত! তুমি চটিও না, আমি তোমায় তাড়াইতে আসি নাই। তবে একটা দুঃসংবাদ শুনিয়া সেইটা তোমায় জানাইতে আসিয়াছি।

ভূত।—কি সংবাদ, দাদাঠাকুর, কি সংবাদ?

ব্রাহ্মণ।—আমি সকলের সাক্ষাতে তাহা বলিব না, তোমার কাণে কাণে বলিব।

ভূত।—আচ্ছা বলুন।

তখন ব্রাহ্মণ ভূতের কাণে কাণে গিয়া কহিলেন,—বাবা ভূত, তুমি আমার উপকার করিয়াছ; আমি তোমায় বড় ভালবাসি; সেইজন্ত তোমায় একটা বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিব বলিয়া এ সংবাদটী পূর্ব্বাহ্নে তোমায় বলিতে আসিয়াছি।

ভূত বলিল, শীঘ্র শীঘ্র বলুন, সে কি সংবাদ!

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বলিব কি বাপু, সেই যে গানের দল—যার গানে তুমি আমি দেশত্যাগী; শুনিলাম—এই রাজবাড়ীতেই সেই দলের বায়না হইয়াছে। কল্য প্রাতেই গান আরম্ভ হইবে।

ভূত।—বাপ্‌রে, আবার সেই গানের দল! সত্যই নাকি!

ব্রাহ্মণ।—সত্য না কি, মিথ্যা?

ভূত। তবে আমি এখনই এস্থান ত্যাগ করিলাম।

এই বলিয়া ভূত তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। রাজপুরী আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল।

এই তিন দিন যাবৎ বাদসাহ নানাগল্প উপন্যাস শুনিয়া মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এ দিকে দুর্দ্দিন কাটিল, প্রকৃতি শান্ত হইল। বাদসাহের সন্তোষের ফলে পণ্ডিত হরিমিশ্র এক প্রকাণ্ড জায়গীর পাইলেন। পণ্ডিতজীর অর্থকষ্ট ঘুচিল। নিত্য তিনি ভগবানের কাছে বাদসাহের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত—

অন্যান্য গ্রন্থ—

১। **কাব্য-উপাধি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর**। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্য উপাধি পরীক্ষার সমগ্র প্রশ্ন ও তাহার যথাযথ উত্তর ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। উপাধি-পরীক্ষার্থী মাত্রেরই এই গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কাব্যালঙ্কার অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই এই গ্রন্থ দেখিয়া লইলে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। পুস্তক আর অল্পই আছে। পরীক্ষার্থী সত্বর হউন। মূল্য—১॥০, ডাঃ মাঃ ৵০।

২। **রসাল**। রসাল সত্য সত্যই রসাল। ইহার প্রথম শাখায় প্রাচীন সংস্কৃত মূলক নানা রস-রহস্যময় গল্প প্রবন্ধ এবং দ্বিতীয় শাখায় বঙ্গদেশপ্রচলিত নানা রসের নানা ভাবের নানা রহস্য কথা নিবদ্ধ। মূল্য—১৲।

প্রাপ্তি স্থান;—৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।